# মর্ম্ম ও কর্ম্ম

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—আশ্বিন ১৩৫২ সাল—
মূল্য—তিন টাকা

প্রিন্টার—শ্রীপ্রবোধ ঘোষ
গোরাচাঁদ প্রেস
১৪নং মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

# মর্ম্ম ও কর্ম্ম

# মর্ম্ম ও কর্ম্ম

একটা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়ী। ঝর্ ঝর্ করে তার তিনটা তলার মেঝে, তক্ তক্ করে তার দোর জানালা। সন্ধ্যা না হ'তেই জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ওঠে তার খোপে খোপে বিজলির বাতি।

এটি একটি কলেজের ছাত্রাবাস।

তার পাশে বিস্তীর্ণ বস্তী। খোলার চালের পর খোলার চাল ঢেউ খেলে গেছে, তার মাঝে মাঝে ঢেউ টিনের চাল যেন আশে-পাশে চারদিককার খোলার চালের দৈন্যকে সগর্ব্বে অবজ্ঞা ক'রে মাথা উঁচু ক'রে তুলে বস্তীও তেতলার দিকে চেয়ে র'য়েছে কিঞ্চিৎ ঈর্ষ্যার সঙ্গে ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ কামনায়।

এই বস্তীর প্রত্যেকটি ঘরে বা খোপে থাকে এক একটি পরিবার, তাদের অনেকেরই সন্তানের বেশ বাহুল্য দেখা যায়।

হষ্টেলের তেতলার জানালা খুললে দেখতে পাওয়া যায় এই বস্তীর গর্ভের অনেকটা—যেখানে বস্তীবাসীদের জীবন তার সকল দৈন্য নিয়ে অসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে দিনরাত।

এর একটি জানালার কাছে ব'সেছিল বিকাশ—সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।

সে-দিন খুব একটা ভারী ফুটবল খেলা হ'য়ে গেছে। ইলিয়ট শীল্ডের সেমি-ফাইনাল। বিকাশদের টীম এতগুলি খেলায় এমন চমৎকার খেলে

এসেছে যে, সবাই নিশ্চিত জেনেছিল যে, তারাই এবারকার শীল্ড পাবে। কিন্তু আজকার খেলায় তারা একটি গোলে হেরে এসেছে।

বিকাশ ছিল গোল-কীপার—সে বহুদিন ধ'রে খুব ভাল গোল-কীপার ব'লে খ্যাতিলাভ ক'রে এসেছে, অথচ আজ যে গোল হ'ল, সেটা বলতে গেলে সম্পূর্ণ তার দোষেই।

বলটা এসে প'ড়েছিল গোলের তিন চার হাত দূরে ঠিক বিকাশের পায়ের সামনে। বিকাশ অনায়াসে তাকে ফার্ষ্ট টাইমে শট ক'রে অনেক দূরে পাঠাতে পারিতো। কিন্তু তা' না ক'রে সে তাকে ধ'রতে গেল হাত দিয়ে, মতলব এই যে, বলটা নিয়ে একটু পাশে স'রে গিয়ে লম্বা কিক ক'রে দেবে!

কিন্তু বলটা তার হাত থেকে পিছলে প'ড়ে তার পিছনে দু'তিন হাত স'রে গেল। সেটার কাছে আবার যেতে না যেতেই অপর দলের দু'তিন জন খেলোয়াড় ভিড় ক'রে এলো, ঠেলাঠেলিতে বলটা [illegible] আপনিই গড়িয়ে গেল গোলের লাইন পেরিয়ে।

ফের বলটি নিয়ে সেণ্টার ক'রতে না ক'রতেই রেফারীর [illegible] বাঁশী বেজে উঠলো। বিজয়ী দল উল্লাসে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল; বিকাশের দলের সবাই এসে বিকাশকে কেবল খেতে বাকী রাখলে। বহু কষ্টে বিকাশ দলের ভিড় ঠেলে পাশ কাটিয়ে তার সাইকেল নিয়ে লম্বা ছুট দিয়ে এলো হষ্টেলে। তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে কাপড়-চোপড় ছেড়ে তার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে জানলার ধারে ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সে ভাবতে লাগল, কি মূর্খের মত ভুলটা সে ক'রে ব'সেছে, আর কি সর্ব্বনাশটাই এতে হ'য়ে গেল। হাতের মুঠো থেকে শীল্ডটা ফ'স্কে গেল। নিদারুণ আত্মগ্লানিতে ভ'রে গেল তার চিত্ত।

আর কোন কথাই তার মনে এলো না। তার বন্ধুদের গালাগালি ও টিট্‌কারী তার কানে আসতে লাগলো—আর কেবলই সেই খেলার চিত্র বাস্তবও কাল্পনিক, তার চোখে ভাসতে লাগলো। যা হ'ল তার পাশে যা হ'তে

পারতো তাঃ উজ্জ্বল চিত্র তার মনে উদ্ভাসিত হ'য়ে তাকে একেবারে পাগল ক'রে দিলে। সে যদি হাত দিয়ে না ধরে স্যুট করে বলটা পাঠিয়ে দিত রাইট আউটের কাছে! তার কাছে কোনও লোক ছিল না—সে অনায়াসে বল ঠেলে ঠেলে কেউ পৌঁছুবার আগেই গোলের কাছে গিয়ে সেণ্টার করতে পারতো, আর সেণ্টার ফরওয়ার্ডের দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়, তাকে পরিষ্কার ভাবে নেটে ফেলে দিতে পারতো। কিম্বা যদি—

কত চমৎকার সম্ভাবনা এমনি মাথার ভিতর খেলে গেল তার সীমা সংখ্যা নেই। তাতে সে যতই উত্তেজিত হ'ল, ততই লজ্জায় তার মাথা হেট হ'য়ে গেল!

নীচের বস্তীতে ঠিক তার ঘরের নীচের উঠানে একটা কোলাহল শোনা গেল। বিকাশ তার খেলার স্বপ্ন থেকে জেগে চাইলো সে বস্তীর দিকে।

বেশী কিছু নয়, স্বামীস্ত্রীর নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়া। তাদের কথাগুলো হচ্ছিল বেশ উচ্চ কণ্ঠে, কাজেই তার অনেকটাই বিকাশের কাণে প্রবেশ করলো!

স্বামীটি সকাল আটটায় কাজে বের হয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এসে সন্ধ্যাবেলায় স্নান ক'রে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে তামাক সেজে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আরাম ক'রে হুঁকো টানতে টানতে স্ত্রীকে বল্‌লে এক পয়সার চা কিনে আনতে। স্ত্রী বল্‌লে—পয়সা তার কাছে নেই, যা ছিল তা দিয়ে সে চারটি চাল কিনে এনেছে। ধার করে আনবার কথায় স্ত্রী বল্‌লে যে এই তো সেদিন তার রূপোর নোলক বাঁধা দিয়ে এসেছে দোকানে, আবার ধার করলে সে নোলক আর পাওয়া যাবে না।

স্বামী বল্‌লে, এবারে হপ্তা পেলেই সে নোলক খালাস করে দেবে।

স্ত্রী বললে যে, এমন প্রতিশ্রুতি অনেক হ'য়ে বাসি হ'য়ে গেছে।

এইবারে স্বামীর মেজাজ চড়ে গেল। সে বল্‌লে সারাদিন হাড় কালী ক'রে

খেটে এসে এক খুঁটি চা—তাও পাব না ! এতবড় হারামজাদী স্ত্রীটা যে এক খুঁটি চা চাইতে একগঙ্গা কথা শোনাতে আসে—কি না তার নোলক গেছে। ঝাড় মার তার নোলকে। তার গেলবার জন্য মিন্সেটা হাড় কালী ক'রে যে পয়সা আনছে চোখখাকী তা চোখ মেলে দেখতে পায় না—ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ বচসার পর চটে-মটে স্বামী তার ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বের করে টন্ করে ফেলে দিলে উঠানের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে উঠানে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল ; তাকে দেখে দুজনেই হকচকিয়ে গেল, টাকাটা আর কেউ তুলে নিতে পারলে না।

সে এক কাবলীওয়ালা।

একগাল হেসে স্বামী বল্লে, "এই যে খাঁ সাহেব, তা' আজ কেন ? এখনো তো হপ্তা মেলেনি আমার।"

কাবলীওয়ালা তার ভাঙ্গা হিন্দীতে যা বল্লে, তার মর্ম্ম এই যে, অনেক হপ্তার দিন সে এসে ঘুরে গেছে, কেন না লোকটি হপ্তা পেলেই পথে খরচ করে আসে। আর গত তিন হপ্তার দিন এমনি করে সে ঘুরে গেছে। আজ সে অন্য তাগাদায় এসেছিল, পাশের এক ঘরে শুনে এসেছে যে, আজ টাকা আছে তাই এসেছে।

তখনো চকচকে রূপার টাকাটা উঠানেই পড়েছিল। কাবলীওয়ালা তার দিকে চেয়ে দাঁত বের করে বল্লে, "এই তো একটাকা—বস্ আর একটাকা দেও, তবেই আজকের মত খালাস।"

স্বামীটি মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, "আর কোথায় পাব একটাকা, ওটি আজ আমাদের ছোটবাবু আমায় বখ্শিস্ দিয়েছিলেন, ও দিয়ে ভাই চাল না কিনলে এই আণ্ডা বাচ্চার খোরাক চলবে না। মেহেরবাণী করে ও টাকাটা নিও না খাঁ সাহেব।"

খাঁ সাহেব মেহেরবাণী ক'রে আর বেশী তাগাদা না ক'রে টাকাটা তার বিপুল পকেটে পুরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হাঁ করে চেয়ে রইলো। তারপর স্বামী নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে "যাক গে!" বলে ফুড়ুক ফুড়ুক করে তামাক টানতে লাগলো।

স্ত্রীটি উঠান থেকে কোলের ছেলেটাকে কোলে তুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে বিকাশের বুকের ভিতর কি একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। তার মনে হল, "আহা, বেচারা দু'টো পেটের অন্ন রোজগারের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এসে এক পেয়ালা চা খাবে, তাও সে পেলো না। আর সে নেহাৎ সখের খাটুনী খেটে, মাঠের ভিতর মিথ্যে ছুটোছুটি করে সেই ক্লান্তি দূর করছে আরাম করে গরম চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

পেয়ালাটা আর মুখে তুলতে তার প্রবৃত্তি হল না। মনে হ'ল—তার উচিত তখনি এক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে লোকটাকে পাঠিয়ে দেওয়া, নিদেন দোকান থেকে এক খুটি চা কিনে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া। হাত-পা একটু নিস্‌পিস্ করে উঠলো। কিন্তু এমন একটা কাণ্ড করতে গেলে সারা হষ্টেলের ছেলেরা যে তাকে ঠাট্টা করে অস্থির করবে, সেই ভয়াবহ কল্পনায় তার এই অর্দ্ধস্ফুট কামনাকে মনের ভিতর নিষ্পেষিত ক'রে ফেললো।

কিন্তু চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে রুচি হ'ল না।

জানালা থেকে উঠে যাবে—এমন সময় দেখতে পেলো, স্ত্রীটি ইতিমধ্যে দোকান থেকে এক খুঁটি চা—নিশ্চয় ধার করে নিয়ে এসেছে। স্বামীটি তৃপ্তির সঙ্গে চা'টা খেয়ে শেষে একটা মাদুরে লম্বা হয়ে তামাক টেনে এমন বাদশাই আরামের পরিচয় দিলে যে, তাতে বিকাশের মন খুসীতে ভরে উঠলো। সেও তার চা-টুকু খেলে এতক্ষণে বেশ তৃপ্তি ক'রে।

হঠাৎ ও-পাশের একটা ঘরে ক্রুদ্ধ চীৎকার ও আর্ত্তনাদের শব্দ শোনা গেল।

এতে ব্যস্তে দুয়ার খুলে বিকাশ ছুটে গেল।

বিকাশ এসেছিল খেলার পরেই সোজা মাঠ থেকে ছুটে, তার দলের আর সবাই একটু বিশ্রাম ক'রে কিছু খেয়ে দেয়ে এবং কিছুক্ষণ ধ'রে খেলার সমালোচনা ক'রে হট্টগোল ক'রে ফিরেছিল। কিছুক্ষণ হ'ল তারা এসেছে। তাদের টীমের ক্যাপ্টেন সুবোধ চ্যাটার্জ্জী মন্থরগমনে আট-ন' বৎসর ধ'রে ছাত্রজীবন কাটিয়ে এখন ছাত্রত্বের অন্তিম দশায় এসে পৌছেচেন। এই দীর্ঘ ছাত্রজীবনে পড়াশুনায় কোন সুকৃতি অর্জ্জন করতে না পারলেও, খেলায় তিনি বিস্তর প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। ক'লকাতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি একজন এবং যদিও কলেজ-টীমে ইলিয়ট শীল্ড প্রভৃতি ছোটখাট খেলায় তিনি খেলেন, তবু ফ্রেণ্ডলী ম্যাচে তিনি প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলে তাঁর উৎকর্ষের খ্যাতি অম্লান রেখেছেন। ইচ্ছা ক'রলেই তিনি যে কোনও ফার্ষ্ট ডিভিসন টীমে সমাদরের সহিত যেতে পারেন, কিন্তু এখনো তিনি সে প্রলোভনে ধরা পড়েন নি, কেন না ছাত্রজীবনটাকে একটা যা' হ'ক ডিপ্লোমা নিয়ে শেষ করা সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রীর মাথার দিব্য দেওয়া আছে।

সুবোধ চ্যাটার্জ্জী এ-হষ্টেলে থাকেন সামান্য যে কোনও ছাত্রের মত নয়, অনেকটা প্রভুর মত। হষ্টেলের ছেলেরা এবং সুপারিণ্টেডেণ্ট ও কলেজের প্রিন্সিপাল পর্য্যন্ত তাকে প্রচুর সমীহ করেন।

তাঁর ঘরটি তেতলার এক কোণায়—সব চেয়ে বড় ঘর। সেখানে হষ্টেলের আসবাবের অতিরিক্ত দু'খানা ডেক চেয়ার টিপায় প্রভৃতি আছে, টেবিলের উপর ফুলদানী এবং একটি টুলের উপর একটা লম্বা নলওয়ালা গড়গড়া আছে। এক কথায় তিনি থাকেন আমীরি চালে আর আশে—পাশে সবার উপর অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব পরিচালন করেন।

সুবোধ লোকটি মন্দ নন। বেশ মিশুক, হষ্টেলের সব ছেলের সঙ্গে তাঁর ভাব আছে, সবার ঘরেই তিনি যান, আর তাঁর ঘরে আড্ডার জন্য সবার অবারিত দ্বার! —অবশ্য সবার সঙ্গে কথা কইবার বেলায় যতই সদয় হোক তাঁর ব্যবহার, তিনি যে আর সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, একথাটা তিনিও ভোলেন না

এবং আর কাউকেও সে কথা ভোলবার অবসর দেন না। তিনি করেন সবার সঙ্গে আত্মীয়তার চাইতে বেশী মুরুব্বিয়ানা। আর খেলোয়াড়-সর্দ্দার হওয়ায় সবাই তাঁর এ প্রতিপত্তি নির্ব্বিবাদে মেনে নেয়।

আজকের খেলার গতিতে সুবোধের মনটা গিয়েছিল ভয়ানক খিঁচড়ে। রাইট ইনের অনিল আজ একেবারে গোলের সামনে একা বলটি পেয়ে এমন একটা কিক্ করলে যাতে বলটা কিনা ডিঙিয়ে গেল গোল-পোষ্ট—সাত বছরের ছেলেও যে গোলটা ক'রতে পারতো, সেটা গেল নষ্ট হ'য়ে! তারপর অবশেষে বিকাশ কিনা অমন সর্ব্বনাশ করলে! যতই খেলাটার কথা সে ভাবে, ততই তার মনটা খিঁচড়ে ওঠে!

খুব বিরক্ত ভাবে হষ্টেলে ফিরলে সে! স্নান ক'রে বিস্তীর্ণ প্রসাধন সেরে ডেক-চেয়ারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে সে অন্যমনস্ক ভাবে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে একটা টান দিয়ে চেয়ে দেখে পুরাণো পোড়া ক'ল্কে তাতে চড়ান র'য়েছে, চাকর নতুন তামাক দেয়নি। সে ফিরে আস্‌তে না আস্‌তে চাকর নতুন কল্কেয় আগুন দিয়ে গড়গড়ায় চড়িয়ে দেবে এবং সে ব'স্‌তে না বস্‌তে চায়ের বাটী নিয়ে আসবে—এ সব এমন স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে এর কোনও ব্যতিক্রমের কল্পনাও তার মাথায় আসে না কোনও দিন। আজ সেই ব্যতিক্রম হ'য়েছে এবং আরও ভীষণ ব্যাপার এই যে, চাকর সত্যচরণও সে তল্লাটে নাই।

মুখ-চোখ লাল ক'রে সুবোধ ডাক্‌লে "সত্য!" ডাকে কোনও সাড়া না পেয়ে সে উঠে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো! কোথাও তাকে না দেখতে পেয়ে সুবোধ শেষে গেল যেখানে তামাক-টিকে থাকে সেখানে। দেখতে পেলো, ক'ল্কে সাজান আছে, সুধু আগুন দিতে বাকী। ততক্ষণ একটা সিগারেট মুখে দিয়ে সুবোধ নিজেই ক'ল্কেটা ধরিয়ে গড়গড়ায় বসালে, তারপর ডেক-চেয়ারে ব'সে সিগারেট ফেলে নলটা মুখে দিলে।

এতক্ষণে সত্য ছুটে এলো চায়ের জলের কেটলী হাতে ক'রে।

তাকে দেখে সুবোধের মাথায় খুন চ'ড়ে গেল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে শালা নবাব পুত্তুর!" ব'লতে ব'লতে সে সত্যকে দমাদম এমন দু'টো কীল দিলে যে সে বেচারা একেবারে মেজেয় শুয়ে প'ড়ে কাতরাতে লাগলো।

সেই চীৎকার শুনে বিকাশ ও আর সব ছেলেরা ছুটে এলো।

বিকাশ এসে দেখলে সত্য তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে কেটলীটা নিয়ে ছুটে গেল চা ক'রতে। সে ব'লতে ব'লতে গেল, "আমি কি ক'রবো বাবু, সুপারটেন বাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন"—

গর্জ্জন ক'রে সুবোধ ব'ল্লে, "সুপারটেন ডাকুক কি তোর বাবা ডাকুক, তুই আমার কাজ না ক'রে গেলি কি ব'লে শালা ?"

আর কথা না ক'য়ে সত্য চ'লে গেল।

বিকাশের মনের ভিতর আবার একটা বিষম মোচড় দিয়ে উঠলো। গরীব সত্য পেটের দায়ে তাদের কাজ করে, প্রাণ দিয়ে খেটে সে দশজন বোর্ডারের কাজ করে নিপুণ ভাবে, আর সব চেয়ে বেশী সেবা করে সুবোধের' অবশ্য তার কাছে বক্‌শীসও প্রায় প্রচুর। সুপারিণ্টেডেণ্ট তার মনিব, তাঁর ডাকে গিয়ে যদি তার একটু দেরী হ'য়েই থাকে, তবে সেটা দোষের কিছু নয়। আর যদি বা দু'চার মিনিট দেরী হওয়াটা দোষের হ'য়েই থাকে, তাই ব'লে তাকে মার-ধোর করবার কোন অধিকার সুবোধের নেই, আর সে কী মার! সুবোধের ঐ গুণ্ডার মত হাতের কীল! এতে ক্ষীণকায় সত্য যে গুঁড়ো হ'য়ে যায় নি এই তো আশ্চর্য্য।

বস্তীবাসী পরিবারের যে দুঃখ আজ সে দেখেছে, তাতে বিকাশের মনটা দারিদ্র্যের দুঃখের অনুভূতিতে বেশ টনটনে' হ'য়ে ছিল। তার উপর দরিদ্রের এই নির্য্যাতন দেখে তার আর সহ্য হ'ল না। সে ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে ফেললে, "ওকে মারলেন কেন সুবোধ বাবু? গরীবের গায়ে হাত তোলা কি ভদ্র-লোকের কাজ?" সত্যকে প্রহার ক'রে সুবোধের রাগটা প'ড়ে গিয়েছিল, আর, রাগের মাথায় তাকে মেরে এখন তার নিজেরও মনে একটু সঙ্কোচ

হ'চ্ছিল। বিশেষতঃ সত্য ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত চায়ের পেয়ালা এনে ফেলেছিল, তাই সে বিকাশের কথায় না চটে তাকে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় বল্লে, "গরীবকে ভদ্রলোকেই মেরে থাকে। চাকর-বাকরকে মারা ভদ্রলোকের সনাতন ধর্ম্ম।"

বিকাশের রাগ এতে বেড়েই গেল, সে ব'ল্লে, "আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে আপনি হাসছেন, লেখাপড়া শিখে এমন কাজ ক'রে একটুও অনুশোচনা হ'চ্ছে না আপনার।"

"কেন হবে বল? কর্ত্তব্য কাজ করাই আমার অভ্যাস, যে কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করে, তাকে শাস্তি দেওয়াও আমার তেমনি অভ্যাস। তা ছাড়া, জান তো,—

A servant, a dog and a chestnut tree,
The more you be at them the better they be.

ওটা woman সম্বন্ধে খাটে না, servant সম্বন্ধে খাটে। ব'লতে পার, তুমি যে আজ গোলে দাঁড়িয়ে কর্ত্তব্য কর নি তারও এমনি শাস্তি দেওয়া উচিত। স্বীকার কর, এবং যদি বল তবে সে শাস্তি দিতে প্রস্তুতও আছি।" বলে সুবোধ হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

লজ্জায়, রাগে বিকাশের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা ব'লতে পারলে না, শেষে সে ব'ল্লে, "আপনার মারার পিছনে এই callous ভাব, এইটাই আমাকে বেশী আশ্চর্য্য ক'রছে, জানবেন সুবোধবাবু, এই যে গরীব, ছোটলোক, এরাও আপনারই মত মানুষ—তাদের মারবার আপনার কোনও অধিকার নেই।"

"হ'শোবার আছে। মানুষকে মারবার মানুষেরই অধিকার আছে, গরু-ভেড়ার নেই। জগতের আদি থেকে এই আইনই চ'লে আসছে, তাই বাপ ছেলেকে মারে, স্বামী স্ত্রীকে মারে, প্রভু চাকরকে মারে, সৈনিক সৈনিককে মারে।"

উত্তেজিত হ'য়ে বিকাশ ব'ল্লে, "সে আইনের দিন ফুরিয়েছে, সুবোধবাবু। যারা দুর্ব্বল তারা সব জায়গায় মাথা তুলতে আরম্ভ ক'রেছে। আর দু'দিন বাদে আপনার তাদেরকে মারবার চেয়ে তাদের হাতে মার খাবার সম্ভাবনাই বেশী হবে।"

"বেশ, তাই যদি আইন হয় তাই হবে—কিন্তু তাতে মানুষকে মানুষের মারবার আইন বদলাবে না। যে মারবে আর যে মার খাবে তাদের স্থান বদলে যাবে শুধু। কবে সেইটে হবে, সেই জুজুর ভয়ে কাবু হওগে তুমি, আমি হ'ব না। আমি মরদের বাচ্ছা, কাপুরুষ নই।"

"দুর্ব্বলকে মেরে মর্দ্দানি ফলানটা কাপুরুষত্বের পরাকাষ্ঠা।"

এইবার সুবোধ একটু উত্তেজিত হ'য়ে বল্লে, "দেখ, বিকাশ, আজ সত্যর হ'য়ে লম্বা লেকচার ঝাড়ছো তুমি, উপযুক্ত provocation পেলে তুমিও ঠিক আমার মতই বেয়াদব গরীবকে দু'ঘা' অনায়াসে লাগাবে। স্রেফ কেদারা হেলান দিয়ে লম্বা লম্বা কথা ব'লে বাহবা নেবার নেশায় সখের দরদী সাজছ, এ কেবল তোমার মুখের শেখা বুলি, প্রাণের নয়। এক কথায়, তুমি একটি এক নম্বরের হাম্বাগ।"

এই ব'লে সুবোধ বিকাশকে অগ্রাহ্য ক'রে আর সবার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করল, বিকাশ ও দম দম ক'রে গিয়ে নিজের ঘরে দোর বন্ধ ক'রে বসলো।

## দুই

জানালার ধারে ব'সে বিকাশ নীচে বস্তীর স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্ত্তা শুনতে পেলো।

ফুড়ুক ফুড়ুক করে হুঁকোয় টান দিতে দিতে স্বামী বললে, "দেখ, তোর নোলকটা গেলই বুঝি এবার। ভেবেছিলাম এই টাকা দিয়ে সেটা খালাস করবো, তা' শালা পাঠান এসে নিয়ে গেল।"

স্ত্রী বললে, "নোলক তো পরের কথা, এখন চালও যে বাড়ন্ত।—তোমার হপ্তা পেতে তো আরও দু'দিন।"

স্বামী রুখে বললে, "কেন এই পরশু দিন দশ পো' চাল এনে দিলাম, আজই চাল বাড়ন্ত! তুই কি দানছত্র খুলে বসেছিস নাকি?"

"শোন কথা! দানছত্র! বলে আপনার পেটে দু'মুটো দিতে পারি না, আবার দানছত্র। দশ পো' চাল কবে এনেছ, হিসেব আছে? পরশু নয় আজ নিয়ে পাঁচ দিন হল! কতগুলি চাল রোজ গেলা হয় হিসেব রাখো?—বলে দানছত্র। ক'দিন ধরে আধ পেটা খেয়ে তবে এদ্দিন তোমার আর ছেলে-পিলের মুখে দু'দানা দিতে পেরেছি; বলে কিনা দানছত্র!"

স্বামী বোধ হয় মনে একটা হিসাব ক'রে দেখলে যে, স্ত্রীর কথাটা ঠিক। তাতেই আরও বেশী রাগ হয়ে গেল তার।

সে বললে, "তা কি আর করবো? না চলে, খাবো না, ছাই খাব। চাল পাবো কোথায় আর। ঐ যে হপ্তা হপ্তা করছিস, শুনিসনি ঐ পাঠান শালার কথা। ও এবার ঠিক হপ্তার দিন কারখানার দোরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর যা' পাব সব গ্যাঁড়া দেবে। তা ছাড়া এই বাড়ীওয়ালী মুকিয়ে আছে। তার পর খাবে কি? ছাই খাবে আর কি?

তার পর কিছুক্ষণ মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা হল। তার ভিতর থেকে দু'জনেই

রেগে উঠতে লাগলো। একবার একটা বেশ জোর চড়মারার শব্দ পাওয়া গেল, কেঁদে উঠলো একটা ছেলে, আর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো তার মা।

তার পর স্বামীটি গামছা কাঁধে ফেলে তেড়ে ফুড়ে বেরিয়ে গেল।

তার জানালার তলায় এই যে একটা ছোট্টখাট্ট ট্রাজেডীর অভিনয় হ'য়ে গেল, এতে বিকাশের মনটায় ভারী তোলপাড় লাগিয়ে দিলে। সে মনে মনে কল্পনা করলে যে, এমনি ছোটখাট দৈনন্দিন ট্রাজেডী এই বস্তীর প্রতি খোপে হয় তো হচ্ছে। স্বামী স্ত্রী এরা-পরস্পরকে ভালবাসে তাতে সন্দেহ নেই; কাবলীওয়ালা টাকাটা নিয়ে যেতেই মেয়েটা ছুটে গিয়ে তার নোলকের মায়া ভুলে স্বামীর জন্য চা নিয়ে এলো, এতে তার প্রচুর দরদ প্রকাশ হল। টাকাটা খোয়া যেতে তার স্বামীরও সবার আগে মনে পড়লো স্ত্রীর ঐ ছোট্ট নোলকটির কথা! তবু যে দু'দণ্ড তাদের কথা হ'ল তার মধ্যে বারো আনা খিটিমিটি ঝগড়া, শুধু অভাবের জন্য।

এমনি ভাবে দারিদ্র্যে কত স্নেহশীল নরনারীর হৃদয় শুষ্ক হ'য়ে জীবন জ্বালাময় মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, তার ঠিকানা আছে কি? অথচ এই দারিদ্র্যের মাঝখানেই মাথা ফুড়ে উঠছে কত ধনীর প্রাসাদ, যেখানে মুহূর্ত্তের বিলাসে যে অর্থ অপচয় হয়ে যাচ্ছে, তাতে এমনি বহু পরিবারের আঁধার ঘরে আলো হেসে উঠতে পারে।

এই কথা ভেবে বিকাশ তার প্রাণের ভিতর একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানের ভিতর ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলে সুবোধের তীব্র বিদ্রূপ—'কেদারা হেলান দেয়া 'সখের দরদী।' 'মুখের শেখ বুলি, প্রাণের কথা নয়—'

বিকাশ জানে—এ তিরস্কার কত মিথ্যা। জানে তার অন্তরে কি ব্যথা, কি আকুলতা। কিন্তু কি করতে পারে সে? এই সাগরের মত বিশাল দুঃখ এ প্রতিকার সে কি করতে পারে?

তখনি মনে হ'ল, কিছুই কি পারে না? ঐ যে পরিবার, ওদের একা

মাত্র টাকার জন্য এখনকার যে দুঃখ এ তো সে দূর করতে পারে! চাই কি দশ বিশটা টাকার জন্য কাবুলীওয়ালার অত্যাচার দূর করা ত' তার সাধ্যের অতীত নয়।

তাতে কিছুই হবে না বিশেষ, কিন্তু তবু একটু সাময়িক দুঃখ তো দূর হ'বে! একটা টাকা যদি বিকাশ ওদের দিয়ে আসে!

ভাবতে ভাবতে বিকাশ উঠে বসলো। দোর খুলে বের হ'ল, মতলব এই যে, এখনি পাশের গলির ভিতর দিয়ে ওই ঘরের সামনে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসে।

এতটা রাত যে হ'য়ে গেছে, বিকাশের তা খেয়াল ছিল না। ঘর থেকে বের হতেই সে শুনতে পেল রাতের খাবার ঘণ্টা।

কাজেই তখন সে খাবার ঘরে গেল। টাকাটা পকেটেই রইলো! ভাবলে, খেয়ে উঠে এক দৌড় মেরে দিয়ে আসবে।

খেতে খেতে কথাটা মনের মাঝে উল্টে পাল্টে ভেবে দেখলে। ক্রমে তার মনে হ'ল যে তার সঙ্কল্পটা একটা অবাস্তব খেয়াল। সবারই জানা ছিল যে গলির ভিতর বস্তীর কোনও কোনও ঘরে কতকগুলি খারাপ মেয়ে থাকে। বিকাশকে হঠাৎ রাত্তিরে ঐ গলির ভিতর যদি কেউ যেতে দেখে, তবে নিশ্চয়ই মনে ক'রবে—সে ঐ মেয়েদের বাড়ী চলেছে! ও বাবা! এমন কাজও করে?

ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল আজ রাতটা থাক, কাল ভোরে উঠে বস্তীর বাইরে দাঁড়িয়ে যখন ঐ স্বামীটা আফিসে যাবে, সেই সময় তাকে টাকাটা দিয়ে দিলেই হবে।

কিন্তু সে যদি বলে, 'তুমি কেন আমায় টাকা দিচ্ছ?' তখন কি জবাব দেবে বিকাশ? কি জানি কেন তার মনে হ'ল সব কথা খুলে বলাটা কিছুতেই চলবে না। তা ছাড়া, স্বামীকে টাকাটা দিলে সে যে স্ত্রীকে না দিয়ে বাজে খরচ করবে না তাই বা কে জানে?

তার পর ভাবলে সত্যকে দলে টেনে তাকে দিয়ে গোপনে টাকাটা পাঠিয়ে দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল টাকা-পয়সা বিষয়ে সত্যর সত্যপরতায় সন্দেহ করবার প্রচুর হেতু আছে। সে টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে অম্লানবদনে এসে ব'লতে পারে দিয়ে এসেছি।

ভাবতে ভাবতে খাচ্ছিল সে, এদিক সেদিক চাইতে পারে নি, কি খাচ্ছে তাও ভাল ক'রে দেখেনি।

তাতে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। বিকাশ দুধ খায়। তার দুধের বাটী ঠাকুর তার থালার পাশে দিয়ে গিয়েছিল। বিকাশ যখন মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে গিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে দুধের বাটী তুলে পাতে অর্দ্ধেকটা দুধ ঢেলে ফেললে, তখন তার হুঁস হ'ল।

পাশে যারা বসেছিল তারা হেসে উঠলো। বিকাশ অপ্রস্তুত হয়ে বাকী দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে, জল খেয়ে উঠে প'ড়লো।

যারা এ কাণ্ড দেখলো তারা ভাবলে যে আজকের খেলায় বিকাশের সামান্য ভুলে গোল হ'য়ে যাওয়ায় সে উন্মনা হ'য়ে উঠেছে। তাদের ভিতর থেকে শরৎ তাকে গিয়ে ব'ল্লে, ওকি ভাই! খেলার একটা accident নিয়ে অতটা মন খারাপ করতে আছে? Be a sportsman, হারজিত কি সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতটা বেশী ক'রে ভেবো না।"

বিকাশ হেসে বল্লে, "ক্ষেপেছ? একটা খেলা, তার জন্য আমি হব মন-মরা? কিছুই হয় নি আমার; শুধু একটা প্রব্লেম নিয়ে ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলাম একটু।"

শরৎ কিন্তু তাকে ছাড়লো না। তার সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে হাসি-তামাসা ক'রে বিকাশের মনটা হাল্কা ক'রে দিয়ে তবে তার নিজের ঘরে গেল।

তখন রাত্রি দশটা। বাইরে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবার ইচ্ছে থাকলেও এখন তা সম্ভব হ'ত না; কেন না হষ্টেলের ফটক বন্ধ হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া

কথাটা মনের ভিতর উল্টে পাল্টে দেখে বিকাশ স্থিরই করেছিল যে, এ কাজ করা চলে না!

এখন সে বাতি নিবিয়ে শোবার উদ্যোগ ক'রলে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে সে দেখলে। কিছু দেখা যায় না।

বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে প'ড়েছে।

তার মনে হ'ল, এখন যদি সে চুপচাপ একটা টাকা তাক ক'রে ঠিক ঐ ঘরের দাওয়ার উপর ফেলতে পারে, তবে কাল সকালে উঠে ওরা টাকাটা পাবে, কোনও সোরগোলও হবে না, কেউ জানতেও পারবে না।

টাকাটা বে'র ক'রে সে হাতে নিলে। খানিকক্ষণ আবার ভাবলে। ভাবতে ভাবতে সে ফস্ করে টাকাটা ফেলে দিলে।

তাক্‌টা বড্ড বেশী ঠিক হ'য়ে গেল। ওরা স্বামী স্ত্রী শুয়ে ছিল ঐ দাওয়াতেই, অন্ধকারে তেতালা থেকে দেখা যায় নি! টাকাটা টন্ ক'রে এসে প'ড়লো স্বামীটার মাথায় ঠিক রগের উপর।

ঘুম ঠিক তার তখনও আসে নি, একটু তন্দ্রা মত হ'য়েছিল। টাকাটার ঘা' খেয়ে সে অমনি হাউমাউ ক'রে লাফিয়ে উঠলো। ভাবলে, কেউ ঢিল ছুঁড়েছে। চীৎকার ক'রে উঠলে, "কেরে শালা? জ্বাল্‌তো লণ্ঠনটা।

স্ত্রী উঠে কাঁপতে কাঁপতে লণ্ঠন জ্বাললে। স্বামী ততক্ষণ লাঠি নিয়ে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত।

লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল—ঢিল নয়—টাকা!

স্ত্রী বল্‌লে, "ওগো, চেয়ে দেখ—কি?" বেশ উল্লসিত কণ্ঠে। কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল।

টাকাটা দেখেই স্বামীর মুখ গভীর হ'য়ে উঠলো। সে অনেকক্ষণ ধ'রে টাকাটাকে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো, যেন তার ভিতর কোথাও লেখা আছে তার সমস্যার উত্তর, শুধু পাঠ উদ্ধার ক'রলেই হয়!

তারপর—টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে—দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে দাঁত কিড়মিড়

ক'রতে ক'রতে সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার চুল ধ'রে টেনে দমাদম প্রহার দিতে দিতে ব'ল্লে, "তবে রে হারামজাদী, এই কর্ম্ম করিস তুই, হোটেলের বাবুদের সঙ্গে পীরিত—"

এখন স্ত্রীটি যদিও যথোচিত কদাকার তবু তার বয়স আছে। আর স্বামীটি স্ত্রীকে খুব বেশী কদাকার ব'লে হয় তো মনেও করে না! তাই মনে মনে তার একটু ভয়, একটু সন্দেহ বরাবরই ছিল। কাজেই সে নিশ্চয়ই ক'রলে যে, রাত দু'পুরে এই টাকার ঢিল ছোড়া—এ একেবারে হাতেনাতে ধরা।

কাতর আর্ত্তনাদের সঙ্গে স্ত্রী ব'ল্লে, "হোটেলের বাবুদের কাউকে সে চোখেও দেখে নি—" এটা একটু অত্যুক্তি হ'লেও মূলতঃ সত্যি!

স্বামী ব'ল্লে, 'চ'খে দেখিস নি, পীরিত করিস নি, তবে রাত দুপুরে তোকে টাকা ছুড়ে দেয় কেন রে পোড়ারমুখী?"—আর এক ঘা।

চেঁচামেচী আর্ত্তনাদ চলতে থাকলো, পাশের ঘরের লোক ছুটে এলো! তারা তাদের ছাড়িয়ে দিলে কিন্তু স্বামীটা স্ত্রীকে শাসাতে লাগলো যে, তাকে কুচো কুচো ক'রে কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে, আর হষ্টেলের জানালার দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগলো যে, কাল সকালেই সুপারটেন বাবুর কাছে নালিশ ক'রে এর সুবিচার চাইবে।

তার হিতাকাঙ্ক্ষার এই বীভৎস পরিণতি দেখে বিকাশ ধপ ক'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়লো। তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ ক'রতে লাগলো, কণ্ঠতালু শুষ্ক হ'য়ে গেল—তার ভাবনা চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে এই চিন্তাটাই তাকে অভিভূত ক'রলে যে কাল সকালে কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না! সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে নালিশ হ'লেই তদন্ত হবে, আর তদন্ত হ'লেই সবাই জানবে যে বিকাশই টাকাটা ফেলেছিল! কেন যে সে টাকাটা ফেলেছিল, সে সম্বন্ধে সত্য কথাটা কেউ বিশ্বাস ক'রবে না।—কেন ক'রবে? এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ থাকতে অমনি একটা গাঁজাখুরী গল্প কে বিশ্বাস ক'রবে?

তার পর? বিকাশ আর মুখ দেখাতে পারবে না কাউকে। রাষ্টিকেট

তো হবেই সে, তার পর বাড়ীতে উঠে যে কারও কাছে দাঁড়াবে, সে পথও থাকবে না।

বিকাশের বাবা-মা নেই ; তার মাসিমা তাকে স্নেহ করেন এবং তাঁর পরিবারেই সে মানুষ। মেসোম'শায় বড় উকীল। তিনিই বিকাশের পড়ার খরচ দেন।

বাপ-মা নেই—এখন বিকাশের মনে হ'ল সেটা একটা লাভ! বাপ-মার কাছে মাথা হেঁট হবার অবসরটা নেই। মাসিমা—মেসোমশায়, সেখানকার ভাই বোনেরা—তাঁদের সঙ্গে আর জন্মে দেখা হবে না!

যখন পাশের বস্তীতে গোলমাল থেমে গেল, তখন বিকাশ একটু সুস্থির হ'য়ে ভাবতে পারলে। ভাববে আর কি ছাই, ভাবলে, অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায়ই নাই।

অতএব, লম্বা দিতে হ'বে।

কোথায় ?—সে কথা পরে ভাবা যাবে!

এখন আর বিলম্ব নয়!

ভোর হ'তেই সে উঠে সেই সর্ব্বনেশে জানালার পাশে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে। দেখা গেল স্বামী স্ত্রী সপরিবারে নিদ্রিত।

এই সুযোগ!

সামান্য কিছু তল্পী তল্পা গুছিয়ে, টাকা কড়ি যা কছু ছিল নিয়ে সে কটকে গিয়ে দ্বারোয়ানকে ব'ল্লে, "ভয়ানক জরুরী দরকারে দেশে যাচ্ছি—ফার্ষ্ট ট্রেণ ধরতে হবে!

---

## তিন

হাওড়া ষ্টেশনে পৌছে বিকাশ টিকিট কাটলে কাশীর। কাশীর কোনও ট্রেন ছাড়বার বিস্তর বিলম্ব, কাজেই সে প্লাটফরমে বসে ভাবতে লাগলো, **কঃ** পন্থা ?

হুস্ হুস্ করে একটার পর একটা ট্রেন আসছে—যাচ্ছে। যে গুলো আসছে তা' থেকে গিজ গিজ ক'রে লোকের স্রোত বেরিয়ে আসছে সরু পথ দিয়ে। বিকাশ চেয়ে আছে সে দিকে, কিন্তু দেখছে না। তার মনে কেবল ভাবনা—কি করা যাবে ?

মাসিমাকে একটা খবর দিতেই হবে, নইলে তিনি ভেবে সারা হবেন, আর চাই কি চারিদিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে এমন একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেবেন, যাতে সে ধরা প'ড়ে যাবে। তাই তাকে একটা খবর দিয়ে নিশ্চিন্ত ক'রে দেওয়া ভাল। কিন্তু কি খবর সে দেবে ? অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক রকম মুসাবিদা ক'রে সে মনস্থির ক'রে পোষ্টাফিসে গেল। সেখান থেকে একখানা পোষ্টকার্ড নিয়ে লিখলে :

"মাসিমা,

কিছুদিন থেকে শরীরটা বিশেষ খারাপ হ'য়ে পড়েছে। ডাক্তার বললেন চেঞ্জে যাওয়া দরকার, তাই যাচ্ছি। বিশেষ কিছু হয় নি, কিছুদিন চেঞ্জে থাকলেই সেরে যাবে, আপনারা ভাববেন না ! আর আমাকে নীচের ঠিকানায় একশো টাকা পাঠিয়ে দেবেন।"

ঠিকানাটা দিলে তার এক বন্ধুর—সে সম্প্রতি পড়াশুনা ছেড়ে হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে চেলা হয়েছে ! সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধুকে লিখে দিলে যে তার নামে কোন টাকাকড়ি চিঠিপত্র এলে কাশীর একটা ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।

চিঠি দু'খানা বাক্সে ফেলে বেশ খাতির জমা হ'য়ে ব'সতে এতক্ষণে তার পেট তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে সকালে চা খাওয়ার সময় পায় নি সে, আর মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ও আসন্ন। সে ষ্টেশনের খাবার ঘরে গিয়ে উদরকে শান্ত ক'রে আবার প্লাটফরমে এসে বসতেই—

"এই যে বিকাশ কি মনে ক'রে?" বলে তাকে চেপে ধ'রলে হরিপদ ব'লে একটা ছেলে। সে বিকাশের সঙ্গেই পড়ে, শ্রীরামপুর থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জার হ'য়ে রোজ আসে।

বিকাশ চমকে' উঠলে। তার পর সামলে ব'ললে, "এই এলাম—মানে একটু যাচ্ছি।"

"এখন যাচ্ছ—কোথায়? কলেজ যাবে না"

"না ভাই, আজ আর কলেজ যাওয়া হবে না", ব'লে সে তাড়াতাড়ি স'রে প'ড়লো, ভাবটা এই—যেন এক্ষুণি ট্রেণ ধ'রতে হবে তার। চোঁ চাঁ ছুট দিয়ে শেষ প্লাটফরম পার হ'য়ে একেবারে Goods Shed-এর ভিতর ঢুকে হাঁফ ছাড়লে।

মনে হ'ল একটা ফাঁড়া কেটে গেল। প্লাটফরমের মত অমন একটা প্রকাণ্ড জায়গায় বসা তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

Goods Shed-এর একটি ছোকরা কেরাণী এলো, নমস্কার ক'রে ব'ল্লে, "এই যে বিকাশবাবু, ভাল আছেন বেশ? এখানে কোনও কাজ আছে? বলুন আমি এক্ষুণি ক'রে দিচ্ছি।"

এ আবার কে রে? কোনও জন্মে একে বিকাশ দেখেছে ব'লে মনে হ'ল না। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে সে শুধু ব'ল্লে, "না কোনও কাজ নেই, এমনি।"

"ও! কালকে আপনার ভারী unfortunate miss হ'য়ে গেল। বলটা ভারী পেছল ছিল, না?"

ও বাবা, এ যে কালকের খেলার কথা বলে! বিকাশ কোনও মতে পালাবার ফিকির খুঁজতে লাগলো।

ছোকরা ব'লেই গেল, "আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। চেনবার কথাও নয়। আমি তো আপনার মত সব চিন্ খেলোয়াড় নই। তবে এক আধটুকু খেলি আর খেলা দেখতে রোজ যাই। আপনার খেলা বোধ হয় কোনও দিন মিস্ করি নি। আর দেখুন—অনিলবাবু ওটা কি ক'রলেন, একটা sure goal mis-kick ক'রে মাটি ক'রলেন।"

বিকাশ ঘেমে উঠলো। কালকের খেলা সম্বন্ধে আলোচনায় তার বিশেষ রুচি ছিল না। কাজেই সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে' "ও রকম accident খেলতে গেলে হ'য়েই থাকে—আমি এখন আসি, আমার ট্রেনে উঠতে হবে।" ব'লে সে ষ্টেশনের দিকে ফিরলে।

কিন্তু এতে ছোকরাটির হাত এড়ানো গেল না। "ও! ট্রেনে উঠবেন? 5 Up না 7 Up? চলুন আমি আপনাকে উঠিয়ে দিয়ে আসি!" ব'লে সে সঙ্গ নিলে।

বিকাশ বুঝলো সে শক্ত পাল্লায় প'ড়েছে। এ ছোকরা 'ফ্যান'—এরা জোঁকের মত লেগে থাকে, ছাড়ান দায়। এখন কোনও ট্রেনে কোথাও যাওয়া যেতে পারে কি না সে সম্বন্ধে বিকাশের কোনও ধারণা ছিল না, তা ছাড়া 5 up 7 up প্রভৃতি ভাষা যা রেলকর্ম্মচারীদের মুখে মুখে থাকে, তা বিকাশের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অথচ বিকাশ বুঝতে পারলে যে, এই লেপ্‌টান সঙ্গীর হাত থেকে উদ্ধার হবার একমাত্র উপায় এক্ষুনি ট্রেনে উঠে লম্বা দেওয়া! ট্রেনের সময়গুলি তার কণ্ঠস্থ না থাকায় কোনও একটা বিশিষ্ট ট্রেনের নাম ক'রে তার উদ্ধার হবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল! এই ফ্যানটিকেই কাজে লাগাতে হবে। সে বল্‌লে, "কোন ট্রেনে গেলে সুবিধে হবে ঠিক বুঝতে পারছি নে! আপনি রেলের লোক, আপনি নিশ্চয় ব'লতে পারেন!

"নিশ্চয় নিশ্চয়! কোথায় যেতে হবে বলুন!"

"যাব আমি অনেক দূর, আপাততঃ কাশী—"

"কাশী যাবার ট্রেনের তো অনেক দেরী—"

"কিন্তু ভাবছি যাবার পথে, ওর নাম কি ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে নেমে আমার পিশে মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবো!"

"ব্যাণ্ডেল—তা এই তো এক্ষুনি 7 up ছাড়বে। চলুন তাড়াতাড়ি! টিকিট ক'রেছেন? তবে আবার কি? চলুন!" ব'লে লোকটা বিকাশকে এক পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে একেবারে প্লাটফরমে নিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে বললে 'আপনার টিকিটটা দিন পাঞ্চ করিয়ে নি!"

বিকাশ টিকিট দিলে। যে লোকটি টিকিট পাঞ্চ করছিল সে টিকিট দেখে বললে, "এ যে কাশীর টিকিট, এগাড়ীতে কেমন ক'রে যাবেন?"

"আমি ব্যাণ্ডেলেই একবার নামবো"—

"ব্যাণ্ডেলে তো journey break ক'রতে পারবেন না।"

'ফ্যানটি বললে, "তবে এক কাজ করুন, টিকিটটা আপনি পকেটে রেখে দিন, অমনি চলে যান, আমি গার্ডকে বলে দিচ্ছি!" তারপর টিকিট চেকারকে বল্‌লে, "ইনি কে জানেন তো, বিকাশ বাবু,—কলেজের প্রসিদ্ধ গোলকীপার—

টিকিট কলেক্টর হেসে বল্‌লে, "তাই নাকি? নমস্কার। আচ্ছা তাই যান আপনি—যাও তুমি সব ঠিকঠাক ক'রে দাও গে!"

ট্রেনে বিকাশকে বসিয়ে দেবার আগে তার ফ্যানটি এমনি ক'রে আর পাঁচ সাতটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে—যারা সবাই অল্পবিস্তর ফুটবল ফ্যান এবং সকলেই বিকাশের খেলার খবর রাখে। এতে বিকাশ যথোচিত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তার সঙ্কল্প চুপি চুপি সরে পড়া! তার বদলে হোল একটা বিজ্ঞাপন। ষ্টেশনের প্লাটফরমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঢাক পিটিয়ে যদি কেউ মেগাফোন যোগে ব'লতো যে বিকাশ 7 up train এ কলকাতা ছেড়ে কাশী যাবার পথে ব্যাণ্ডেল যাচ্ছে তবে এর চেয়ে বেশী জানাজানি হ'ত না!

যা' হ'ক ট্রেনটা ছাড়লে বাঁচে বিকাশ। গাড়ীতে তার সামনে ব'সে

ফ্যানটি যে অনর্গল বকে যাচ্ছে ও বকাচ্ছে তাতে সে প্রচুর অস্বস্তি বোধ করছিল! এ আপদ কাটলে বাঁচে।

শেষে এ আপদ কাটলো বটে, কিন্তু বিপদ কাটলো না। ট্রেন যখন ছাড়ে তার একটু আগে কাকে দেখে ফ্যানটি স্যুট ক'রে নেবে গিয়ে একজনকে ধ'রে এনে বিকাশের পাশে বসিয়ে দিল। বল্লে, "এইবারে খুব সুবিধে হয়েছে! what luck যে ইনি এই ট্রেনেই যাচ্ছেন! ইনি সুনীল বাবু ব্যাণ্ডেলের A. S. M; D. T. S ও C. M. O-র কাছে এসেছিলেন ছুটির দরবারে; এই ট্রেনেই ফিরছেন! ইনি ব্যাণ্ডেলে আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আমি ব'লেছি সব।"

রেলের কর্ম্মচারীগুলি A. B. C. D প্রভৃতি অক্ষর এমন গড়্‌গড়্ ক'রে বলে যায় যেন সে সাঁটের তাৎপর্য্য বিশ্বসংসারের সবারই বেশ সড়গড় আছে। বিকাশ কিন্তু হকচকিয়ে গেল্। A. S. M কথাটার অর্থ সে বেশ একটু মানসিক গবেষণা ক'রে স্থির ক'রলে, অ্যাসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার। কিন্তু D.T. S ও C. M. O-র কোনও হদিস পেলো না। সেইটার অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে, এমন সময় সময় ট্রেন ছেড়ে দিলে এবং ফ্যানটি চলতি গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামলেন।

A. S. M সুনীল বাবু বাক্য স্ফুরণ ক'রতেই জানা গেল যে ইনিও ফুটবল 'ফ্যান' এবং শুধু ফ্যান নয়, এর নিজের বর্ণনা অনুসারে ইনি একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। ইনিও কাল ইলিয়ট শীল্ডের সেমি ফাইন্যাল দেখতে গিয়েছিলেন, সুধু সুবোধ চ্যাটার্জ্জীর খেলা দেখতে। তার খেলা একটা trat! A. S. M যখন E. B. Railwayতে প্রথম চাকরী করতেন, তখন অনেক বার E. B. R টিমে খেলে সুবোধ চাটার্জ্জির বিরুদ্ধে খেলেছেন। অবশ্য ব্যাক হিসাবে সুনীল বাবুরও যথেষ্ট নাম ছিল, কিন্তু তবু সুবোধের কিকের তারিফ তিনি না করে পারেন না। সুনীল যেবার শীল্ডে খেলেছিলেন—"

ফুটবলের ইতিহাস বিকাশের যতদূর জানা ছিল, তাহাতে E. B.

Railway টীমে সুনীল ব'লে কেউ কোনও দিন খেলে নি—অন্ততঃ ঐ নামে কোনও নাম করা খেলোয়াড় কখনও ছিল না। তা' হোক, এই সুস্পষ্ট হাম্বাগটি যত ইচ্ছা আত্মপ্রশস্তিগান করুক, তাতে বিকাশের তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার সঙ্গে ঐ সুবোধ চাটার্জির যে যাচ্ছে-তাই খোসামুদী করতে লাগলো সেটা বিকাশের ভাল লাগলো না। অবশ্য সুবোধ খেলে ভাল, আর বেশ কৃতি ক্যাপ্টেন ও ব্যাক, কিন্তু তবু তার কলেজ টীমের খেলার কথায় লোকটা যে কেবলই সুবোধের নামে বাহবা দিতে লাগল, তা বিকাশের মোটেই ভাল লাগল না! ব্যাক সুবোধের সঙ্গে সঙ্গে গোলকীপার বিকাশের নামটাও অবশ্য করা উচিত।

লোকটার অসহ্য ধৃষ্টতার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল! সে বল্‌লে, "কাল যদি সুবোধ ব্যাকে না থাকতো, তবে আপনারা অন্ততঃ আর তিনটে গোল খেতেন—সে যা বাঁচিয়েছে সে তিনটে বল, সে wonderful! সে ঠেকাতে না পারলে আপনি কিছুই করতে পারতেন না।"

এ কথায় বিকাশ ভিতরে ভিতরে রাগে ফুলতে লাগলো। সুবোধের যে কটা খেলার তারিফ লোকটা করলে, সে গুলোকে সে অতটা বাড়ালে লোকটা খেলার কিছু জানে না বলে। কেন না সুবোধের সে কটা শট্ অত্যন্ত সহজ। পক্ষান্তরে বিকাশ গোলে দাঁড়িয়ে তিন তিনবার যে সঙ্কটময় বল ধ'রে ফিরিয়েছে সেটা সত্য সত্যই বাহাদুরী কাজ। লোকটা সে সম্বন্ধে কিছু জানে না, জানে শুধু যে, একটা বল বিকাশের হাত থেকে ফস্কে পড়ে গোল হ'য়ে গেছে।

লোকটার কথা ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু চরম হ'ল যখন সে বিকাশকে বেশ মুরুব্বীর চালে বললে যে "বিকাশের খেলায় খুব 'প্রমিস্' আছে এবং কালে সে ভাল খেলোয়াড় হতে পারবে, কিন্তু"—ব'লে ফুটবল খেলায় বিশেষতঃ গোলকীপারের কখন কি করা উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ ক'রলে!

বিকাশের দম ফাটবার মত হ'ল। লোকটাকে মুখে জবাব দেওয়ার চেয়ে সোজা ঘা' কতক লাগিয়ে দেওয়াই তার সঙ্গত মনে হ'ল, কিন্তু A.S.M. বাহাদুরকে চটাতে তার ভরসা হ'ল না। সে রেলের আইন ভঙ্গ ক'রে ব্যাণ্ডেল নামতে যাচ্ছে—A.S.M. বাহাদুর তাকে সে অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন—তিনি চটলে তাকে নাকাল ক'রবেন। তাই সে চেপে গেল।

বিকাশের হয় জানা ছিল না, না হয় তার তখন মনে ছিল না যে A.S.M. এর তাঁকে নাকাল করবার শক্তি, এবং তার অপরাধের শাস্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। হয়তো তার অপরাধ হয়ই নি, আর হ'য়ে থাকলেও রেল কর্ম্মচারীরা তার কাছে কেবল হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত ডবল ভাড়া আদায় ক'রতে পারেন, তার বেশী কিছুই পারেন না।

কিন্তু বিকাশ একে কলকাতা থেকে পলাতক, তাতে আবার A.S.M.এর কথায় তার মাথা হয়ে গেছে গরম, অত ভেবে চিন্তে স্থির করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। সে অনেকক্ষণ ধ'রে অন্তরে অন্তরে ফুলতে ফুলতে লোকটার কথাগুলো গলাধঃকরণ ক'রলে।

তারপর সুনীল তাকে আপ্যায়িত ক'রতে আরম্ভ ক'রলে এবং জানালে যে বিকাশ যেখানে যেতে চায়, সেখানে সে তাকে পাঠিয়ে দেবে, তবে খাওয়া দাওয়াটা সুনীলের ওখানে ক'রতে হবে। তারপর সুনীলের বাড়ীতে কিম্বা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে একটু বিশ্রাম ক'রে বৈকালে আহারাদির পর কাশী যাবার সব চেয়ে সুবিধা গাড়ীতে সুনীল তাকে উঠিয়ে দেবে, যাতে কোনও কষ্ট না হয়। সুনীল এও জানালে যে ব্যাণ্ডেলে অনেক ফুটবল-ভক্ত লোক আছে। বিকেলে চা' খাবার সময় তাদের ডেকে বিকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

এই শেষ কথাটায় বিকাশের কর্ত্তব্য স্থির হ'য়ে গেল চট্‌পট্। এতক্ষণ সে ভাবছিল, এ আপদ থেকে উদ্ধার হবার কি উপায়? একে এর কথাবার্ত্তা অসহ্য, তাতে আবার ব্যাণ্ডেলে গেলে একেবারে এর কাছে নজরবন্দী হ'য়ে

থাকবে! তার উপর যখন শুনলে যে আরও ফুটবল ফ্যান জুটিয়ে তার ব্যাণ্ডেল ভ্রমণটাকে ঢাক পিটিয়ে জানাবে এবং হয় তো বা খবরের কাগজে ছাপাবে, তখন ভাবলে, আর নয়!

গাড়ীটা চুঁচুড়ার প্লাটফরমে লাগতেই সে চট্ ক'রে তার সুটকেশ নিয়ে নেমে প'ড়লো। বল্‌লে, "ভেবে দেখলাম এখান থেকে চুঁচড়োর বড় বাজারে একটা বরাত সেরে পিশেম'শায়ের কাছে যাওয়াই সুবিধে হবে।" বলেই হন্ হন্ ক'রে চললে। A.S.M.-কে কোনও কথা বলবার সুযোগ দিলে না।

Overbridge ডিঙ্গিয়ে গেটে গিয়ে সে কাশীর টিকিট দেখিয়ে বললে, যে ভুল ক'রে সে এ গাড়ীতে উঠেছে।

টিকিট কালেক্টর বললে, "সে তো ঠিক করেন নি,—Penalty দিতে হবে, হয়তো—" তারপর একটু থেমে—"যাক্ গে, যান চ'লে।" আবার এই সামান্য কিছু পয়সা আদায় ক'রবার জন্য বই দেখে খাতা টেনে লেখবার হাঙ্গামা করার প্রবৃত্তি লোকটির ছিল না।

বিকাশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। পেনালটী দিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেও সে যথেষ্ট হাঁফ ছাড়তো। কেবল একটা আপশোষ হ'ল তার এখন এমনি একটা বাজে জুজুর ভয়ে সে ঐ A.S.M.এর বিযাক্ত কথাগুলো নির্ব্বিবাদে হজম ক'রেছে! মনের মত দু'ঘা লাগাবার—নিদেন বেশ লাগসই কয়েকটা কথা বলবার নষ্ট সুযোগের জন্য তার হাত এবং জিভ যেন টন্ টন্ করে উঠলো।

যাক, একটু স্বস্তি পেয়ে তার প্রথম মনে হ'ল এখানে একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়। কিন্তু তখনি ভাবলে, না এখানে ভিড়ের মধ্যে আর থাকা হবে না—কোথা থেকে কোন 'ফ্যানের' পাল্লায় প'ড়ে যাব।

রেলের এক কর্ম্মচারীর কাছে সে কাশী যাবার ট্রেণের সময় জানতে গেল। সে লোকটি বললে, "একটা লোক্যাল ট্রেণে ব্যাণ্ডেল গেলে সেখান থেকে একটা দ্রুতগামী ট্রেণে যাওয়াই সব চেয়ে সুবিধে। কিন্তু—ব্যাণ্ডেল!

একেবারে সেই A.S.M.-এর খপ্পোরে আবার? প্রাণ গেলেও নয়। যা হ'ক একটা মন্থরগামী প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে টিকিয়ে টিকিয়ে যাওয়া স্থির ক'রে সে বাইরে ভেসে প'ড়লো নির্জ্জনতার সন্ধানে।

## চার

যাক, কাশী এসে পৌঁছোন গেছে!

পরম স্বস্তির সঙ্গে বিকাশ এই কথাটা আয়ত্ত ক'রে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে নিলে।

এখন কি ক'রবে সেই চিন্তা।

একটা ধর্ম্মশালায় গিয়ে অস্তানা নিলে। দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে সে বেরিয়ে প'ড়লো কাশী দর্শন ক'রতে। ভাবলে—এখানেই কিছুদিন একটা কাজকর্ম্ম করা যাক, তার পর ধীরে সুস্থে ওদিককার গোলমালের কথা লোকে একটু ভুলে গেলে বাড়ী ফেরা যাবে।

এদিক ওদিক ঘুরে সে হরিদ্বারে বন্ধুর কাছে কাশীর যে ঠিকানার কথা লিখেছিল সেখানে গেল চিঠির খোঁজ ক'রতে। ঠিকানাটা একটি দোকান-দারের, বিকাশের সঙ্গে তার সামান্য আলাপ হ'য়েছিল এককালে।

গিয়ে দেখলে চিঠি এসেছে একখানা, কিন্তু টাকা আসে নি। চিঠিখানা খুলে দেখে সে হতভম্ব হ'য়ে গেল! চিঠিখানা হরিদ্বারের ঠিকানায় লেখা; সেখান থেকে redirect করা! তাতে তার মেশোম'শায় লিখেছেন, "তুমি

তোমার মাসিমাকে লিখেছ হরিদ্বার যাচ্ছ, শরীর খারাপ ব'লে! কাগজে দেখলাম সেই দিন ফুটবল খেলেছিলে এবং খেলার রিপোর্টার লিখছেন যে তুমি in the pink of condition. এমন স্বচ্ছ মিথ্যেকথা বানিয়ে লিখে ক'লকাতা থেকে হঠাৎ পালাবার মানে কি ?—

"যা হ'ক তুমি পত্র পাওয়ামাত্র ফিরে আসবে। তোমার আসবার খরচের জন্য মোহান্ত মহারাজের কাছে টাকা পাঠালাম, তিনি তোমাকে টিকিট কিনে গাড়ীতে চড়িয়ে দেবেন, এবং তুমি সোজা বাড়ী চ'লে আসবে। কোনও ওজুহাত আমি শুনবো না ?"

চিঠি প'ড়ে প্রথমে সে হ'য়ে গেল একেবারে স্তব্ধ। মিথ্যে কথাটা এমন ক'রে হাতে নাতে ধরা প'ড়ে যেতে সে দারুণ লজ্জায় ম'রে গেল। তার মনে হ'ল, আগের কথা চুলোয় যাক; তার এই ধরা পড়া মিথ্যে কথার পর আর মেশোম'শায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

এখন উপায় কি ? টাকা যে ক'টা তার কাছে ছিল, তা' প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, এখন কাশীবাসের খরচা আসবে কোথা থেকে ?

টাকার ব্যাগটা বের ক'রে নিয়ে তার শীর্ণ সঞ্চয়ের দিকে অনেকক্ষণ সে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল কেবল। সে হিসেব ক'রে দেখলে যে যা' আছে তাতে দিনে চার আনা খরচ ক'রলে বড় জোর চার দিন চলে। কত কমে দু'বেলার খাওয়া চলে তার নানা রকম মুসাবিদা ক'রতে লাগলো। হিসাব করে দেখলে যে শুধু ছোলার ছাতু ও গুড় খেলে বেশ কিছুদিন চালান যাবে। কত গরীব লোক তো এ দেশে তাই খেয়ে থাকে।

ছাতু গুড় খেয়ে ধরমশালায় শুয়ে যতদিন পারে চালাবে, আর এর মধ্যে কোনও একটা রোজগারের উপায় ক'রতে হবে। তার পর ধীরে সুস্থে বিচার করা যাবে শেষ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—অর্থাৎ মেসোমশায়ের সমস্যার কি করা যাবে সে সম্বন্ধে নির্ণয় করা যাবে। এই স্থির ক'রে সে ছাতু ও গুড় কিনে ধরমশালায় ফিরবে, এমন সময় মনে হ'ল—জল খাবার একটা পাত্র তো নিতান্তই দরকার।

একটা যে কোনও রকমের গেলাস কিনতে গেলেই তো তার খোরাকীর সম্বলের গায় একটা মোটা রকমের ঘা লাগবে। অনেক বিবেচনা ক'রে শেষে একটা মাটীর খুঁটি কিনলে।

তার কাপড় চোপড় ও দরকারী আর কিছু জিনিষ সে নিয়ে এসেছিল একটা মাঝারী রকম স্যুটকেসে। ধরমশালায় সেটা বন্ধ ক'রে রাখবার কোনও সুযোগ নেই দেখে একদিন সে তাকে হাতে করেই সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছিল। তারপর সেটা সে রেখে দিয়ে যেতো ধরমশালার একটা ঘরে একজন পশ্চিমা ব্যবসায়ী ছিলেন তার কাছে। ব্যবসায়ীটি পরম সজ্জন। বাঙালী জাত, বিশেষ বাঙালী যুবকের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা। তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে থাকেন এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস যে বাঙ্গালীর যুবশক্তিই ভারতের আশা। ভারী আত্মীয়তা হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে বিকাশের শুধুই বাঙালী যুব-ভক্তির জন্য।

আজ ছাতু গুড় নিয়ে ফিরে সে দেখলে যে, সেই পশ্চিমা ব্যবসায়ী পাততাড়ি গুটিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন, বিকাশের স্যুটকেসটি ফিরিয়ে দেবার কোনও ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করেন নি।

মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়লে বিকাশ! এখন তার মনে হ'ল যে তার স্যুটকেশের ভিতর যা সব জিনিষ পত্র ছিল, তার মোট দাম দেড় শো, দুশো টাকার কম হবে না। শাল, সিল্কের পাঞ্জাবী, চাদর, সৌখীন পশমী পাঞ্জাবী প্রভৃতি এবং—তার ঘড়িটা!—ভাবতে তার দম বন্ধ হ'য়ে এলো, গাল চাপড়াতে ইচ্ছে হ'ল। কি মূর্খ সে। ধর্মশালায় অজানা অচেনা যাযাবর লোকের কাছে ওটা রাখবার কোনও দরকারই ছিল না। সোজা বুদ্ধি হ'ত তার ঐ চেনা দোকানদারটির কাছে রেখে দেওয়া। এই সোজা বুদ্ধিটা যে তার মাথায় খেলে নি, এতে নিজেকে পরম বেকুব বলে তার জ্ঞান হ'ল। লোকসানে যত দুঃখিত সে হ'ল, তার চেয়ে বেশী সে হ'ল লজ্জিত এই পরম বেকুবীর জন্য।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ছাতু গুড় ও জল নিয়ে খেতে বস্‌লো—কেন না তার

দুশ্চিন্তা যতই থাকুক তার সুস্থ সবল জঠরের তলবের তীব্রতা এখন সব দুশ্চিন্তাকে জোর গলাধাক্কা দিচ্ছিল। দু গ্রাস খেয়ে এক গ্লাস জল খাবার পর যখন ক্ষিদের বেগটা কিঞ্চিত প্রসমিত হ'ল, তখন সে আবার ভাবতে পারলো। এখন চট্ ক'রে বিদ্যুতের মত তার মাথায় এই কথাটা চমক দিয়ে গেল যে তার মেসোম'শায়ের চিঠি সাত দিন আগে লেখা। এতদিন তার কোনর উত্তর না পেয়ে তিনি নিশ্চই তাকে ফিরিয়ে নেবার অন্য ব্যবস্থা ক'রেছেন। তার কাশীর ঠিকানা নিশ্চয়ই তিনি হয় পেয়েছেন কিম্বা পাবেন দু'একদিনের ভেতর। কে জানে টেলিগ্রাম মারফৎ এখনি হয় তো কাশীতে খোঁজ তল্লাস আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এখানে থাকলে তার ধরা প'ড়তে দেরী হবে না। ধরা প'ড়লে—ওরে বাপরে! সে কি ভয়ানক লজ্জার কাণ্ড হবে তা ভাবতেই পারলে না সে!

পালাতে হবে কাশী থেকে।—আরও পশ্চিমে কোথাও। কেমন ক'রে?—টাকার থলির দিকে চেয়ে সে হতাশ হ'ল। এ যে শুধু সাড়ে তিন দিনের খাবার সম্বল। রেল ভাড়ায় খরচ ক'রলে সে খাবে কি?

তার শোনা ছিল যে কাশীতে কেউ নাকি অভুক্ত থাকে না। অনেক নাকি 'ছত্র' আছে যেখানে বিনা পয়সায় রোজ আহার পাওয়া যায়, তা তার জানা ছিল না। তবু তার মনে হ'ল কাশীতে থাকলে যদিও বা কোনও একটা ছত্রে খেয়ে কয়েকটা দিন কাটান যেত, কাশীর বাইরে গেলে তো সে উপায় থাকবে না সুতরাং এই সামান্য সম্বল রেল ভাড়ায় খরচ ক'রলে শেষে সে খাবে কি?

অনেক গবেষণার পর স্থির হ'ল যে রেল ফেল হবে না—হেঁটে লম্বা দিতে হবে। বেঁচে থাকুন শের শা—মানে, বাঁচবেন আর কেমন ক'রে?—যেখানেই থাকুন সুখে থাকুন—তিনি পত্তন ক'রে গেছেন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড়ের। সেই পথে যাত্রা ক'রতে হবে!

মনে হ'ল সুটকেসটা গিয়ে বাঁচা গেছে! নইলে সেটা হ'ত একটা বোঝা!

বুদ্ধি স্থির হ'য়ে যাবার পর বিকাশ মনে একটা অপূর্ব্ব আরাম ও শান্তি অনুভব ক'রতে লাগলো। এ বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার—পরকালে একটা

গল্প করবার বিষয় হবে। হাঁটা কিছু শক্ত কাজ নয়। পা' দুটো আছেই তো হাঁটবার জন্য! তার যখন কোনও বিশেষ সময়ে যাবার তাড়া নেই, মিছেমিছি রেলগাড়ী বা বাস্-ফাস্ চ'ড়ে হুটোপাটি করে যাবার কি প্রয়োজন? যাবে সে ধীরে সুস্থে হেঁটে আপন খুসীতে। বিশ পঞ্চাশ মাইল হাঁটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। এই তো আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা এখনো হেঁটে সারা ভারত ভ্রমণ করে। আর বেশী কথা কি? মাসিমার কাছে শুনেছে তাঁর দিদিমা নাকি দেশ থেকে পায়ে হেঁটে জগন্নাথ গিয়েছিলেন, আর সেই দিদিমার কোন ঠাকুরদা' নাকি বৃন্দাবন থেকে একটা বিগ্রহ মাথায় ক'রে হেঁটে এসেছিলেন বিক্রমপুরে! দু' চার দিন হেঁটে বেড়ান সে একটা তুচ্ছ কথা!—

বিশেষ যেখানে হাঁটবার দরকার আছে। এতদিন যে বিনা দরকারে শুধু এক্সারসাইজের ওজুহাতে সে মাইল রেস, ক্রস কান্টরী রেস প্রভৃতি ক'রেছে, অথবা ফুটবল নিয়ে মাঠে খানিকটা হুটোপাটি ক'রে বেড়িয়েছে তার চেয়ে এই প্রয়োজনে হাঁটা ঢের ভাল। গরীব হওয়ার এ একটা মস্ত সুবিধা! তাদের শরীর খাটাবার জন্য দায়ে প'ড়ে এক্সারসাইজ করতে হয় না—কাজই তাদের এক্সারসাইজ! মনে পড়লো সে যেদিন খেলায় মাঠ থেকে শ্রান্ত হ'য়ে এসে তার তেতলার ঘরে চা খেয়ে শ্রান্তি দূর ক'রছিল সেই দিন সেই সময় নীচের বস্তীর লোকটিও চা খাচ্ছিল শ্রান্তি দূর করবার জন্য। তার চা' খাওয়াটা ছিল সার্থক, সারাদিনের সত্যি খাটুনীর পুরস্কার! বিকাশ শুধু অযথা বল নিয়ে হুটোপাটি ক'রে তারপর দু'মাইল সাইকেল চালিয়ে সৌখীন শ্রান্তি অর্জ্জন ক'রে, সেই শ্রান্তি দূর করবার জন্য খাচ্ছিল চা'। কি মিথ্যা ক্লান্তিভরা এই ভদ্র লোকের জীবন! তার চেয়ে বিকাশের আজকের জীবনের এই কঠোর পরিশ্রমের শান্তি ঢের ভাল! নাঃ ওই মিথ্যা-ভরা ভদ্র-জীবনে আর ফেরা হবে না। এই বেশ!

এই জীবনের সম্বন্ধে সে মনে মনে চটপট স্বপ্নজাল বুনে গেল। তার মনে হ'ল এই পথে যেতে যেতে তার হয় তো দেখা হবে একটি বিপন্ন লোকের

ঙ্গে ! হয় তো সে গুণ্ডার হাতে প'ড়েছে, বিকাশ ধাই করে গুণ্ডাটাকে আঘাত 'রে তাকে উদ্ধার ক'রবে। কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক বিকাশকে ডেকে নিয়ে যাবে ার বাড়ীতে। সে হয় তো মস্ত বড় লোক—মস্ত বড় তার ব্যবসা ! বিকাশকে িয়ে সে ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেবে, তার মেয়ের সঙ্গে দেবে বিয়ে—যেমন িকাশের সহপাঠী জ্যোতি হঠাৎ বড়লোক হ'য়ে গেল, জষ্টিন কোম্পানীর ার্টনারের নাতনীকে বিয়ে ক'রে !

এই স্বপ্ন-স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে বিকাশ স্মরণ ক'রতে ভুলে গেল যে এক হূর্ত্ত আগে সে সম্পন্ন ভদ্র জীবনে ফিরবে না ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লেছে।

যা' হ'ক প্রতিজ্ঞা স্থির ক'রে বিকাশ রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লো, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রাড ধ'রে পশ্চিমে যাবে স্থির ক'রে। হাঁটতে হাঁটতে সে আরও কত বিচিত্র প্নরচনা ক'রতে লাগলো—বলা বাহুল্য সে সকল স্বপ্নেরই শেষ পরিণতি িকাশের সম্পন্ন জীবন লাভ এবং—পত্নীলাভ—বর্ত্তমান জীবনের অবিচিত্র ন্জর টানা নয়।

মাইল পোষ্ট দেখলে—দু' মাইল! বিকাশ ভাবলে, মাত্র দু' মাইল? াতক্ষণে? মনে হ'ল যে সাইকেলটা না এনে সে ভুল ক'রেছে। বাইক থাকলে াতক্ষণে সে চ'লে যেতো বহুদূর—অনেক দূর। আর এতটা ক্লান্তও হ'ত না। ার একটু পরে এই পথ দিয়ে মাঝে মাঝে যে সব মোটর ভোঁ ভোঁ শব্দে শন্ ন্ ক'রে ছুটে চ'লেছে সেগুলোর দিকে অসূয়ার দৃষ্টিতে সে চাইতে লাগলো। াখন নিজেকে সে মনে ক'রলে দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতীক। এই যে কোটি কাটি ক্ষুধিত লোক তার মত আধপেটা খেয়ে ক্ষীয়মান্ শক্তি নিয়ে ট্যাঙাস্ ট্যাঙাস্ ক'রে পায় হেঁটে দীর্ঘ পথ যাতায়াত ক'রছে, তাদের পাশে এই সব পদ্ধিত ধনীর অযথা গতিবিলাসের স্পর্দ্ধা তার চোখে বড়ই লজ্জাকর ব'লে মনে

মনে হ'ল এদের কোনও অধিকার নেই, এমনি শুধু হন্ হন্ ক'রে নবার সখ মেটাবার, যেখানে কোটি কোটি লোক তাদের গন্তব্যপথে শ্রান্ত চরণ দার তুলতে পারে না। তিন মাইল এসেই একটু শ্রান্ত চরণের অভিজ্ঞতা

আস্তে আস্তে হচ্ছিল তার—তার মনে হ'ল সমস্ত দেশটা ছেয়ে যাওয়া উচিত রেল ও ট্রামে—কিম্বা বাসে—আর সেই রেল, ট্রাম ও বাসে প্রত্যেককে আবশ্যক মত বিনা পয়সায় গতায়াত ক'রতে দেওয়া উচিত।

বিকাশ বিশ্বের খেলার খবর বিস্তর রাখে কিন্তু সোস্তালিজমের কোনও খবর রাখে না। আর তখন সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয় হয় নি, এ দেশে সোস্তালিজম, কমিউনিজমের সম্বন্ধে গোটাকয়েক তথাকথিত মাথা-পাগলা কল্পনাবিলাসী ছাড়া কারও কোনও জ্ঞানই ব'লতে গেলে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ খেয়ালের বসে এক বেলা গরীব সাজতেই প্রয়োজনের তাড়ায় তার মাথায় এমন সব আইডিয়া খেলতে লাগলো যা আজকের দিনের সোভিয়েট রাশিয়ার চেয়েও অগ্রসর।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রোগ্রাম স্থির হ'য়ে গেল। সে যখন বড় লোক হবে—'যদি' নয়, 'যখন'—অর্থাৎ বড় লোক যে হবেই সে বিষয়ে কোনও সংশয় তার মনে উঁকি মারলো না—এই প্রসঙ্গে! সে যখন বড়লোক হবে তখন মাত্র পাঁচশো টাকা মাসে নিজের জন্য খরচ ক'রবে—পাঁচশো টাকায় লোকে বেশ চালাতে পারে—ধর না জাপানে পাঁচশো টাকার বেশী মাইনে নেই কারও। পাঁচশো টাকায় তার নিজের খরচ চালাবে, আর সব—মানে মাসে দশ বিশ হাজার হয়তো—গরীবদের জন্য খরচ ক'রবে। চাই কি দরকার হ'লে তিনশো টাকায় তার সব খরচ চালাবে—

দিবা স্বপ্নের দোষ এই যে এতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে পৌছিবার আগেই বিকাশের আকাশ কুসুম রচনা এত নিবিড় হ'য়ে গিয়েছিল যে পথ সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান ছিল না। পা দুটো চল্‌ছিল শুধু তাদের নিজের খেয়ালে। তাই পশ্চিম দিকে না গিয়ে সে চ'লেছিল সোজা পূব দিকে; আর মাইল তিন চার যাবার পর সে সোজা চল্‌ছিল সামনের একটা মোটর গাড়ীর নাকের দিক লক্ষ্য ক'রে!

ঠিক সেই সময় সে মনে মনে হিসাব ক'রছিল, বছরে লাখ টাকা আয় হ'লে

কি কি কাজ করা যেতে পারে। এদিকে তার চৈতন্যের আশে পাশে সর্ব সদর ও খিড়কী দরজায় সম্মুখস্থ মোটরের হর্ণ অবিরত নিস্ফল আঘাত ক'রছিল। শেষে হঠাৎ তার সবগুলো দ্বার ফট ক'রে খুলে গেল—সামনে তার দু' হাত দূরে মোটরটা একটা বিকট ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে থেমে গেল, তার একটা টায়ার গেল ফেটে, আর বিকাশ এমন একটা লম্ফ দিয়ে রাস্তার পাশের ঘাসের উপর মড়ি খেয়ে প'ড়লো যা' দেখলে মহাবীর হনুমান হয় তো একটু ঈর্ষান্বিত হ'তেন।

"ইডিয়ট" বলে হমকী দিয়ে গাড়ীর চালক ভদ্রলোক নেমে ফাটা চাকা খুলে ষ্টেপনী লাগাবার উদ্যোগ ক'রলেন আর গাড়ীর ভিতর থেকে আর চারটি যুবক সুড় সুড় করে বেরিয়ে এলো আড়ষ্ট পা-গুলোকে একটু সোজা ক'রে নেবার জন্যে। তার মধ্যে একজন ঘুসি বাগিয়ে গেল তাদের বিঘ্নকারী পাপিষ্ঠকে পথ চলার বিজ্ঞান হাড়ে হাড়ে শিখিয়ে দিতে।

বিকাশ তখন উঠে কাপড় চোপড় ঝাড়ছে। তার কাছে এসে সেই রক্তচক্ষু বদ্ধমুষ্টি যুবক যেই তার মুখের দিকে চাহিল অমনি তার মুষ্টি চট্ ক'রে মুক্ত হ'য়ে আলিঙ্গনে পর্য্যবসিত হ'য়ে গেল, হারানিধি পাওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তার মুখ।

কেন না, আগন্তুক তার কেউ নয়, সুবোধ চ্যাটার্জ্জী।

বেনারেস ইউনিভারসিটির আমন্ত্রণে কলকাতা ইউনিভারসিটির একটা টীম টবল খেলবার জন্য কাশী আসছিল। সুবোধ এ দলের ক্যাপ্টেন, আর সবাই ট্রেণে আসছে ; এরা পাঁচজন কলকাতা থেকে মোটরে আসছে।

আরে বিকাশ যে। তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে সারা বিশ্বে গরু খোঁজা ক'রে ম'রছি। অবশেষে কি না ওই গাড়ল গোবরা ঘোষটাকে গোল-কীপার ক'রে আনতে হ'য়েছে। দুগ্ধাভাবে একেবারে ঘোল। কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন।"

ফাঁসি কাঠের সামনে ফাঁসির আসামীর হৃৎপিণ্ডের গতি কি রকম হয়,

তা' বিকাশের জানা ছিল না, কিন্তু নিজেকে ঠিক সেই অবস্থায় অনুভব ক'রে দেখতে পেলো যে বুকের ভিতর যাচ্ছে-তাই এলো মেলো স্পন্দন সুরু হ'য়ে গেছে। এই মুহূর্ত্তে সে পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের সঙ্গে দেখা করতে বরং প্রস্তুত ছিল, চাই কি বাঘের সামনে দাঁড়াতেও কুণ্ঠিত হ'ত না! চাই কি সুড় সুড় ক'রে বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে মেশোমশায়ের সামনে দাঁড়ানও বরং ভাল ছিল! কিন্তু কলেজের হষ্টেলের ছাত্র বিশেষ ক'রে সুবোধ চ্যাটার্জ্জী—এদের সামনে দাঁড়াবার সাহস তার মোটে ছিল না। মনে ক'রতে লাগলো যে সুবোধ এক্ষুণি তার হষ্টেলের কেলেঙ্কারীর কথা নিয়ে এমন সব চোখা চোখা কথা বলবে যে, তাতে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ছাড়া তার গত. থাকবে না।

কিন্তু সুবোধ সে কথা মোটেই বললে না। বরং হঠাৎ অপ্রত্যাশিতৎ এমনি ক'রে বিকাশকে পেয়ে সে এমন একটা প্রচণ্ড উল্লাস প্রকাশ ক'রলে যে তার একটু ছোঁয়াচ প্রায় বিকাশের প্রাণেও লেগে গেল।

তার উল্লাসের ধ্বনি শুনে আর সবাই এগিয়ে এলো। সবাই শুধু নাচতে বাকী রাখলো।—তাদের টীমটি এবার একেবারে ছাঁকা ছাঁকা খেলোয়াড় নিয়ে হ'য়েছে। আগে থেকেই ঠিক ছিল যে বিকাশ হবে গোলকীপার। কিন্তু কার্য্যকালে সে নিখোঁজ হওয়ায় সুবোধ একেবারে অকূলে প'ড়ে গিয়েছিল চারি দিক টেলিগ্রাম ক'রে যখন তাকে পাওয়াই গেল না, তখন বাধ্য হ'য়ে গোবরাকে নিতে হ'ল। এতে কেবল গোল সম্বন্ধে সবার মনে দারুণ খুঁৎখুঁতি ছিল। ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মধ্যে বিকাশ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর গোলকীপার কেউ নেই, গোবরা ঘোষ তার পরেই, কিন্তু একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে তার স্থান। তাই সুবোধের মনে ভারী ভয় ছিল যে, এমন দশ দশটি সেরা খেলোয়াড়ের খেলা পাছে গোবরার অকৃতিত্বে মাটি হয়। বিকাশকে পেয়ে তার বুব সাত হাত উঁচু হ'য়ে উঠলো। সে বললে, "এইবার মার দিয়া কেল্লা! হুরে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ক্ষর এভার।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলে "হুরে" ধ্বনি ক'রে উঠলো।

এরা সবাই মিলে এতটা মাতামাতি নাচানাচি সুরু ক'রে দিলে যে অনেকক্ষণ বিকাশের কোনও কথা বলবার অবকাশই হ'ল না। তাতে সে বাঁচলো, কেন না এই অপূর্ব্ব কল্পিত পরিস্থিতিতে তার যে স্তব্ধতা এসে প'ড়েছিল সেটা কাটাবার সময় পেল এতে।

ট্রেণী লাগান হয়ে গেলে আবার সবাই সুড় সুড় ক'রে বিকাশকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী চ'ললে পর সুবোধ বললে, আরে ছি, ছি বিকাশ, তুমি ভীষণ sentimental, একটা খেলায় একদিন একটা ভুল কার না হয়? সেই লজ্জায় একেবারে দেশছাড়া হওয়া, এ কি Sportsman-এর কাজ? তুমি ডুবিয়েছিলে আর কি?"

লজ্জায় বিকাশের কান লাল হ'য়ে উঠলো। সে আমৃতা আমৃতা ক'রে বললে, "কে বললে? মানে আমি দেশছাড়া তো হই নি—তা ছাড়া মেসো-ম'শায়কে তো জানিয়ে এসেছি।"

"তোমার মেসোমশায়ের কাছে খোঁজ নেওয়া হ'য়েছিল। তাঁর কাছে তুমি লিখেছিলে তোমার শরীর খারাপ বলে হরিদ্বারে গেছ। শরীর খারাপের নমুনা তো এই!" ব'লে বিকাশের পেশীবহুল বাহুমূলে সুবোধ এক ঘুসি।

"তা ছাড়া লিখেছ তুমি হরিদ্বারে গেছ, সেখানে মোহান্ত মহারাজের কাছে তার ক'রেছিলাম, তিনি জানালেন তুমি হরিদ্বারের ত্রিসীমানায় যাও নি। এখন পাওয়া গেল তোমাকে কাশীর পথে। এর যদি কোনও রোমাণ্টিক কারণ থাকে, বুঝতে পারি। তা নইলে, তোমার এমনি ক'রে মিছে ব'লে দেশত্যাগী হবার আর কোনও কারণই থাকতে পারে না—সেদিনকার খেলার accident-এর জন্য একটা morbid আত্মগ্লানি ছাড়া।"

বিকাশ চোখ দুটো ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে সুবোধের মুখের দিকে চাইলে। সে কৌতুক ক'রছে বা মিথ্যা ব'লছে এমন মনে হ'ল না।

তবে কি এ ছাড়া কিছুই কেউ জানে না। সেই বস্তীবাসীর মিথ্যা অভিযোগ

বা তার হস্তগত টাকাটার খবর কি কারও কাছে পৌঁছায় নি। বিকাশের বুকের ভিতর আশা দপ ক'রে লাফিয়ে উঠলো।

সে বললে "রোমাঞ্চ ভাই আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি।"

"তবে? তবে এ ছাড়া আর কি কারণ হ'তে পারে?—হাঁ, ব'লতে পার, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমি তোমার খেলার ভুলের খোঁটা দিয়েছিলাম, তার জন্তে যদি তুমি দুঃখ পেয়ে থাক, আমি ভাই মাপ চাইছি। আমি অতটা মনে ক'রে কিছু বলি নি, মুখের ডগায় যা এসেছে ব'লে গেছি।"

বিকাশের বুক থেকে দশ মণ বোঝা নেমে গেল। তবে সে শুধু মিথ্যা ভয়ে এতটা কাণ্ড ক'রে ব'সেছে। এইবার আবার সে নিজের কাছে ভারী লজ্জিত হ'য়ে প'ড়লো। মনে হ'ল একটা মনগড়া বিপদের ভয়ে এতটা করা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ হ'য়েছে। এ কথা যদি কেউ জানে তবে সে লজ্জাটাও কম নিদারুণ হবে না।

সে বললে, "ও কি ব'লছেন আপনি, আপনি ক্যাপ্টেন, আপনি খেলার দোষ দেখলে কথা ব'লবেন তাতে রাগ ক'রবো কেন? তবে হাঁ সেদিনকার ঐ বোকার মত ভুলের জন্ত মনে ভারী আত্মগ্লানি হ'য়েছিল। ভেবেছিলাম, আর খেলবো না।"

এই কল্পিত হেতুটাকে মাথা পেতে নেওয়াই এখন বিকাশের কাছে একমাত্র সুযুক্তি ব'লে মনে হ'ল। তাতে সেন্টিমেন্টাল ব'লে তাকে ঠাট্টা করার চেয়ে বেশী কিছু কেউ ব'লতে পারবে না।

সহরের ভিতর এসে সবাই বললে, "বিকাশকে এখন আর ছাড়া হবে না। তোমার আর বাসায় যাওয়া হবে না। আমাদের সঙ্গেই থাকবে। পরশু দিন ম্যাচ হ'য়ে গেলে তবে ছুটি।"

সুবোধ বললে, "তখনও ছুটী পাবে না। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। বরং তোমার তল্পী-তল্পা কোথায় আছে তা' ব'লে দেও, আনিয়ে নিচ্ছি।"

বিকাশ হেসে বললে, "তন্নী, যা ছিল উধাও হ'য়েছে। তন্না, এই যা প'রে আছি।" ব'লে সে তার সুটকেস চুরির বৃত্তান্ত ব'ললে।

শুনে সুবোধ ব'ললে, "তুমি একটি খোকা! এবার তোমার মেসোম'শায়কে ব'লে দেবো একটা চুষীকাঠী নিয়ে একটা নার্স যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। একলা পথে বেরুলে কোনদিন বেঘোরে মারা যাবে। আজই তো গেছলে একটু হ'লে, মোটর চাপা পড়ে।"

এর পর বিকাশ গেল ইউনিভারসিটিতে; দলের সঙ্গে। সেখান থেকে তার মেসোম'শায়কে তার করা হ'ল যে ম্যাচ খেলে সে ফিরবে।

আসল কথাটা এই। সেদিন ভয় পাবার কোনও হেতুই বিকাশের ছিল না। যদি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবা তার পক্ষে সম্ভব হ'ত, তবে সে অনায়াসেই বুঝতে পারতো যে, ওই ঘরে টাকা ফেলা যেতে পারে দোতলা, তেতলার ছ'টা জানালা থেকে—আর বস্তীর ভিতর থেকে তো পারেই। সুতরাং কেউ কথাটা শুনে যে তাকেই সন্দেহ ক'রবে এ রকম ভাববার কোনও হেতু ছিল না। তা ছাড়া, বাস্তবিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে কোনও নালিশই হয় নি। সেই রাতের হাঙ্গামার পর উঠতে একটু বেলা হওয়ায় হুড়মুড় কোরে আফিস যাবার তাড়ায় স্বামীর আর নালিস করবার কথা মনেও হয় নি। সন্ধ্যাবেলায় যখন মনে হ'ল তখন সেই টাকাটা ভাঙিয়ে তার স্ত্রী বেলের পানা আর ঘুংনি দানা তাকে পরিবেশন করায় স্বামী হেসে ব'ললে, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কি বল দিকিনি সত্য ক'রে।"

স্ত্রী স্বামীর পা ছুঁয়ে এবং ছেলের মাথায় হাত রেখে শপথ ক'রলে সে কিছুই জানে না, হোটেলের কোন বাবুর সঙ্গে কোনও দিন তার চোখোচোখিও হয় নি। তারপর স্বামীর খোসমেজাজের সুযোগে সে বললে, "আর হোটেলের বাবুদের কি আর মরবার জায়গা নেই যে, তোমার এই বুড়ী কালপেঁচীকে টাকা ছুঁড়ে মারতে যাবে!"

স্বামী হো হো ক'রে হেসে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলে।

# পাঁচ

হষ্টেলে ফিরে বিকাশ সসঙ্কোচে তার ঘরের জানালাটা খুলে একবার ভয়ে ভয়ে চাইলো সেই বস্তীর দিকে।

ভয়ে ভয়েই—কেন না যদিও সে অনেকটা বিশ্বাস ক'রেছিল যে, তার সেদিনকার অপকীর্ত্তির কথা কিছু প্রকাশ হয়নি, তবু একটু ভয় ছিল। চাই-কি তাকে আবার সেদিকে চাইতে দেখলেই হয়তো স্বামীটির রাগ চড়ে যাবে এবং নালিশ না করুক অন্ততঃ নেপথ্যে দু'টো গালি-গালাজ করতে পারে। কেন না সে স্বকর্ণে যা শুনেছিল, তাতে তার সন্দেহ ছিল না যে, স্বামীটি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, 'হোটেলের বাবুদের' সঙ্গে তার স্ত্রীর ইয়ার্কি চলে এবং এতটা এগিয়েছে তাদের ভাব যে, বাবুরা টাকা ছুঁড়ে দেয়। হয়তো টাকাটা পেয়ে সে ক্ষমা ক'রে গেছে শুধু সেবারের জন্য, কিংবা হয়তো বা ওৎ পেতে ব'সে আছে যে একবার হাতে-নাতে ধ'রে যা' করবার ক'রবে।

ভয় ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু দেখবার কৌতুহলেরও সীমা ছিল না। তাই সে সসঙ্কোচে জানালাটা খুলে একবার তাকাল।

যা' দেখলো তাতে প্রথমেই তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

সে পরিবার আর সেখানে নেই—ঘরটা খালি প'ড়ে র'য়েছে। সেখানে এসে হৈ-চৈ ক'রছে বুড়ী একটা—এ বস্তীর বাড়ীওয়ালী। এমন বাঁজখাই গলায় সে বুড়ী সহজ কথা কয় যে, হষ্টেলের তেতলা ছেড়ে তার সেই গলাই অনেক উচেে ওঠে। এখন তো সে প্রাণপণে চীৎকার ক'রছে আর লাফাচ্ছে!

তার সঙ্গে একটু পরে যোগ দিল এসে সেই কাবলীওয়ালা। তার গলা, বাড়ীওয়ালীর পাশে মৃদুগুঞ্জন হ'লেও তার মিহি সুরের বাঁকা বাঁকা কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট।

এদের বাগ্‌বাহুল্যের সার বোঝা গেল এই যে, ভাড়াটেটি সস্ত্রীক নিঃশব্দে সটকে পড়েছে কাল রাত্রে। আগা সাহেব আরও জানালেন যে কাল তার

াফিসে হপ্তা পাবার দিন শুনে আফিসে গিয়ে শুনে-এসেছে যে সেখান থেকেও স সটকেছে—ক'লকাতার বাইরে না কি কোথায় একটা ভাল কাজ পেয়ে স পালিয়েছে—কিন্তু ঠিকানা রেখে যাওয়া আবশ্যক মনে করে নি।

মনের বোঝা নেমে গেল। এখন বিকাশের মনে হ'ল যে এদের দারিদ্র্য ও অভাবের কথা শুনে সে এদের যতটা অসহায় ভেবেছিল, তা তারা মোটেই য়। দেনার দায়ে গিন্নীর নোলক বাঁধা থাকতে পারে, কিন্তু কাবুলী ও াড়ীওয়ালীর কাছে যে দেনা, যার কতকটা শোধ ক'রে দেবার জন্য একটা র্দ্ধস্ফুট কল্পনা একবার বিকাশের মনে এসেছিল, সে দেনার ভার থেকে মুক্ত বার জন্য তাদের, বিকাশের বা আর কারও উদারতার অপেক্ষা ক'রতে য়নি। তার চেয়ে সহজ পথে মুক্তি পেয়েছ তারা ফাঁকি দিয়ে। বাহুল্য টবহর ছিল না এ পরিবারের—প্রধান লগেজের মধ্যে তিনটি বাচ্চা! তাদের নয়ে নিঃশব্দে রাত্রের অন্ধকারে সরে প'ড়ে তারা সহজেই পঞ্চাশ-ষাট টাকা াকি দিয়েছে। ঋণমুক্ত হবার এই সহজ উপায় বিকাশের মাথায় াসে নি। এ বিদ্যা যার জানা আছে তার অর্থকষ্ট হবার কোনও থা নয়।

া'ক, একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন থেকে যেন জেগে উঠলো বিকাশ। বেনারস বশ্ববিদ্যালয়কে পায়ের জোরে পরাভূত করে আসবার আনন্দ ও গৌরবটা এ য়দিন বিকাশ ভাল ক'রে উপভোগ ক'রে উঠতে পারে নি—আবার এই রিবারকে নিয়ে কি ফ্যাসাদে সে প'ড়বে তারই কল্পনায়। এখন সে আনন্দটা স পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রতে লাগলো।

মাসিমা ও মেসোমহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে সে এখনো যায় নি। ভারী ঙ্কোচ হ'চ্ছিল তার। তাদের ভোলাবার মত একটা বেশ লাগসই কাহিনী সে এখনও রচনা ক'রে উঠতে পারে নি। তার সদাই ভয় হয় যে, ফট্ করে াবার কি নূতন গল্প সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি মেসোমশায়ের কাছে ধরা া'ড়ে যাবে। তাই যা কিছু সে রচে—তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে সে—

আর দেখতে পায় যে, সব রচনার মধ্যেই কোথাও না কোথাও ধরা পড়বার মত ফাঁক র'য়ে গেছে।

শেষ পর্য্যন্ত অনেক মুসাবিদা ক'রে সে মেসোমশায়কে লিখে জানালে যে তার শরীর খারাপের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। সে দিন খেলায় একটা ভুল করবার পর দুশ্চিন্তায় nervous breakdownএর লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। তার ক'দিন পরেই কাশীতে খেলতে হবে, সেই জন্য সে কয়েকদিন হরিদ্বারে গিয়ে nerveটা একটু দুরস্ত ক'রে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাকে কিছুতে ছাড়লে না ব'লে তার সোজা কাশীতেই যেতে হ'ল। যা' হ'ক সে ফিরে এসে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ ক'রছে এবং প্রাণপণে পড়াশুনা ক'রছে কলেজ ছুটি হ'লেই শ্রীচরণ দর্শন ক'রতে যাবে।

প্রাণপণ করে সে পড়তে পারছিল না মোটেই। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা, এর ভিতর সে যা দেখেছে ও যা অনুভব ক'রেছে, তাতে তার মনের ভি এমন একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছিল যে, পড়ায় সে কিছুতেই মন দিতে পারতো না। পড়ার বই হাতে ক'রে সে বসে থাকতো সর্ব্বক্ষণ, কিন্তু প'ড়তো না, ভাবতো ব'সে।

অভাবের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত হ'লেও খুব নিবিড় পরিচয় হ'য়ে গেছে তার—চাক্ষুষ এবং ঔদরিক।

নীচে বস্তীর যে শ্রমিক পরিবারের চাক্ষুষ পরিচয় সে পেয়েছে, তা' থেকে কল্পনাযোগে সে অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে। ঐ শ্রমিকটি যখন আফিসে বের হয়, তখন সে ফরসা কাপড়, রঙিন সার্ট পরে কুচকুচে চুল চকচকে ক'রে মচ মচ্ করে জুতোর আওয়াজ ক'রে পান চিবোতে চিবোতে চ'লে যায়—যে কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। সেই চক্চকে আবরণের তলায় যে অভাব, তার পরিচয় পেয়েছে বিকাশ। ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রে থাকে ঘরের ভিতর স্বামী-স্ত্রী; খাবার জোটাতেই এত হিম্‌সিম্ খেয়ে যায় যে, এক পয়সার এক খুঁটি চায়ের জন্য নোলক বাঁধা রাখতে হয়। তাও কাবলীওয়ালার কাছে ধার হয়,

ঝাড়ীওয়ালীর ছ'মাসের ঘরভাড়া বাকী থাকে। ফাঁকি দেবার মহাবিদ্যা আয়ত্ত না থাকলে তার যে বাঁচাই দায় হ'ত।

এদের কথা ভাবতে ভাবতে বিকাশের মনে হ'ত—এই যে জৌলুসভরা শহর, আকাশ ফোড়া এর সব প্রাসাদ, এর বুকের ভিতর লক্ষ লোক না জানি এমনি অভাবে নিপীড়িত হ'য়ে এমনি নানা ফিকির ক'রে অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়ে শুধু বেঁচে আছে। সকাল আটটা থেকে দশটা আর বিকেল পাঁচটার পর যে বিপুল জনস্রোত আফিস পাড়ায় হন্ হন্ ক'রে যাতায়াত করে, তাদের চেহারা হোক না হয় তো চকচকে, তাদের পেটের ভিতর যে কতখানি খালি আছে, দেনার বোঝা ঘাড়ে যে কত চেপে আছে, কে জানে? হয় তো বা এদের ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ নারী হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এদের ঠাট বজায় রাখছে অভুক্ত জঠরের জ্বালা জোর ক'রে চেপে।

সে জ্বালা যে কী—তা সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছে শুধু একবেলার অর্দ্ধাহারে। সেদিন সে দুটো ছাতুগুড় খেয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়েছিল পথে। দু'এক মাইল যেতে না যেতে—সে কী আঁকু পাঁকু। কয়েক আনা পয়সা সম্বল নিয়ে তখন সে দেখেছিল অনাহারের বীভৎস মূর্ত্তি—কেবল ভাগ্যক্রমে দাঁড়িয়ে গেল সেটা শুধু কল্পনা!

তার কাছে যেটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নিছক কল্পনা, লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে সেটা নির্ম্মম চিরন্তন সত্য! অথচ এদেরই পাশে, হাজার লোক কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে শুধু ছিনিমিনি খেলছে; যত টাকা পাচ্ছে ততই আরও চাইছে; বিলাসের পর বিলাসের আয়োজন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে, আরও নূতন আয়োজন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠছে, আরও নূতন আয়োজন এসে আহ্বান ক'রছে!

এ কী বিসদৃশ ব্যাপার! দারুণ দারিদ্র্যের এই বীভৎস মূর্ত্তির পাশে সম্পদের এত প্রচণ্ড দাপট! প্রতিকার নেই কি এর?

বইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হ'ত, কেন প'ড়ছে সে? পাশ ক'রবে, পাশ ক'রে ভাল কাজ ক'রবে, উপার্জ্জন ক'রবে, ভদ্র ভাবে আরামে থাকবে—

হয় তো বড়লোক হবে। কিন্তু তার আশে পাশে যখন এত অভাব, তখন তার মাঝখানে তার বড়লোক হওয়ার মানে কি? কি অধিকার আছে তার বড়লোক হবার?

এই প্রশ্নে তার মনে হ'ল আজ যে, সে এই তেতলা হষ্টেলে বাস ক'রে আরাম ক'রে প'ড়ছে—যেখানে হাজার হাজার ছেলে নানা রকম উঞ্ছবৃত্তি ক'রে কোনও মতে তাদের পড়ার খরচ জোগাড় ক'রছে; এতেই বা তার কি অধিকার? ঐ বস্তী থেকে যে সব গরীব নোংরা ছেলেগুলা বের হয়, তারা পড়ে না, প'ড়তে পায় না, কেন না তাদের বাপের টাকা নেই। বিকাশেরও তো বাপের টাকা নেই। তার বাপ মা-ও তো তাকে একেবারে নিঃস্ব অনাথ ক'রে রেখে শিশুকালে বিদায় নিয়েছিলেন। বিকাশ যে তবু ভদ্রলোকের মত আরাম ক'রে লেখা পড়া শিখে, সে কেবল তার মাসিমার স্নেহের উপর বাণিজ্য ক'রে। মেসোমশায়ের টাকায় তার কোনও অধিকার নেই, তবু সে তারই বলে আজ ভদ্রলোক, তারই জোরে সে প'ড়ছে। তার নিজস্ব সম্পদে সে ঐ বস্তীর ছেলেদের চেয়ে এক ফোটাও বেশী ধনী নয়।

মেসোমশায়ের এ স্নেহ ও দয়ার কি প্রতিদান দেবে, সে এই লেখাপড়া শিখে? পড়াশুনায় সে বেশী ভাল নয়। কোনও মতে পাশকোর্সে বি.এ.-টা সে হয় তো পাশ ক'রতে পারবে, কিম্বা হয় তো পারবে না। এর জন্য মেসো-মশায়ের টাকাগুলো এমনি ক'রে অপব্যয় করবার কি অধিকার আছে তার? যদি সে কৃতি ছাত্র হ'ত, খুব ভাল ভাল ডিগ্রী পেয়ে জীবনে বড় বড় কাজ করবার অধিকার পেতো, তবে বটে এ অর্থব্যয় সে সার্থক ক'রতে পারতো, আর হয় তো বা একদিন তার অর্জ্জিত সম্পদ দিয়ে মেসোমশায় মাসিমার ঋণ প্রচুর পরিমাণে শোধ ক'রতে পারতো। প'ড়েশুনে পাশ ক'রে সে ক'রবে হয় তো বিশ পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরী। তাতে কোনও মতে নিজের পেট চালিয়ে যেতে পারলেই ঢের, মাসিমা মেসোমশায়ের কিছু ক'রবে কি?

মনে হ'ত, নাঃ, ফিরে এসে সে ভাল করে নি। পড়া ছেড়ে গিয়েছিল,

ালই ক'রেছিল। তাতে একজামিন পাশ করবার পণ্ডশ্রম করবার চাইতে য় তো ভাল কিছু করতে পারতো সে। অন্ততঃ মেশোমশায়ের টাকার াপব্যয়টা নিবারণ হ'ত।

ার কাণে হঠাৎ ধ্বনিত হ'ল সুবোধের কথা।—সখের দরদী—হাম্বাগ! াক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠলো। ভাবলে—দেখিয়ে দেবে সে তার জীবন দিয়ে য সে হাম্বাগ নয়।

দেখাবে জগৎকে কত দরদ তার প্রাণে আছে—কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে। চার জন্য বড়লোক তার হ'তে হবে। বি-এ-টা না পাশ ক'রলে মাসিমা াড়বেন না, এটাকে কোনও মতে পাড়ি দিয়ে সে প্রাণপণ ক'রে লেগে যাবে াড় লোক হবার চেষ্টায়। একজন মনীষী ব'লেছেন ক'লকাতার পথেঘাটে াজারে-বাজারে টাকা ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়। বি.এ, ক্ষাটা দিয়েই সে ক'লকাতার সব পথ ঝেঁটিয়ে বেড়াবে—দু'হাতে কুড়িয়ে তুলবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।. টাকা হ'লে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা হ'লে স দেখিয়ে দেবে কেমন ক'রে টাকার সদ্ব্যবহার ক'রতে হয় গরীবের সেবা ক'রে!

কোনও মতে বি.-এ পরীক্ষার দায়টা মিটিয়ে দিয়ে এই টাকা শীকারের খেলার জন্য সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

## ছয়

খবরের কাগজ বিকাশ পড়ে শুধু স্পোর্টিং-এর খবর দেখবার জন্ম, আর কোনও খবরে তার কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। একদিন কাগজের এক পৃষ্ঠায় দেখলে খুব বড় বড় অক্ষরে হেড লাইনে লেখা র'য়েছে যে, ঘোড়দৌড়ে একজন Triple tote-এ এক বাজীতে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেছে! তার মনে হ'ল চটপট্ বড়লোক হবার এ একটা সহজ উপায়।

একদিন সসঙ্কোচে সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হ'ল গোটা তিরিশেক টাকা জোগাড় করে।

লোকে বলে আনাড়ীর হাতে দান পড়ে ভাল। রেস সম্বন্ধে আনাড়ি হ'য়ে কপাল ঠুকে বিকাশ Triple tote-এ যে বাজীটা ধ'রলে, সবাইকে অবাক্ ক'রে দিয়ে সেই দানে সেই outsider গুলোই সবার আগে উইনি পোষ্ট পার হ'য়ে গেল। এতে তার সৌভাগ্যের মাত্রা যে কতদূর গেল ত বুঝতে পারলে প্রথম যখন তার টিকিট দাখিল ক'রতেই তাকে এক হাজা টাকার করকরে নোট দিয়ে দিলে।

আর অপেক্ষা ক'রতে তর্ সইল না তার। সে একেবারে লাফাতে সুরু করলে! একটু পরেই সে বের হ'য়ে চ'লে গেল, ফের কোনও বাজী ধরবা কথাও তার মনে হ'ল না।

নাচতে নাচতে ফিরবার পথে সে দেখতে পেলে ময়দানের একটা নির্জ্জ জায়গায় ব'সে একটা লোক কেবলি মাথা চাপড়াচ্ছে ব'সে। কাছে গি দেখলে—একি! সেই মজুরটি, যে তার ঘরের নীচে বস্তীতে বাস ক'রতো।

তার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি হয়েছে তোমার?

লোকটা বললে, "কি আর হবে? আমার মাথাটি খেয়েছি। হায় হা অমন ঘোড়াটা ধরলুম, সে এমনি ক'রে আমায় ধনে প্রাণে মারলে গো! হপ্তা সব কটা টাকা খেয়ে দিয়েছে। এখন কেমন ক'রে মুখ দেখাব মাগ-ছেলে

কাছে! হায়, বিকাশের টাকা পাওয়ার আনন্দটা হঠাৎ চুপসে গেল। টাকাটা নিয়ে যেন সে চুরী ক'রেছে ব'লে মনে হ'ল। কত মূর্খ দরিদ্র এই লোকটার মত যথাসর্ব্বস্ব পণ ক'রে খেলতে এসেছিল হঠাৎ বড়লোক হবার রঙিন নেশায় মেতে! কে জানে তার এই হঠাৎ পাওয়া হাজার হাজার টাকার মধ্যে এমনি কত গরীবের বুকের রক্ত ও ক্ষুধার অন্ন আছে।

পথে পাছে পকেট-মারা যায়, এই ভয়ে বিকাশ পকেটে হাত চেপে ছিল। তাতে হাজার টাকার নোটের স্পর্শ তার হাতে পুলকের বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়ে দিচ্ছিল, তার করকরানি ঢেলে দিচ্ছিল কাণে মধুর সঙ্গীত! এখন সে স্পর্শ যেন তাকে পোড়াতে লাগলো, করকরানিতে তার গা শিউরে উঠতে লাগলো।

হন্ হন্ ক'রে মাঠের ভিতর দিয়ে চ'লতে চ'লতে সে ভাবতে লাগলো। এই বেচারী শ্রমিকের অবস্থা যে কি তা' সে জানে। এর আজকের এই দুর্লোভের ফল হয় তো সপ্তাহব্যাপী অনাহার—না হয় আবার ধার—কাবলী-ওয়ালার কাছে। ভাবতেই তার হাসি পেল। ভাবলে ধার ক'রবে তাতে এর দুঃখ কি? শোধ তো দেবে না, আবার পালাবে কোন ধারে।

তবু, আজ বিকাশের নিজেরও তো ওই দশা হ'তে পারতো। যে ত্রিশ টাকা সে নিয়ে এসেছিল, তাই ছিল তার এ মাসের খরচার টাকা। এ থেকে কলেজের মাহিনা হষ্টেলের খরচ সব দিতে হবে, যদি এ টাকা খোয়া যেত তবে সে যে কি ক'রতো—তা' ভাবতে তার ভিরমী লেগে গেল।

বাপ! ও পথে আর নয়!

কিন্তু ও বেচারার কি হবে? ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ এসে পড়েছিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল 'সখের দরদী'! বললে, কিছুতেই না। এই হাজার টাকা থেকে ওকে শ'খানেক টাকা দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে গোটা পথটা সে হেঁটে ফিরে গেল। ততক্ষণ লোকটা উঠে কোথায় চ'লে গেছে—দেখা গেল না।

এই লোকটার দুরবস্থা দেখে তার মনে যে গ্লানি হ'য়েছিল, ময়দান দিয়ে

খানিকটা পথ চ'লতে চ'লতে সেটা মিলিয়ে গেল। পথে দেখলে শিক্ষানবি মিলিটারী পুলিসেরা এক জায়গায় ফুটবল খেলছে, একটা সাহেব তাদের খেল শেখাচ্ছে—রেফারীও ক'রছে। সে দাঁড়িয়ে গেল। লোকগুলো নেহাৎ আনাড় নয়, খেলছে বেশ। দেখে তার আটা লেগে গেল। এক একটা লোকের ভুল দেখে পা দুটো নিশ-পিশ ক'রতে লাগলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখে সে যখন ফিরলো, তখন তার মনের গ্লানি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে গিয়ে সে বেশ ক'রে খেয়ে-দেয়ে দুটো বেশ দামী স্যুটের অর্ডার দিয়ে এটা ওটা কিনে প্রায় শ'খানেক টাকা খরচ ক'রে হষ্টেলে ফিরলে।

—সে হাজার টাকার পরবর্ত্তী ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে রাখা যাক। কথাট প্রকাশ হ'য়ে গেল। কাজেই তার কাছে রোজ ছেলেরা খাওয়া আদায় করে, থিয়েটার দেখে, সিনেমা দেখে। অনেক কিছু চাঁদা দিতে হ'ল তাকে। বেশীর ভাগ টাকাটাই অনেকে নিলে ধার! এমনি ক'রে দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে এ-টাকার প্রায় সবটাই শেষ হ'য়ে গেল। বিকাশ দেখতে পেলে যে হোষ্টেলের যে সব ছেলেরা মোটা মোটা ধার নিয়েছিল, তাদের সে-টাকা শোধ দেবার গা' দেখা গেল না। বুঝলে যে, পাওনাদারকে ফাঁকি দেওয়ার বিদ্যা কিছু বস্তীবাসীর একচেটে নয়—সবাই এ-বিদ্যার উপাসক, কেবল সুযোগ পাওয়ার যা অপেক্ষা!

সে সঙ্কল্প ক'রেছিল—টাকা হ'লে সে দরিদ্রসেবায় লাগাবে। কি রকম করে সে কাজটা ক'রবে—তা ভাবতে ভাবতেই এমনি ক'রে টাকাট ফুঁকে গেল।

———

# সাত

বিকাশের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এক সময় কেম্ব্রিজের ব্লু। ছেলেদের পড়াশুনার চেয়ে তাদের খেলা বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল বেশী। যারা খেলতে পারে তাদের তিনি ছিলেন মা বাপের চেয়ে বড়। তাই সুবোধ চ্যাটার্জ্জী ছিল তাঁর নয়নের মণি, তার কথায় তিনি উঠতেন বসতেন। বিকাশও খুব প্রিয় পাত্র ছিল।

সুবোধ এম. এ. পরীক্ষা দিতেই প্রিন্সিপ্যাল তাকে পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চাকরী যোগাড় ক'রে দিলেন। তারপর অবশ্য এম. এ. ফেল ক'রলো। আর বিকাশ যখন বি. এ. দিলে, তিনি তখনই তাকে ডেকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠালেন একটা বড় সওদাগরী অফিসের ছোট সাহেবের কাছে। এই ম্যাকরে সাহেব ক'লকাতার খেলা ধূলার মস্ত বড় পাণ্ডা। এক সময়ে সব খেলাতেই অল্প বিস্তর সুনাম ছিল তাঁর, এখন খেলেন শুধু ক্রিকেট ও টেনিস। ম্যাকরে প্রিন্সিপালের চিঠি পেয়ে বিকাশকে একেবারে দেড়শো টাকা মাইনের একটা চাকরী দিয়ে দিলেন—বল্লেন, অফিস টীমে তার খেলতেও হবে কিন্তু। ৲

পরীক্ষার ফলের তখনও অনেক দেরী। বি. এ. পাশ করতে পারবে কি না পারবে সে—তাও বেশ অনিশ্চিত—ফল কথা শেষ পর্য্যন্ত সে ফেলই ক'রেছিল, কিন্তু তার প্রিন্সিপ্যাল ধ'রে ক'রে গ্রেস দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। এখনি সে এমন একটা ভাল চাকরী পেয়ে গেল যা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারীরা পেলে ভাগ্য মানতো। উল্লাসে তার প্রাণ মেতে উঠলো।

মাসে দেড়শো' টাকা! তার কাছে তখন কুবেরের ঐশ্বর্য্য! এ-নিয়ে যে সে কি ক'রবে, তার অনেক রকম মুসাবিদা ক'রতে লাগলো। তা' বলে এখন তার একশো টাকার বেশী কিছুতেই লাগবে না। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোনও রকম দরিদ্রের সেবায় লাগাবে। 'জনসেবায় যে মহাসঙ্কল্প সে ক'রেছিল

কাশীর পথে,· সেটা তার মনে তখন বেশ জল্ জল্ ক'রছে! প্রথম মাসের মাহিয়ানার সবটা টাকাই সে মাসীমাকে দেবে। তাঁ'দের স্নেহ ও করুণার ঋণ তো ভুল্‌লে চলবে না।

মাস কাবার হ'তেই দু'দিনের ছুটি নিয়ে সে গেল মাসির কাছে রাঁচী। সেখানে তার মেসো হরিনাথবাবু ছিলেন বড় উকীল।

হরিনাথ বাবুর রোজগার প্রচুর কিন্তু তিনি ধনী নন।

তাঁর পরিবার, ব'লতে গেলে কিছুই নয়। ছেলে নেই, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, বড়টি দুটি ছেলে-মেয়ে রেখে মারা গেছে, তারা এখানেই মানুষ হচ্ছে, জামাই আবার বিয়ে-থা' ক'রে সংসারী। ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন বড় লোকের ঘরে, তার শ্বশুর এখনও দিব্যি জল জলাট হয়ে বেঁচে আছেন। কিন্তু বড় ছেলে বেঁচে থাকতে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই নিঃসন্তান বিধবা বউয়ের শ্বশুরঘরে স্থান নেই। সে বাপের ঘরে ফিরে এসে বোনের ছেলে মেয়ে নিয়ে আছে।

এ ছাড়া, বিকাশ আছে, হরিনাথ বাবুর ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী অনেক দিন ছিলেনও, তার দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। বড় ছেলে অনন্ত বি-এ পাশ করতে না পেরে তার বদলে বিয়ে করেছে, তাঁর ছেলে-পিলেও হ'য়েছে। তার পেশা এখন এই পরিবারেব ম্যানেজারী এবং প্রচুর বাবুগিরি। রাঁচী সহরে হরিনাথ বাবুর চেয়ে তাঁর ভাইপো অনন্তর দপ-দপানি ঢের বেশী।

আর আছে হরিনাথ বাবুর মুহুরী, তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, আরও গণ্ডা-খানেক হরেক রকমের লোক—যারা এখানে ছোট খাটো কাজকর্ম্ম করে, আর হরিনাথ বাবুর অন্ন ধ্বংস করে।

অপুত্রক হরিনাথ বাবুর এই বিপুল পরিবারে মানুষ হ'য়েছে বিকাশ ঠিক ছেলেরই মত। কিন্তু হরিনাথ বাবু ও তাঁর স্ত্রী বিকাশের বিষয়ে যে কোনও বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল তা নয়। এ বাড়ীতে যে কেউ থাকে সেই যেন বাড়ীর

ছেলে। শুধু খাওয়া পরা পায় এমন নয়, যখন যা খুশী চাইলেই পায়, না চেয়েও পায়।

হরিনাথ বাবু রোজগার ক'রেই খালাস। খরচ করবার ভার ঘরে তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণার, আর বাইরে অনন্তের। এরা দু'জনেই খরচে একেবারে মুক্ত-হস্ত। কেউ কিছু না চাইতে দেওয়ায় মস্ত আনন্দ অন্নপূর্ণার। ঘরে যখন যার যা দরকার বা দরকার নেই, অন্নপূর্ণা আগে থেকে তা তাকে গছিয়ে দেন। আর পরিবারের বাইরে দেশে বিদেশে যেখানে, যে আত্মীয় স্বজন আছে সবারই সত্য বা কল্পিত প্রয়োজনের জন্ম রোজই তিনি পাঠান টাকা। আর লোকজনকে খাওয়ানাটা তাঁর ব্যাধি বিশেষ।

সবাই বলে অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা! দেবীর দানের জোগান দেন স্বয়ং যক্ষরাজ কুবের, মানুষীর জোগানদার মানুষ হরিনাথ এই যা তফাৎ। এ গুরুতর কিছু সে জ্ঞান হ'তে অনেকদিন দেরী হ'য়েছিল।

বিকাশ সেই তার প্রথম মাসের মাইনের গোটা টাকাটা তার মাসীর পায়ের কাছে রেখে তাঁকে প্রণাম করলে, মাসী আশীর্ব্বাদ ক'রে টাকাগুলো তুলে নেন।

মেসো হেসে বল্লেন, "বা রে, সব ওঁকে দিলে, আমি একেবারে ফাঁকী।

এ কথায় বিকাশ ভারী লজ্জা পেলো। তখনি মনে স্থির ক'রলে পরের মাসের মাইনে থেকে একশো টাকা তার মেসোকে দেবে, কিন্তু তখনকার মত একটা উপস্থিত জবাব দিলে, "আপনার ও টাকার সমুদ্রে এ এক ঘটি জল যে দেখাই যেতো না মেসো মশায়!"

মেসো মশায় তার পিঠ চাপড়ে বল্লেন, "বেশ! বেশ!"

মাসী বল্লেন, "আহা! তোমাকে টাকা দিয়ে কিই বা হ'ত, তুমি তো সেই আমাকেই দিতে।"

"বটে!" ব'লে মেসোমশায় হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন।

তারপর তার মাসতুত বোনের দুটি ছেলেমেয়ে অমল ও শ্যামলী এসে তাকে

ধ'রলে, "মামা, চাকরী পেলে, আমাদের কিছু দিলে না?" বিকাশ ভাবলে, অন্যায় হ'য়ে গেছে, এদের জন্ম কিছু আনা উচিত ছিল। সে তাদের হাতে দুটো সিকি দিয়ে বল্লে, "এখন এই নে, আবার যখন আসবো তখন জিনিষ আনবো।"

ভাগ্নে বল্লে, "মামা, আমাকে একটা ভাল র‍্যাকেট আর একটা হকি ষ্টিক দেবেন।"

বিকাশ বল্লে, "নরাণং মাতুল ক্রমঃ, দেবো রে দেবো।"

শ্যামলী বল্লে, "আমাকে একটা Badminton set দেবে।"

বিকাশ প্রতিশ্রুত হ'ল।

অনন্ত বললে, "বিকাশ, তুমি এলে, আগে যদি জানাতে আমার একখানা ভাল র‍্যাগ আর সোয়েটারের দরকার ছিল। যাক গে, এবার তো হ'ল না, সামনের মাসে নিয়ে এসো। বাজে জিনিষ এনো না, বুঝলে।" দুটো খুব দামী মার্কার নাম ক'রে বললে সেই জিনিষ চাই। বিকাশ এবারে চট ক'রে হাঁ বল্‌তে পারলে না। তার টাকার উপর দাবীর পরিমাণ যে ভাবে বেড়ে যেতে লাগলো, তাতে মনে হ'ল দেড়শো টাকা মাইনেয় কুলিয়ে যাবে না। সে শুধু ঘাড় নেড়ে স'রে গেল।

অনন্তের ছোট ভাই বসন্ত খুসী হ'য়ে বিকাশের কাছে এসে দাঁড়াল, বললে, "হাঁ বিকাশ দা', এবার তুমি শীল্ডে খেলবে, না?"

হেসে বিকাশ বললে, "হাঁ ভাই।"

বসন্ত যেন আহ্লাদে নেচে উঠলো। সে বললে, "বিকাশ দা, Statesman-এ তোমার খেলার কথা কি লিখেছে দেখেছ? এবারকার ফুটবল সীজনের Snmmaryতে।"

"না ভাই, দেখিনি তো!"

"লিখেছে, গোলকীপারের মধ্যে সবচেয়ে ভাল'র মধ্যে একজন তুমি, যদিও তুমি জুনিয়ার কম্পিটিশনে খেল। লেখক আশা করেন যে, আগামী

রে তুমি ফার্ষ্ট ক্লাশ ফুটবলে খেলে তোমার প্রতিভার উপযুক্ত পরিচয় দিতে 'রবে।—কি গ্র্যাণ্ড! না বিকাশ দা?"

বিকাশ ভারী খুসী হ'ল বসন্তের এই সগর্ব্ব আনন্দ দেখে। বললে "আচ্ছা গ্র্যাণ্ড তো আমি হ'লাম, তুমি কি? কেমন খেলছো এখন?"

"আমি!—দাদার ভাই আমি, এই বলে সবাই!" ব'লে একটু সলজ্জ াবে হাসলে আর তার খেলার মেডাল এনে দেখালে।

আনন্দে বিকাশ তার পিঠটা খুব জোরে চাপড়ে দিলে।

গীতা—বসন্তের বড় বোন চুপ চাপ একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বিকাশ বললে, 'করে গীতা, তোর খবর কি? তুইও কিছু বাহাদুরী ক'রেছিস নাকি?"

া তা একটু হেসে ব'ল্লে, "হ্যাঁ, ক'রেছি বই কি?—চর্চ্চরী রাঁধতে খেছি।"

'সে তো অনেক দিনই জানিস তুই। ঘাস পাতা আর ধুলোর কত চর্চ্চরী য়েছি তোর।"

বসন্ত বললে, "ঈস্ বিনয় হ'চ্ছে! চর্চ্চরী শিখেছেন! কেন সেদিন যে ালাও কালিয়া চপ কাটলেট ক'রে নেমন্তন্ন খাওয়ালি। সত্যি বিকাশ দা', ও রী রান্না শিখেছে। আর দেখবেন", বলে সে ছুটে একখানা বই এনে খালে। সেটা প্রাইজের বই। গীতা সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্ষ্ট হ'য়ে এই াইজ পেয়েছে, তাতে তাই লেখা আছে।

গীতা বসন্তের গালে মারলে এক চড়।

বিকাশ বললে, "ওরে বাপরে! এত বিদ্যের বোঝা বইতে পারবি? না য়র জন্তে একটা মুটে জোগাড় ক'রে দেবো?"

গীতা বললে, "বইতে না পারি তুমি ব'য়ে দেবে।"

বসন্ত বা গীতা কেউ কিছু চায় নি, কিন্তু বিকাশ মনে মনে স্থির করলে, দর দুজনকেই বেশ ভাল প্রেজেণ্ট দিতে হবে।

মনে মনে একটা হিসেব ক'রে দেখলে যে এদের সবাইকে মন খুসী ক'রে

দিতে হ'লে আড়াই শো টাকার কম হবে না। তার মানে ছ' মাসের মাইনে থেকে জমিয়ে টাকাটা করতে হবে। স্থির ক'রলে এর পর আসবে ছ'মাস বাদে।

বাড়ীর লোকের সঙ্গে সম্ভাষণের পর বিকাশ একবার সহর ঘুরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল। ফিরতে সন্ধ্যে হ'ল।

বাড়ীতে উঠেই একটা বারান্দা, তারপরই হরিনাথ বাবুর বৈঠকখানা।

বৈঠকখানা বা বারান্দায় আলো জ্বলছে না দেখে বিকাশ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। হরিনাথ বাবুর এদুটি ঘর কখনও শূন্য বা অন্ধকার থাকতো না আগে সন্ধেবেলায়। যেদিন মক্কেল না থাকে সেদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে মজলিস। হাসি গল্পে স্থানটি মুখর হ'য়ে উঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পার হ'য়ে বিকাশ বৈঠকখানার সুইচ টিপে দিলে। আলো জ্বলতেই সে দেখতে পেলো ঘরটি শূন্য নয়, একখানা ইজি চেয়ারের উপর অন্ধকারে শুয়ে আছেন হরিনাথ বাবু নিঃশব্দে।

ব্যস্ত হয়ে বিকাশ গিয়ে বললে, "আপনার কি অসুখ করেছে মেসোমশায় ?"

সোজা হয়ে বসে বিকাশের পিঠে হাত দিয়ে তিনি হেসে বললেন, "না বাবা, অসুখ করে নি, কিছু হয় নি, এমনি চুপ চাপ শুয়ে আছি।"

হেসেই বললেন কথা কয়টা, কিন্তু বিকাশের মনে সে হাসিটা খুব স্বচ্ছ বা সত্য বলে মনে হ'ল না

সে আর কিছু না ব'লে অন্দরে গিয়ে মাসিমাকে ধ'রে বললে, "মাসিমা, মেসোমশায়ের কি হ'য়েছে ?"

মাসিমা একটু বিস্মিত, একটু ব্যস্তভাবে বললেন, "কই কি হ'য়েছে ?"

"উনি চুপচাপ ঘর অন্ধকার ক'রে বসে রয়েছেন বৈঠকখানায় ইজি চেয়ারে।"

"ওঃ! এই! ও অমনি থাকেন উনি আজকাল। ডাক্তার ওঁকে ব'লে দিয়েছে চোখটাকে বিশ্রাম দিতে তাই।"

"চোখের বিশ্রাম কেন ?—অসুখ কিছু হ'য়েছে ?"

"অসুখ নয়। কিন্তু বুড়ো বয়সে রাত্তিরে বেশী পড়লে যেমন হয়।"

মাসিমার কথায় তার উদ্বেগ কম্‌লেও বিকাশ নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। কন না, সে জানে মাসিমার স্বভাব। নিরতিশয় ভাল মন্থের তিনি, দয়া ও স্নেহের অবতার, কিন্তু কোনও কিছু বেশী ক'রে গায় মাখা তাঁর অভ্যাস নেই। হরিনাথ বাবুর বিপুল উপার্জ্জন দু' হাতে বিতরণ কর্‌বার কাজ তাঁর, তাতে ার আনন্দ এবং তারই উপায় উদ্ভাবন ও তার ব্যবস্থা করা এই সবই হ'ল ার দিন-রাতের চিন্তা। সংসারের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তাঁর বিধবা ময়ে এবং অনন্তের স্ত্রী, তাদের কেউ নিপুণ গৃহিণী নয়—মাসিমাও নন্। কিন্তু রোণো চাকর বামুন ওস্তাদ ও প্রভুভক্ত, তাই খাওয়া-পরার কাজ বেশ প্রাচুর্য্য তৃপ্তির সঙ্গেই চলে—তাতে ব্যয় কি হয় না হয় সেটা কারও দেখবার কথা কাজেই মাসিমার কোনও কিছুই গায় মাখতে হয়ও না, গায় মাখেনও া তিনি।

হরিনাথ বাবুর পরিচর্য্যার জন্য একটি পুরাতন সুদক্ষ চাকর আছে, কাজেই দিক্ দিয়ে মাসিমার একেবারে হাত পা ধোয়া। চাকর এসে যদি কিছু রপোর্ট করে, তবে তিনি জানতে পারেন, হরিনাথ বাবু নিজে কখনও কোনও াভাব, অসুবিধা বা অস্বস্তির কথা বলেন না, এবং লোকটি এমন সুস্থ, এমন ্যস্ত এবং এত তাল-ভোলা যে, তাঁর কোনও অভাব বা অস্বস্তি হ'লেও চট্ ক'রে তিনি তা' অনুভব করেন না, এবং অনুভব কর্‌লেও সেটা প্রকাশ কর্‌বার থা তাঁর মনে থাকে না।

তাই মাসিমার কথায় বিকাশের মন খুব সুস্থির হ'ল না। সে ভাবলে, াল সে ডক্তোরের কাছে জিজ্ঞেস কর্‌বে।

কিন্তু পরের দিন নানা গোলমালে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হ'ল না তার, লিকাতার দিকে যেতে হ'ল।

## আট

বিকাশ একটা সস্তা মেসেই বাসা নিলে। তার বন্ধুরা তাকে বলে, "এত টাকা মাইনে পাও, একটা বাড়ী ভাড়া কর না।"

সে কিছু বলে না, মুখ টিপে হাসে। সংক্ষেপে খরচ চালায়, বাকী টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখে—দু'মাস বাদে সবার জন্য প্রেজেন্ট নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য টাকা চাই।

খুব হাত টান ক'রেও দু'মাসের ভিতর টাকাটা জমলো না, আর এক মাস অপেক্ষা ক'রতে হ'ল।

তিন মাস পর রোজ আফিস থেকে ফেরবার পথে সে কতক জিনিষ কিনে এনে মজুদ করতে আরম্ভ ক'রলে। যে যা চেয়েছিল সব কেনা হ'ল, আর বসন্তের জন্য কেনা হ'ল একখানা খুব ভাল টেনিস র‍্যাকেট। গীতার জন্যে হ'ল একটা চুনি বসান সোণার ইয়ার-টপ্। কেনা কাটা হয়ে গেলে শুক্রবারের জন্য ব্যগ্র প্রতিক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলো সে। শনিবারটা ছুটি নিয়ে সে শুক্রবারই যাবে রাঁচী।

এবার সে এসে সবাইকে যার যার জিনিষ বিলিয়ে দিলে। আর সবাই খুসী হ'ল, কেবল হ'ল না অনন্ত আর গীতা। অনন্ত তার রাগ আর সোয়েটারটা বার বার টিপে টিপে দেখে বল্‌লে, "এঃ একদম ঠকিয়েছে। কোথাথেকে কিনেছিস ?"

বিকাশ একটা বড় দেশী দোকানের নাম ব'ল্‌লে, "যা ভেবেছি। এসব জিনিষ সাহেবী দোকানে কিনতে হয়। একই মোকামের এক মার্কার জিনিষ দেশী আর বিলাতী দোকানে কোয়ালিটির আকাশ পাতাল তফাৎ হয়। যা'ক, যা' এনেছ এই বেশ। সাহেব বাড়ী থেকে আনলে দামও বেশী লাগতো, হয় তো কুলোতে পারতে না।"

বিকাশের তুচ্ছ দেড়শো' টাকা রোজগারের উপর স্পষ্ট কটাক্ষপাত। পরের

দিন বিকাশ দেখলে অনন্ত এক বন্ধুকে সেই রাগ ও সোয়েটার দিয়ে দিলে অশ্রদ্ধা ক'রে। বিকাশ মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল, রাগও হ'ল তার। সে কিছু বল্লে না।

গীতার অসন্তোষটা হ'ল ভিন্ন রকমের। কাণের টপটা দেখে সে বল্লে, "দিব্যি টপটা। কত দিয়ে কিনলে?"

পঁচিশ টাকা।"

"ও বাবা! হাঁ বিকাশ দা' কত টাকা তুমি রোজগার কর যে সবাইকে এমনি সব দামী দামী—জিনিষ দিচ্ছ? হাজার দু'হাজার? ছিঃ এমন অপব্যয় ক'রো না। নিজে হয়তো সেখানে পেট শুকিয়ে প'ড়ে থাক। না হবে কেন? যে ঘরে মানুষ হয়েছ তার হাওয়া যাবে কোথায়?" বলে সে হেসে উঠলো।

এই তিরস্কারে বিকাশের মনের ভিতর খোঁচা লাগলো, বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে এই তিরস্কারটা সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে অনুভব ক'রলে যে গীতা যা' বলেছে ঠিক, কিন্তু তবু সে তাকে আদর ক'রে একটা জিনিষ দিতে এসেছ, তাতে এ কথা তাকে বলাটা অমার্জ্জনীয় রূঢ়তা! ষোলো বছরের মেয়ের পক্ষে এ সব কথা তার বয়োজ্যেষ্ঠকে বলা একটা বেয়াড়া রকমের জ্যাঠামো। তা ছাড়া তার খুব বেশী ক'রে মনে হ'ল এই কথা যে, গীতাও তার দাদা অনন্তের মতই তার সামান্য রোজগার নিয়ে একটু টিটকারী দিয়ে গেল। ভাবটা এই যে, তুমি আমাদের বাড়ীর কর্ত্তার মত দু'হাজার টাকা রোজগার তো কর না, সামান্য দেড়শো টাকা রোজগার তোমার, তোমার এসব স্পর্দ্ধা কেন?

বিকাশ যেটাকে ঠাওরালে তার রোজগারের স্বল্পতার উপর প্রচ্ছন্ন টিটকারী, তাতে সে এত চটে গেল যে সে এ কথার কোনও একটা জবাব দিতে পারলে না, মুখ ক'রে চলে গেল। মনে মনে সে তখনি প্রতিজ্ঞা ক'রলে, বড়লোক হ'তে হবে তার, মেসোম'শায়ের চেয়ে অনেক বেশী বড়লোক হতে হবে, তবে এদের ধোঁতা মুখ ভোঁতা করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল মেশোমশায় না বড় লোক আছেন, তিনি দেড়শো টাকা রোজগারকে তুচ্ছ

ক'রতে পারেন, কিন্তু এরা দু'টি ভাইবোন, মেসোমশায়ের অনুগ্রহপুষ্ট পরান্নভোজী হয়ে এদের এতখানি তেজ কিসে? সাধে কি বলেছেন কবি, "দীপ্তসূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে।"

হরিনাথবাবু অফিস থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে সুস্থির হ'লে বিকাশ অত্যন্ত সসঙ্কোচে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেসোম'শায়কে সে তার একমাসের মাইনে প্রণামী দিতে এসেছে। এতক্ষণে সে এই টাকাটা দেওয়ার কল্পনায় খুব উল্লাস ও তৃপ্তি অনুভব ক'রছিল। কিন্তু এখন যেন সঙ্কোচে তার হাত-পা' পেটের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল। বিশেষতঃ অনন্ত ও গীতার কথা শুনে তার মনে হচ্ছিল যে মেসোম'শায়কে সামান্য এই দেড়শো টাকা দিতে যাবার স্পর্দ্ধায় তিনি হয় তো তাকে টিটকারী দেবেন না হয় তিরস্কার করবেন।

হরিনাথবাবু আজও একলা ব'সেছিলেন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের ভিতর তাঁর বৈঠকখানার ইজি চেয়ারে—একা। বিকাশ এসে কম্পিত হস্তে আলোর সুইচ টিপে দিয়ে তার পায় প্রণাম ক'রে মেসোম'শায়ের ইজিচেয়ারের হাতলের উপর দেড়শো টাকার নোট রেখে দিয়ে নত মস্তকে দাঁড়াল।

হরিনাথবাবু উঠে ব'সলেন। টাকার দিকে চেয়ে পরম আনন্দে হেসে উঠে বিকাশকে একেবারে বুকের ভিতর টেনে নিলেন। যখন তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন, তখন বিকাশ দেখতে পেল তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, কিন্তু চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

কিছুক্ষণ কোনও কথা বল্লেন না মেসোম'শায়। নিঃশব্দে টাকাগুলি নিয়ে তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রেখে চাবী বন্ধ করে দিলেন। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক, টাকা পেলে তিনি তা' বন্ধ না করেই নিয়ে দেন মাসীমার কাছে। তার পর সে টাকার আর কোনও খোঁজখবর নেন না।

অনেক্ষণ মনে হ'ল তাঁর কণ্ঠরোধ হ'য়েছিল। যখন তিনি কথা কইতে পারলেন তখন বল্লেন, "জানিষ ছোকরা, তোর এ টাকার দাম কত?....আমার কাছে এর এক এক টাকার দাম লাখ টাকা। এ টাকা খরচ হবে না। একে

আমি খুব দামী album-এ বাঁধিয়ে রেখে দেবো। কেন জানিস? সারাজীবন আমি কেবল দিয়েই গেছি, রোজগার যা' ক'রেছি এক পয়সাও রাখি নি, দিয়েই গেছি—কিন্তু কেউ আমাকে ভালবেসে বা কৃতজ্ঞতাবশে একটি কাণা-কড়িও দেয় নি। জীবনে এই আমার প্রথম ভালবাসার উপহার।" বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিকাশ চিরদিন মেসোম'শায়কে জানে হাস্যময় রসিকতায় একেবারে টইটুম্বুর। পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে সবার সঙ্গে তিনি কথা কন পরিহাস ক'রেন, হাসি ছাড়া কথা নেই তাঁর। তাঁর এরকম ভাবাবেগ, তাঁর চোখে জল বিকাশ দেখেও নি, দেখবে বলে কল্পনাও করেনি কোনও দিন। তাই সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু আনন্দে গর্ব্বে তার বুক ফুলে উঠলো।

জন্ম সে পেয়েছে বাপ-মার কাছে, কিন্তু তার জীবন বলতে যা কিছু সবই তার মেসোম'শায়ের দান। শিশুকাল থেকে সে তার অন্নে পুষ্ট, তাঁর সম্পদে সম্পন্ন। শিক্ষা যা কিছু পেয়েছে সে তাঁরই দয়ায়, আর তার খেলা যা থেকে বলতে গেলে আজ তার প্রতিষ্ঠা....সেও মেসোম'শায়ের শিক্ষা ও উৎসাহের কাছে সম্পূর্ণ ঋণী। এ জন্য কৃতজ্ঞ সে ছিল চিরদিনই, কিন্তু আজ তার মেসোমশায় তাঁর অন্তরের রুদ্ধ একটা কপাট খুলে তাঁর অন্তর যেমন করে মেলে দিলেন, তার কাছে তাতে তার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন ও প্লাবিত ক'রে বয়ে গেল এমন একটা প্রীতি ও সহানুভূতির বন্যা, যা সে জীবনে কোনও দিন অনুভব করে নি।

হরিনাথবাবু আবার সেই ইজিচেয়ারে বসে তার হাত ধ'রে তাকে চেয়ারের হাতলের উপর বসালেন, তার হাতটা চেপে ধ'রে। সেই হাতের ভিতর দিয়ে বিকাশ অনুভব করলে তাঁর অন্তরের আবেগের মৃদু কম্পন।

হরিনাথ বাবু বলে গেলেন, "তুই হয়তো ভাবছিস যে, এত টাকা রোজগার করি আমি, তবু এ পাবার জন্য হ্যাংলাপানা আমার কেন? কিন্তু বাবা, যে টাকা আমি রোজগার করি সে সবই রোজগার আমার পরিশ্রমের দাম। তার

ভিতর স্নেহ নেই এক ফোঁটা। তার দামের সঙ্গে তুলনায় স্নেহের দান যে কাণাকড়ি, তারও দাম অনেক বেশী। সেইটে আমি পাইনি সারা জীবন, তাই তারই জন্যে আমার বুকভরা আছে তৃষ্ণা। পৃথিবীর সবার মুখের দিকে আমি আকুল ভিক্ষা নিয়ে চেয়ে থেকেছি এই স্নেহ ও প্রীতির দানের আশায়, পাই নি। পেলাম শুধু তোর কাছে। তাই আজ আমার এত আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, বেঁচে থাক, সুখী হও, আর এমনি সুখ তুমি চিরজীবন সবাইকে বিতরণ কর।"

বিকাশের চোখ এবার জলে ভরে উঠলো, তারও কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল বাষ্পে। সে কম্পিত কণ্ঠে ব'ল্লে "আপনার আশীর্ব্বাদ মেসোম'শায় ব্যর্থ হবে না।" ব'লে সে প্রণাম করলে আবার।

বাড়ীর ভিতর সে গেল না, গেল বাইরে। হাটতে হাটতে সে চ'ললো পথ দিয়ে।

তার অন্তর এতখানি পরিপূর্ণ হ'য়ে ছিল যে বাইরের সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞান ছিল না। মেসোমশায়ের সম্পন্ন আনন্দের জীবনে যে এতবড় একটা নিঃসঙ্গ শূন্যতা চেপে র'য়েছে তা সে কোনও দিন কল্পনাও করে নি। আজ সে পেলো তার নিবিড় পরিচয়।

তাতে তার প্রতি করুণায় স্নেহে তার অন্তর ভ'রে উঠলো —সে যে তার এই রিক্ততার ভিতর এক ফোঁটা আনন্দ ভরে দিতে পেরেছে তাতে সে কৃতার্থ মনে ক'রলো আপনাকে।

চ'লতে চল'লে সে এসে প'ড়ল রাচী পাহাড়ের-পাদমূলে। এইখানে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

চারিদিকের সমতলের মাঝখানে এই পর্ব্বত আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে অনেক দূরে। অবিসম্বাদিত গৌরবে সে মহান, তার উচ্চতার আশে পাশে একটা ছোট টিলাও নেই তার গৌরবের নিঃসঙ্গতা দূর করবার। বিকাশের মনে হ'ল এই পাহাড়টা হরিনাথ বাবুর প্রতীক। তার বিস্তীর্ণ পরিবারের

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এই তুঙ্গ শৃঙ্গের মত সগৌরবে। কিন্তু কি নিঃসঙ্গ তাঁর ঐ মহত্ত্বের শিখর।

সে প্রতিজ্ঞা ক'রলে মেসোমশায়ের জীবনের এই উদাস রিক্ততা সে দূর ক'রে দেবে তার একার স্নেহ ও সেবা দিয়ে। টাকা পয়সার কাঙাল তিনি নন, তবু সে কি পারবে না কোনও দিন তাঁকে এই টাকা রোজগারের ব্যর্থ ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি ও আনন্দের ধারায় অভিষিক্ত ক'রে রাখতে?

মনে মনে কত কল্পনার ছবি রঙিন হ'য়ে ফুটে উঠলো। স্বপ্ন দেখলে সে যে হঠাৎ সে হ'য়ে উঠেছে মেসো মশায়ের চেয়ে ধনী…সে এসে তাঁকে বলছে, আপনি আর কাজ করবেন না, আমার সংসারে প্রভু হ'য়ে ব'সে আমার রোজগারের সব টাকা নিয়ে যা খুসী করুন। ভাবতে তার সর্ব্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

বিকাশ যে আফিসে কাজ করে, তার বিপুল কারবারের একটা বড় অংশ পাটের রপ্তানী। সেই পাটের কারবারেই এখন বিকাশ কাজ করে, আর এখানে ইতিমধ্যেই তার আলাপ হ'য়েছে অনেক দালাল, মহাজন ও আড়তদারদের সঙ্গে। তাদের কাছে অনেক কাহিনী শুনেছে। পাটের কারবারে কতলোক যে রাতারাতি ধনী হ'য়েছে, কত বা ফকীর হ'য়েছে সে খবর কে জানে। বিশেষ ক'রে ফাটকা খেলায়, প্রায় কিছুই সম্বল না নিয়ে একটা season-এর কেনা বেচায় লক্ষ টাকা করা যায়, এ খবর সে শুনেছে।

…যদি সে তেমনি হঠাৎ লক্ষপতি হ'য়ে পড়ে। তা' হ'লে সে তার লক্ষ টাকা যদি এনে দিতে পারে মেসোম'শায়ের হাতে তবে কি তৃপ্তি, কি আনন্দে ভরে উঠবে তাঁর চিত্ত!

পরের দিন যখন সে ক'লকাতার ট্রেণে উঠলো, তখনও তার এ রঙিন স্বপ্নের আমেজ সম্পূর্ণ কাটে নি। সে মনে মনে স্থির ক'রলে একবার ফাট্কার বাজারটায় টোকা মেরে দেখতে হবে। কে জানে হয় তো অদৃষ্ট খুলেও যেতে পারে।

চট্‌পট্‌ ধনী হবার স্বপ্ন সে দেখতে লাগলো। আজকের এ স্বপ্নে দরিদ্র সেবার কল্পনা নেই—নিজের সুখের চিন্তা নেই—আছে মেসোমশায়ের তৃপ্তি ও আনন্দ ভরা অন্তর দেখবার আশা ও আনন্দ।

ক'লকাতায় এসে একজন পরিচিত পাটের কারবারীর সঙ্গে আলাপ হ'ল তার আফিসেই।

সে বললে, "এখন ফাটকার বাজার যা মন্দা যাচ্ছে, এই সময় যদি কিছু কিনে রাখা যায় তবে লোকসান হ'তে পারে না, কেন না দর এর চেয়ে নীচে কিছুতেই নামবে না। যদি নামে তো দু-চার আনা। বেশ কিছু বেড়ে যাবারই বেশী সম্ভাবনা। হাজার টাকার ঝুকি যদি নিতে পারেন, তবে বরাতে থাকলে অনেক টাকা পেতে পারেন।

হাজার টাকা! কোথায় পাবে সে? বছর খানেক বাদে হয় তো সে হাজার টাকা জমাতে পারে, কিন্তু তখন পাটের এ বাজার তো থাকবে না!

কিন্তু যতীনবাবু সদাশয়। তিনি হিসাব ক'রলেন বিকাশ দেড়শো টাকা মাইনে পায়, আরও মাইনে বাড়বে, একে হাজার টাকা ধার দিলে আদায় হওয়া সম্ভব। হেসে বললেন, "আমি ধার দিচ্ছি হাজার টাকা।"

ফাটকা বাজারে পাটের কেনা বেচা হয় কোটি কোটি টাকার। তার জন্য পাটের দরকার হয় না। ব্রোকারদের মধ্যস্থতায় পাট কেনা বেচার চুক্তি হয়, নির্দ্দিষ্ট তারিখে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বেল দেবার চুক্তি। অধিকাংশ স্থলেই এ চুক্তি অনুসারে পাট সত্যি সত্যি বিক্রী হয় না, নির্দ্দিষ্ট দিন এলে তার ডেলিভারীও দিতে হয় না। যে দরে বেচবার চুক্তি হল, নির্দ্দিষ্ট তারিখে যদি তার চেয়ে বেশী দর হয় তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে দেয় difference অর্থাৎ বাড়তি দামের পরিমিত টাকা। যদি দর কম থাকে তখন ক্রেতা difference দিয়ে খালাস হন। নির্দ্দিষ্ট তারিখ থাকে তিন মাস বা ছ'মাস পরে। কাজেই ফাটকা বাজারে পাটের একটি আঁশেরও মালিক না হ'য়ে লোকে লক্ষ মণ পাট বেচে আর এক গাঁইট পাট কেনবার ইচ্ছা না ক'রলেও লক্ষ গাঁইট কিনতে পারে।

বিকাশ এই অর্থ নিয়ে ফাটকার বাজারে খেলতে সুরু ক'রলে। বিকাশ পাট জন্মে দেখেছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাঁর ব্রোকার তার হিসাবে বিস্তর পাট বেচা কেনা করতে লেগে গেল—সত্যি কিনবে ব'লে নয়—difference নিয়ে লেন দেন করবে বলে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে তার ভাগ্যের যে পরিচয় সে পেয়েছিল, সে ভাগ্য এ জুয়াখেলাও তার সঙ্গে ছোট খাট কাজ থেকে সুরু করে ক্রমে সাহস করে সে আট দশ হাজার গাঁইটের কেনা বেচা আরম্ভ করলে। আর দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর তর্ তর্ করে বেড়ে যেতে লাগল আর সে তাতে দুই সপ্তাহ অন্তর difference পেতে লাগল বিস্তর টাকা।

বাজার সামান্য একটু মন্দা পড়তেই সে সব পাট বেচে দিলে। তাতে লাভ লোকসান খতিয়ে তার ব্যাঙ্কে ছ'মাসের মধ্যেই জমলো ছাঁকা দশ হাজার টাকা।

উল্লাসে বুক ফুলিয়ে সে ভাবলে, "এই শনিবার যাবো মেসোম'শায়ের কাছে দশ হাজার টাকার চেক নিয়ে।" আর গীতার মুখের উপর একবার সে চেকটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। দেখবে সে শুধু মাসে দেড়শো টাকা মাইনের কেরাণী নয়—হাজার হাজারের খবরও সে রাখে। সামান্য একটা পঁচিশ টাকার টপ সে দিতে পারে!

দেখে গীতার পরাভূত গর্ব্ব মাটিতে মিশে যাবে এ কথা ভাবতে বিকাশের খুব আনন্দ বোধ হল।

ব্যাগ্রভাবে সে শুক্রবারের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

শুক্রবার সকাল এলো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো সর্ব্বনেশে টেলিগ্রাম।

মেসোম'শায়ের এপোপ্লেক্সী হ'য়েছে, অবিলম্বে যেতে হবে বড় ডাক্তার নিয়ে।

মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না ক'রে বিকাশ তার চেক বই হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লো। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে দৈনিক হাজার টাকা ফি দিয়ে কলকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে সঙ্গে করে সে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হ'ল রাঁচী।

চিকিৎসায় যা কিছু সম্ভব, করা হ'ল। অকাতরে অর্থব্যয় ক'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ও শুশ্রূষা ক'রে বিকাশ হরিনাথ বাবুর সেবা ক'রলে কিন্তু পাঁচ দিন কেনও মতে টিকে থেকে শেষে হরিনাথ বাবু মারা গেলেন।

প্রথম অজ্ঞান হওয়ার পর ক্রমে ব্যাধি অকটু উপশম হবার রকম হ'য়েছিল, কিন্তু জ্ঞান আর তাঁর হ'ল না, কাউকে একটিও কথা ব'লে যাবার সময় পেলেন না।

শ্রাদ্ধ হ'য়ে যাবার পর ক্রমে তাঁর টাকা-কড়ির খবরাখবর করা হ'লে যা' দেখা গেল তাতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে ব'সলো।

মেসোম'শায় নিজে কিছু ব'লে যেতে পারেন নি। তাঁর কাগজপত্র ঘেঁটে এবং তাঁর মুহুরীর কাছে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তাঁর মক্কেলদের কাছে তাঁর পাওনা ছিল পাঁচ ছ' হাজার, কিন্তু অন্য মক্কেলদের তাঁর কাছে পাওনাও প্রায় সেই পরিমাণ। লাইফ ইন্সিওরেন্সে তাঁর পাওনা হাজার আটেক। বিকাশ সব চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল এই দেখে যে হরিনাথ বাবু বিস্তর দেনা ক'রেছেন। তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স ছিল কিন্তু তার কতক তিনি অল্প টাকায় পেড আপ্ ক'রেছেন আর বাকীগুলি থেকে ধার ক,রেছেন এত যে তা' থেকে পাওয়া যাবে মাত্র আট হাজার টাকা। তা ছাড়া বাইরেও তাঁর দেনা দেখা গেল বিস্তর। মক্কেলদের অনেক টাকা তাঁর হাতে আসতো, তার হিসাব-নিকাশ ক'রে দেখা গেল যে তা থেকেও তিনি বিস্তর ধার নিয়েছেন। তা' ছাড়া মহাজনের কাছেও টাকা ধার ক'রেছেন। এ সব দেনা হয়েছে দুই বৎসরে।

সমস্ত ব্যাপারটা বিকাশের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। এ দুই বৎসর হরিনাথ বাবুর আয় ক্রমাগত কমে এসেছে। সঞ্চয় তিনি কোনও দিন করেন নি, যখন যা পেয়েছেন হাত খুলে খরচ ক'রেছেন—অর্থাৎ খরচ ক'রতে দিয়েছেন

অন্নপূর্ণা দেবীকে। আয় যখন কমে গেল তখন অন্নপূর্ণার ব্যয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে কমেনি, ফল কথা আয় কমবার খবরও তিনি জানতেন না। তখনও চাইবা মাত্র বা না চাইতেই মেসোম'শায় তাঁকে টাকা দিতেন ঠিক আগের মতই। আর তিনি খরচ ক'রতেন অকুণ্ঠিত প্রাচুর্য্যের সহিত।

হরিনাথ মূর্খ ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, উপার্জ্জন থেকে এই ব্যয়-ভার বহন করিবার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু অন্নপূর্ণাকে তিনি জানতেন—জানতেন যে, অন্নপূর্ণার অযাচিত-দান ক্ষুণ্ণ ক'রলে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগবে। অভাবের নিঃশ্বাস মাত্র তাঁর গায় লাগলে তাঁর যে দুঃখ নিবারণ করবার একটা দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা নিয়ে অভাব ও আগামী দুর্ভাগ্যের সমস্ত আঘাত হরিনাথ পেতে নিয়েছিলেন নিজের বুকে, ভবিষ্যতের দিকে চাইতে সাহস করেন নি, বর্ত্তমানে এ বিপদ কিসে ঠেকান যায় তাই হ'য়েছিল তাঁর এক চিন্তা।

এই সব কথা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো বিকাশের চিত্তে। এখন সে বুঝতে পারলো কেন হরিনাথ একলা অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকতেন সন্ধ্যা বেলায়।

ভারী দুঃখ হল তার—আগে কেন সে এ কথা বোঝে নি। তবে হয় তো সে তার উপার্জ্জনের ভরসা দিয়ে মেসোম'শায়ের দুশ্চিন্তার ব্যথা কমাতে পারতো। চাই কি আরও দুঃসাহসিক চেষ্টা ক'রে এত উপার্জ্জন ক'রে তাঁকে দিতে পারতো যাতে তাঁর জীবন হয়তো এত শীঘ্র নষ্ট হ'ত না।

যা' হ'ক, মোটের উপর দেখা গেল, সব দেনা-পত্তর দিয়ে থুয়ে হরিনাথের রাঁচীর বাড়ীখানা থাকে, আর থাকে কিছু ভূসম্পত্তি,—দেশে ও রাঁচীতে যার পরিচয় বা পরিমাণ বিকাশ কিছুই জানতে পারলে না। তার খবর জানে শুধু অনন্ত—কিন্তু সে নীরব!

বিকাশ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে মেসোম'শায়ের কিছুই সে ক'রতে পারেনি; কিন্তু যে কঠোর ব্রত নিয়ে তিনি শেষ জীবন ক্ষয় ক'রেছেন তার উদ্‌যাপন যতদূর সাধ্য সে নিজে করবার চেষ্টা ক'রবে। যতদূর তার সাধ্য—অন্নপূর্ণার অন্নাভাব—কোনও কিছুর অভাব যেন কোনও দিন না হয়, এই

হবে তার জীবনব্যাপী সাধনা। মেসোম'শায়ের আশীর্ব্বাদ তার মনে হ'ল, ভরসা হ'ল সেই আশীর্ব্বাদ নিয়ে তাঁর পরিবারকে অন্ততঃ আনন্দ দান ক'রতে পারবে।

তাই বিকাশ তার মাসিমাকে বল্লে, "চলুন মাসিমা, আমার সঙ্গে ক'লকাতায় আমার কাছে। মেসোম'শায় গেছেন, আমি আপনাদের সন্তান, অযোগ্য হ'লেও আপনাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে। চলুন।"

মাসিমা কেঁদে বল্লেন, "যাব কোথায় বাবা? খাব কি? কেমন ক'রে চ'লবে সংসার?"

"সে ভার আমার মাসিমা। আপনাদের আশীর্ব্বাদে সে ভার বইবার শক্তি আমার আছে।"

"কিন্তু কেমন ক'রে যাই বল। এত বড় সংসার, এতগুলি আমাকে আশ্রয় ক'রে আছে"—

"ক'লকাতায়ও আপনাকে আশ্রয় ক'রে যারা থাকবার তারা থাকবে, আপনারই সংসারে। আমি বলি এ বাড়ীখানা বেচে ফেলে যে টাকা হবে তাই নিয়ে ক'লকাতায় চলুন, আপনার আশীর্ব্বাদে যাতে আপনার কোনও কষ্ট না হয় সে উপায় আমি ক'রতে পারবো।"

এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে মাসিমার সময় লাগলো। তাঁর এতদিনকার সাধের ঘরবাড়ী ছেড়ে যেতে তাঁর প্রাণ আবার নূতন করে স্বামীর বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্মত হ'লেন।

কিন্তু বাগড়া দিলে অনন্ত। সে বল্লে, "জ্যেঠাম'শায়ের এত বড় নাম, এতখানি সম্মান—এ বাড়ীখানা বেচে নিঃশেষ ক'রে দিতে সে কিছুতেই দেবে না। এ ওজুহাত যখন বিশেষ টেঁকবার সম্ভাবনা রইল না, তখন সে স্বমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে বল্লে, এ বাড়ী তো জ্যেঠাম'শায়ের একার নয়—যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, তাতে তার ও বসন্তের অর্দ্ধেক ভাগ, তাদের সম্মতি ছাড়া এটা বেচা হ'তে পারে না।

কথাটা শুনে মাসিমা সিংহীর মত গর্জ্জে উঠলেন, বল্লেন, "বটে, অংশ আছে ওর। যখন ওর বাপ এসেছিল এখানে, তখন সে ছিল নেংটে ভিখারী। দেশের সম্পত্তি সব লাটে উঠিয়ে তিনি এসেছিলেন দাদার ভাই হ'তে। তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ ক'রেছি, তার ছেলেপিলেদের মানুষ ক'রেছি—ওকে সব বিষয়ে কর্ত্তা ক'রে রেখেছি—এখন বলে কিনা ওর সম্পত্তি। কাণাকড়িও পাবে না ও—বেচে ফেল বাড়ীখানা, দেখি ও কি ক'রে। অংশীদার ঘুচিয়ে দাও।"

বিকাশ কিন্তু ঝগড়াটা চাপা দিলে। সে উকীলদের কাছে শুনলে যে, বাড়ীতে তার মাসিমার শুধু জীবন-স্বত্ব। তিনি মারা গেলে পাবে তাঁর দৌহিত্র অমল। মাসিমার দান-বিক্রীর অধিকার নেই, কাজেই তিনি বেচলে বাড়ীর দাম হবে না। তাই বাড়ী বেচবার কথা একেবারে চাপা দিয়ে সে বাড়ী ভাড়া দেবার প্রস্তাব করলে।

অনন্ত বল্লে, "ভাড়া দেওয়া চলবে না। আমার ক'লকাতার জল সইবে না। আমি এখানেই থাকবো।"

বিকাশ এইবার মুখ ফুটে কথা কইলে, বল্লে, "থাকবেন যে খাবেন কি? এতদিন তো একপয়সা রোজগার করলেন না, এখানে চলবে কিসে? বরং ক'লকাতায় গিয়ে একটা রোজগারের চেষ্টা করুন। এখন তো আর মেসোম'শায় নেই যে অঠেল টাকা এনে দেবেন।"

খুব তীব্র দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চেয়ে অনন্ত বল্লে, "কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। দেড়শো টাকার মাইনের কেরাণী হ'য়ে মাথা কিনে বসেছেন। ফের অমন কথা বলবি তো তোর মুখ ভেঙে দেবো, জানিষ?"

বিকাশের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো, সে আত্মসংবরণ করতে পারলে না, ভ্রূকুটি ক'রে অশ্রদ্ধার হাসি হেসে বল্লে, "মুখ ভেঙ্গে দেবেন? পারবেন? সে শক্তি আছে আপনার?"

অনন্ত তেড়ে-ফুঁড়ে গেল বিকাশকে মারতে। তার গাল লক্ষ্য ক'রে অনন্ত

যে ঘুসি তুলেছিল, বিকাশ তাকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে অনন্তের দুই হাত ধরে তাকে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ফরাসের উপর।

অনন্ত দেখলে, আর অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। বিকাশের বলিষ্ঠ বাহুর কাছে তার আস্ফালন শুধু লাঞ্চনার আমন্ত্রণ। তাই যদিও তার লেগেছিল খুব অল্পই, তবু সে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলো, যেন বিকাশ তার হাতগুলি একদম চুরমার ক'রে ভেঙ্গে দিয়েছে।

বিকাশ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেল! মাসিমার কাছে গিয়ে বল্লে, "থাক গে মাসিমা এবাড়ী, আপনি চলুন।"

## দশ

ক'লকাতায় গিয়ে বিকাশ একশো টাকা ভাড়ায় একখানা বাড়ী নিলে। মাসিমাকে আনতে গিয়ে দেখলে যে, তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে এবং নাতি-নাতনী ছাড়াও এলো বসন্ত, গীতা এবং অনন্তের বড় ছেলে। সে ভেবেছিল এরা সব অনন্তের সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু না এরা মাসিমাকে ছাড়ে, না মাসিমা ছাড়েন এদের।

মেসোম'শায়ের মৃত্যুর পর আবেগের মুখে বিকাশ মাসিমা ও তাঁর পরিবারের সমস্ত অভাব দূর করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর মাথা ঠাণ্ডা হ'তেই এ দায়িত্বের কথা মনে হ'তে তার বুক কেঁপে উঠলো। সে ভাবলে যে, তার পক্ষে এই হাতী পোষার চেষ্টা একটা দুঃসাহসের কাজ। হরিনাথবাবুর পরিবারের স্বচ্ছলতার ভিতর যারা মানুষ, তাদের খুব বেশী কষ্ট সইতে বলতে সে পারবে না। অথচ এই বৃহৎ পরিবার ক'লকাতায় রেখে পালন করবার

শক্তি তার নিতান্ত অপ্রচুর! তার স্থায়ী আয় মাসে দেড়শো টাকা! ফাটকায় তার যে দশ হাজার টাকা লাভ হ'য়েছিল তার আট হাজারের বেশী খরচ হ'য়ে গেছে মেসোম'শায়ের চিকিৎসায়, শ্রাদ্ধে আর তাঁর পরিবার ক'লকাতা আনতে। তার হাতে এখন আছে মাত্র হাজার দু'য়েক।

তবু বিকাশ বল্‌লে, কোনও চিন্তা নেই, একটা উপায় হবেই। তার মনে পড়লো মেসোম'শায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ! মনে হ'ল, যে মহাপ্রাণ ধনী পরিজন ও দরিদ্রের সেবায় নিঃস্ব হ'য়ে সংসার ত্যাগ ক'রে গেছেন, তাঁর আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হবে না! তাঁর পরিবারকে অন্তত আনন্দ বিতরণ করবার শক্তি সে পাবে।

ভেবে চিন্তে সে গেল আবার পাটের ফাটকার বাজারে। ব্রোকারের কাছে খবরাখবর নিয়ে জানলে যে বাজার এখন বড় খারাপ, কখন কি হয় বলা যায় না। যতীনবাবু যিনি তাকে প্রথম এ বাজারে নামান, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বল্‌লেন, "খবরদার বিকাশবাবু, এখন ছোঁবেন না পাট। একটা প্রকাণ্ড জুয়াখেলা শীগ্‌গীর হবে বোধ হচ্ছে। এখন কাজ করতে পারবে শুধু বড় বড় কুমীরেরা—চুণো পুঁটির ও বাজার থেকে তফাৎ থাকাই ভাল।"

ভড়কে গেল বিকাশ এ খবর শুনে। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে সে সামান্য এক হাজার বেল বেচতে অর্ডার দিয়ে এলো ব্রোকারকে। একটু পরে ব্রোকার বল্‌লে, "বেচা হয়েছে।" কি হয় না হয় ভাবতে ভাবতে বিকাশ অফিসে গেল।

আজই তার ছুটি ফুরিয়েছে, আজই সে প্রথম অফিসে এলো। তার যাবার একটু পরেই আফিসের একটা চাপরাশী তার কাছে একখানা কাগজ নিয়ে এলো। সেটা পড়ে বিকাশ লাফিয়ে উঠলো।

তাড়াতাড়ি একটা সই ক'রে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার সে কাগজখানা পড়তে লাগলো।

সে যখন কাজে ভর্ত্তি হয় তখন ছয় মাসের জন্য প্রোবেশনার বা শিক্ষা-

নবীশরূপে তাকে নেওয়া হ'য়েছিল। কথা ছিল যে ছয় মাস পরে তাকে একটা স্থায়ী চুক্তি ক'রে চাকরী দেওয়া হবে। মেশোমশায়ের ব্যাধি ও মৃত্যুর গোল-যোগে বিকাশের খেয়াল ছিল না যে তার ছয় মাস পূর্ণ হ'য়ে গেছে এখন তার স্থায়ী চুক্তি জন্য সাহেবের কাছে একটু তদ্বির করা দরকার।

এই কাগজে সে দেখতে পেলো যে তদ্বিরের অভাবে তার কোনও ক্ষতি হয় নি। তাকে আড়াই শো থেকে পাঁচ শো টাকার গ্রেডে পাঁচ বছরের চুক্তিতে নিযুক্ত করা করা হ'য়েছে।

এ খোস খবরটা মাসিমাকে জানাবার জন্য উৎসাহে অধীর হ'য়ে আফিসের ছুটি হ'তেই সে একখানা ট্যাক্সী ভাড়া ক'রে চ'ড়ে ব'সলো।

চ'লতে চ'লতে তার মনে হ'ল যে কনট্রাক্টটা যখন হ'লই তখন মিছামিছি ফাটকার বাজারে কাজটা না ক'রলেই হ'ত! কে জানে কত টাকা লোকসান দিতে হবে তাতে!

তারপর তার উল্লাস হঠাৎ ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো তার মেসোমশায়ের কথা ভেবে। যিনি তাঁর এ উন্নতির সংবাদে সব চেয়ে খুসী হ'য়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতেন তিনি আজ নেই। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে স্মরণ ক'রলে তার রোজগারের দেড় শো টাকা পেয়ে তিনি কি আনন্দ কি কৃতার্থতা দেখিয়ে ছিলেন। সে তো অবসর পেলো না তাঁর সে আনন্দ বাড়াবার। আর, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবলে, তার এ উন্নতির সংবাদ নিয়ে সে যদি মেসো-মশায়কে ব'লতে পারতো যে আমার যা কিছু সবই আপনার তবে কি মেসো-মশায় আপনাকে দুশ্চিন্তায় অমন ক্ষীণ করতে পারতেন? না অত শীঘ্র মারা যেতেন?

তার সেই দেড় শো টাকা মেসোমশায় সত্যই খরচ করেন নি। তাঁর ড্রয়ার খুঁজে বিকাশ দেখতে পেয়েছিল একখানা সুদৃশ্য এলবামে তিনি এঁটে রেখেছিল সে নোট কয়খানা ফটোগ্রাফের মত করে, তার উপর লেখা ছিল, "বিকাশের দেওয়া উপহার ১৫০৲"!

বাড়ী এসে যখন সে খবরটা দিলে তখন সবাই বললে 'বেশ', মাসিমাও বললেন, 'বেশ', কতকটা আসান হবে তোর, কিন্তু তেমন উল্লাস ক'রলে না কেউ। গভীর বেদনার সঙ্গে সে কল্পনা করতে লাগলো কি আনন্দ করতেন তাঁর মেসোমশায় যদি তিনি এ খবর শুনতে পেতেন।

সব চেয়ে অসহ্য হ'ল তার গীতার কথা। তার মাইনে বাড়বার খবর পাবার পর গীতা এসে তাকে বললে, "বিকাশ দা" আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি কথা?"

"থাক নাই বললাম, হয় তো তুমি বলবে জ্যাঠামী করছি।"

বিকাশ একটু লঘু স্বরে বললে, "তা' অবিশ্যি বলবো, কিন্তু তাই বলে কথাটা শুনলে হানি কি?"

"বলছিলাম কি? মাইনে বাড়লো বলে তুমি সাত তাড়াতাড়ি আবার বাড়ীর সবার জন্যে প্রেজেণ্ট আনতে ছুটে না। মিছামিছি টাকা খরচ কেন করবে? অমন রোজগার জ্যোঠাম'শায় করতেন, সব কোথায় গেল দেখলে তো? তুমিও সেই ভুলটা করোনা। বাড়তি টাকাটা রেখে দিও ব্যাঙ্কে।"

"দেখ, তোর এ কথাটা জ্যাঠামীরও ওপরে উঠেছে, এ স্রেফ ডেঁপোমী! বলেই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে, "আর দেখ একটা কথা তুই সর্ব্বদা মনে রাখিস। মেসোম'শায় মানুষ ছিলেন না, দেবতা—দধীচির মত ত্যাগী। তাঁকে কোনও দিক দিয়ে খাটো করে বা তাঁর কাজের উপর কোনও সমালোচনা করে কোনও কথা অন্ততঃ আমার কাছে তুই বলিস না—আমি তাঁর নামে এমন কোনও কথা কোনও দিন শুনতে চাই না।"

গীতা আর কিছু না ব'লে চলে গেল।

এই ষোল বছরের মেয়েটার এতটা ধৃষ্টতায় সে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে গেল। গীতা যা' বললে সে ছাঁকা সত্যি কথা, বুদ্ধিমানের যুক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ উপদেশ সে তাকে দিতে আসে কি সাহসে? আর তা' ছাড়া যতই বুদ্ধিমানের যুক্তি হ'ক, তার কথা মানবার উপায় বিকাশের নেই। মাসিমা

চিরজীবন মেসোমশায়ের রোজগারের সব টাকা খরচ করে এসেছেন। অনন্ত অবশ্য তাঁর কাছ থেকে অনেক টাকাই নিয়ে খরচ ক'রেছে, কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে ছাড়া মেসোমশায়ের কোনও টাকাই যায় নি। এখন তাঁকে বিকাশ কোন প্রাণে বলবে যে, আমার এই সামান্য আড়াই শো টাকা আপনি খরচ ক'রতে পারবেন না। এই সামান্য টাকা খরচ ক'রে তাঁর কোনও তৃপ্তিই হবে না, কিন্তু তার যা সাধ্য তা সে করবে মাসিমার অভিশপ্ত জীবনে তৃপ্তি দেবার জন্য।

বিকাশ স্থির করলে গীতার সুবুদ্ধির যুক্তি সে শুনবে না, তার মাইনের সব টাকা সে মাসিমাকে দেবে। তিনিই সব খরচ করবেন। ভাবলে এই গীতা মেয়েটার মনে কৃতজ্ঞতা নেই এক ফোঁটা। মাসিমার অপব্যয়ের কথা সে তোলে কিসে? গীতার সাড়ী জামা গয়নার যে বাহুল্য সে যে সেই অপব্যয়েরই ফল।

মাস কাবার হবার আগেই বিকাশের হাতে এসে প'ড়লো অনেকগুলি টাকা।

একদিন যতীনবাবু তাকে বললেন, "দেখলেন তো বিকাশবাবু, যা' বলেছিলাম তাই। বড় বড় ব্যবসায়ীরা মিলে হুড় হুড় ক'রে রোজ পঞ্চাশ ষাট হাজার গাঁইট বেচে দামটা কি ভীষণ নামিয়ে দিয়েছে! সাধে আমি আপনাকে এই বাজারে খেলতে বারণ করেছিলাম।"

বিকাশ হেসে বললে, "আমি কিন্তু আপনার পরামর্শ মানিনি যতীন বাবু —আমি বেচেছিলাম এক হাজার গাঁইট।"

"বেচেছিলেন? তবে কেল্লা মেরে দিয়েছেন! গাঁইট পিছু দশ টাকা— দশ হাজার টাকা পেয়েছেন তা' হলে।"

হেসে বিকাশ বললে, "তা পেয়েছি।"

"খুব জোর কপাল আপনার। ফাটকার বাজারে আপনি ছুঁলেই দেখছি টাকা আসে।"

"তাই দেখছি। শুধু ফাটকা নয়—একবার রেস খেলেছিলাম, তাতে পেয়েছিলাম একদানে এক হাজার।"

"বটে। বেশ। কিন্তু কপালের উপর খুব বেশী ভরশা করবেন না। লক্ষ্মী যে কখন হাসান কখন কাঁদান তার ঠিকানা নেই। এখন যখন আপনার দিন চলছে ভাল, তখন এ টাকাটা দিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের নতুন স্কীমে খানিকটা জায়গা কিনে ফেলুন।"

যতীনবাবু সেই দিনই বিকাশকে নিয়ে গিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দশ কাঠা জমী কিনিয়ে দিলে। বিকাশ আট হাজার টাকা নগদ দিলে, বাকীটা কিস্তীবন্দী করে নিলে।

বাড়ী ফিরে সে দু' হাজার টাকার নোট মাসিমার হাতে দিলে।

মাসিমা আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন, "দু' হাজার টাকা পেলি কোথায় রে ?"

"দু' হাজার নয় মাসিমা, পেয়েছি দশ হাজার—আট হাজার টাকায় দশ কাঠা জমী কিনেছি আর এ দু' হাজার বাড়ীতে এনেছি।"

মাসিমা বললেন "বেশ করেছিস। তা রেখে দেগে।"

বিকাশ বললে, "আমি রেখে দেবো কি মাসিমা ? আপনি রাখুন, আপনি খরচ করবেন। ভেবেছেন আমি খরচের ঝক্কি পোহাতে যাব ?"

মাসিমা এইবারে হেসে বললেন, "পাগল ছেলের কথা শোন! ঠিক তোর মেসোর ছবি। তা' বেশ। ও গীতা, এ টাকাগুলো তুলে রাখ তো মা।"

গীতা এলো, মাসিমার হাত থেকে দু' হাজার টাকার নোট নিয়ে গেল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে। একটা ক্লিষ্ট অপ্রসন্ন দৃষ্টী হেনে গেল বিকাশের দিকে।

বিকাশের মনটা খুসী হল এই ভেবে যে, এটা গীতার সেদিনকার জ্যাঠামীর খুব মুখের মত জবাব হ'ল।

গীতা এর শোধ তুললে পরের দিন বিকাশের হাত দিয়েই। ওই দু' হাজার টাকার বেশীর ভাগই সে মাসিমার কাছে নিয়ে কিনলে গয়না—বেশীর ভাগ তার নিজের আর কিছু শ্যামলীর।

গয়না কিনে খুব খুসী মনে হাসতে হাসতে সেগুলো যখন গীতা সিন্দুকে তুলছে তখন বিকাশ এসে বললে, "আমার কাছে যে বড় লেকচার ঝাড়ছিলি পয়সার অপব্যয় না করতে, এখন তো টাকা আসতেই দিব্যি মোটা টাকা বাজে খরচ করিয়ে ছাড়লি গীতা।"

গীতা হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললে, "তা কি করবো? তুমি যখন টাকার হরিলুটই দেবে তখন আমি যা পারি কুড়িয়ে নেবো না? জান তো? মেয়ে মানুষ রোজগার করে না, তারা এমনি কুড়িয়ে বড়মানুষ হয়!"

গীতার উপর হ'ল বিকাশের দারুণ ঘৃণা। কি ছোট মন, কি নীচ, কি স্বার্থপর মেয়েটা! আবার মুখে মুখে কী বুলি তার? বিকাশের টাকার জন্য কী দরদ।

সুবোধ চ্যাটার্জীর কথাটা মনে হ'ল তার' 'সখের দরদী!' সে কথা বিকাশের সম্বন্ধে খাটে না, খাটে গীতার সম্বন্ধে।

একদিন সকালে ব'সে খবরের কাগজ প'ড়ছে বিকাশ, এখন সে কাগজে খেলার খবর ছাড়া বাজারদরগুলোও পড়ে—কিন্তু তার বেশী নয়, তার সামনে এসে দাঁড়াল সুবোধ।

তাকে চেনা যায় না।

সেই সৌখীন বাবু সুবোধ কি এই? আধময়লা একখানা ধুতি, হাতকাটা একটা জামা, এলোমেলো চুল, না-কামান খোঁচা খোচা দাড়ি, পায় এক জোড়া ধূলিমলিন নাগরা জুতো—একে দেখে কে বলবে যে এক বছর আগে এই ছিল তাদের হষ্টেলের প্রসিদ্ধ বাবু—যার প্রসাধনে রোজ লাগতো এক ঘণ্টা, আর সত্য যার খেদমৎ ক'রতে সারাদিন হন্ত দন্ত হ'য়ে বেড়াত।

বিকাশ উঠে এগিয়ে বললে, "আসুন সুবোধদা! কি ব্যাপার? কবে এলেন রাজসাহী থেকে?"

সুবোধ একটা চেয়ারে বসে পকেট থেকে বের ক'রলে দেশালাই ও বিড়ি।

আরও চমকে উঠলো বিকাশ—সুবোধ খায় বিড়ি! হষ্টেলে থাকতে যখন

তার নিজের রোজগার ছিল না এক পয়সা, তখন সে খেতো দামী সিগারেট আর বালাখানার শ্রেষ্ঠ তামাক। এখন সে পুলিসের ডেপুটী-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—সে খায় বিড়ি!

বিড়িধরিয়ে সুবোধ বললে, "রাজসাহী থেকে এসেছি অনেক দিন—আমার খবর জান না? কাগজে পড় নি?"

কাগজে আবার বিকাশ কবে কি প'ড়ে থাকে? সে বললে "না ভাই কি হ'য়েছে?"

"বিশেষ কিছু নয়, চাকরীটা গেছে।"

চমকে উঠলো বিকাশ—এ খবরটায়ও বটে, আর এত বড় একটা নিদারুণ খবর ব'লতে সুবোধের এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখে ততোধিক!.

সে বললে, "সে কী? কি হ'য়েছিল?"

"বেশী কিছু নয়, হরিপুরের হাট আর শম্ভু সা'র চালের গুদাম লুট হ'য়েছিল. তাতে আমি একটু সাহায্য করেছিলাম। এই সামান্য কাজের জন্য পুলিসের লোকের চাকরী যায় শুনেছ কখনও?" বলে সুবোধ হাসলে।

ক্রমে সে সব প্রকাশ ক'রে বললে।

"উত্তর বাঙ্গলায় অনেকটা জায়গায় দারুণ বন্যা হ'য়ে লোকের যে দারুণ কষ্ট হ'য়েছে তার কতক খবর কাগজে অবিশ্যি দেখেছ। কিন্তু যা হ'য়েছে তার তুলনায় কাগজের বর্ণনা একেবারে কিছুই নয়। হাজার হাজার লোক রেলের লাইনে, পথে ঘাটে প'ড়ে আছে—বৃদ্ধ, যুবা, নারী. শিশু—তাদের ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাবার নেই, পরবার ছেঁড়া নেকড়াও অনেকের একটি বই দুটি নেই। জল নেবে গেছে, যাদের ঘরদোর কিছু আছে, তারা সেই বিধ্বস্ত স্তূপের মধ্যে ফিরে গেছে যাদের নেই তারা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে।

বন্যার জল নেমে যাবার পর আমার উপর ভার হয়েছিল একটা অংশের চুরী-ডাকাতি নিবারণ করবার। চুরী-ডাকাতি হচ্ছিল কিছু, আর হবার সম্ভাবনাও ছিল বিস্তর।

হরিপুর গ্রামটা বন্যায় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, আর সেখানকার শম্ভু সা'র গোলায় বিস্তর ধান মজুদ ছিল। অগ্নিমূল্যে ধান-চাল বেচে শম্ভু সা' প্রচুর টাকা রোজগার ক'রছিল।

পাশে একটা গাঁয় যেতে হ'য়েছিল আমার। সেখানে দেখলাম কঙ্কালসার বুভুক্ষিত নর-নারী পথের ধারে প'ড়ে যা যেখানে পাচ্ছে পেটে দিয়ে কোনও মতে জ্বালার নিবৃত্তি করেছে। তাদের অবস্থা দেখে আমার কান্না পেলো।

আমি তাদের সব কথা শুনে চটে' মটে' একটা যুবককে বল্লাম, এত বড় জোয়ান ছোকরা খেতে না পেয়ে হাঁউ হাঁউ ক'রে কেঁদে মরছ সুধু, কিছু ক'রতে পার না ?„ কাতরভাবে সে বললে, "কি ক'রব হুজুর ?

"কেন, ধান-চাল কি দেশে নেই ? ঐ তো শম্ভু সা'র গোলা বোঝাই—প্রতি হাটে তো দেখি চাল ধরে না।"

"কিন্তু সে ধান কেনবার পয়সা কোথায় ? ধারও তো কেউ দেয় না হুজুর।"

"তাই কী ? তাই প্যান প্যান করে কাঁদবে সুধু ? ক্ষিদেয় পথে প'ড়ে মরবে শুধু—সামনে অত ধান চাল থাকতে। মানুষ ন'স তোরা শক্তি নেই হাতে ? লুটে নিতে পাঁরিস না ?"

"লোকগুলো এটাকে পরিহাস মনে ক'রে হাসলে। একজন হেসে বললে, "তা হালে আপনিই তো ধ'রে জেলে পাঠাবেন আমাদের।"

আমি বললাম, "তা পাঠাব। এখনি শুকিয়ে মরবার চেয়ে তা ভাল নয় ? জেলে গিয়ে খেতে তো পাবি।"

ব'লে আমি চ'লে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন প্রবীণ ইন্স্পেক্টার, আরও সব পুলিসের লোক। ইন্স্পেক্টার বাবু বললেন, "এ সব কথা এদের বললেন স্যর, এতে কি অনর্থ হয় দেখুন। এরা dangerous লোক।"

আমি ঘুরে বললাম, "কী হবে ? লুট হবে। তাই তো চাই, গোলা বোঝাই ধান নিয়ে মহাজন টাকা গুণবে এই এত বড় দুর্দ্দিনে, আর এরা শুকিয়ে

ম'রবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস কিছুই হবে না। এ লোকগুলো যদি মানুষ হ'ত তো হ'ত, এরা গরু।"

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখলাম, আমার কথায় কাজ হ'য়েছে। পরের হাটে হরিপুরের হাট থেকে লোক এসে আমাকে খবর দিলে—হাটে ধান-চাল লুট হচ্ছে'। আমি খুসী হ'লাম যে মানুষগুলো গরু হ'য়ে যায় নি একেবারে। ছুটে গেলাম হাটে।

ইনস্পেক্টর বাবুর আদেশে তখন কনেষ্টবলেরা লাঠি নিয়ে আক্রমণ ক'রছে। অপর দিকে লোকের হাতেও ক্রমে লাঠি উঁচিয়ে উঠছে দেখা গেল।

আমি গিয়ে লাঠিচার্জ্জ বন্ধ ক'রে দিয়ে বললাম, 'মারধোর যদি কেউ করে তবে তাকে গ্রেপ্তার করুন, আর দু'সের চাউলের বেশী যদি কেউ নেয় তাদের ধরুন, বাদবাকী যতদূর পারেন নাম লিখে নিয়ে ছেড়ে দিন।"

ইনস্পেক্টর বাবু বললেন, "আমি তা পারবো না স্যর—আমার duty—"

ইনস্পেক্টর বাবু পোষ্ট অফিসের বারান্দায় বহু কনেষ্টবল ঘেরা হয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন—

আমি মুখ খিঁচিয়ে বললাম, 'ওঃ! ভারী নিমকহালাল ডিউটিবাজ এসেছেন! ডিউটি ক'রবে তো এখানে ব'সে আছ কেন? নিরপরাধ কনেষ্টবলদের মার খেতে না পাঠিয়ে নিজে যাও ভীড়ের মধ্যে—সাহস থাকে লড়াই করগে। ওই দেখছ এক হাজার লোক? ওরা ক্ষেপে উঠলে পঞ্চাশটা কনেষ্টবল কি করতে পারবে?' আমি সবইনস্পেক্টারকে বললাম, "যাও আমি যা বললাম কর গে।"

আমার এ কথা দেখতে দেখতে হাটময় রটে' গেল। সব চাল লুট হয়ে গেল, শম্ভু সা'র গোলা শূন্য হ'য়ে গেল।

প্রায় একশো গ্রেপ্তার ক'রে চালান দিলাম আমি। তারা হয় মারপিট করেছে, না হয় চার-পাঁচ সের চাল নিয়েছে প্রত্যেকে!

বলা বাহুল্য, আমার এ কীর্ত্তি চাপা রইল না। ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দু'জনে ছুটে এলেন সেখানে।

আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে, আমার সামান্য পুলিস ফোর্স নিয়ে আমি দাঙ্গায় এঁটে উঠতে পারবো না বলেই এরূপ ক'রেছি। এতে ক্ষতি কিছু হয় নি,—একশো লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, আর সাতশো লোক প্রত্যেকে দু'সের ক'রে চাল নিয়ে স্বেচ্ছায় ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলেই তাদের ধরে আনা যাবে যে কোন দিন !"

ইনস্পেক্টার বাবু আমার উপর রাগে ফুলছিলেন। তিনি আমার সব কীর্ত্তি-কাহিনী বেশ ফয়লাস্ত ক'রে প্রকাশ করে দিলেন। আমিই যে উত্তেজনা দিয়ে এই লুটটা করিয়েছি সে কথা তিনি বিস্তর অতিরঞ্জন ক'রে বল্লেন।

বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ করে বল্লেন যে আমার বিরুদ্ধে শুধু ডিপার্টমেন্টাল নয়, ফৌজদারী প্রসিডিং৩ হবে।

আমি শান্তভাবে বল্লাম, "আমি তার জন্য প্রস্তুত।"

সুপারিন্টেণ্ডেন্টের রক্ত হ'য়ে গেল বিশেষ গরম, সে বললে "you're a rebel, a Gandhi ite swine !"

আমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেল, আমি বল্লাম, shut up you son of a bitch"

"সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তেড়ে এলো"—

সুবোধ হো হো ক'রে হেসে বল্লে, "ওই আধবুড়ো ভুঁড়িওয়ালাটা তেড়ে মারতে এলো কি না সুবোধ চাটুজ্জেকে, স্পর্দ্ধা ভেবে দেখ ভাই !"

"তার ঘুসি ঠেকিয়ে তাকে শক্ত গোটা তিনেক লাগাতেই বাছাধন রক্তাক্ত, হ'য়ে লুটিয়ে প'ড়লেন মাটিতে।"

"তারপর কিন্তু ফৌজদারী আর গড়াল না। ডিপাটমেণ্টাল এনকোয়ারীর ফল যা হবে তা জানি, কাজেই তার আগেই আমি রিজাইন করলাম। কিন্তু তাতে ওরা মানলে না। আমাকে সস্পেণ্ড ক'রে এনকোয়ারী চালালে। আমার কাছে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগলো, চার্জ্জ দিয়ে, explanation চেয়ে তাগিদ দিয়ে—আমি সেগুলো সব টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে

ফেল্লাম হাজিরও হ'লাম না। তারপর কর্ত্তারা আমাকে ডিসমিস করে শান্ত হলেন।"

সমস্ত কাহিনী শুনে বিস্ময়ে শুব্ধ হ'য়েছিল বিকাশ। তার চোখে, সুবোধ, হঠাৎ একটা মহীয়ান্ বীরশ্রেষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। সে চক্ষুময় হয়ে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। সে বললে অবশেষে, "এখন কি করছেন তা' হলে?"

"সেইখানেই কাজ করছি। আমার সেই কাণ্ডের কয়েকদিন পরই দেখলাম এখান থেকে 'সঙ্কট ত্রাণ' করবার কাজ নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি উৎসাহী যুবক গিয়ে সেখানে নামলেন। তাঁদের দলে ভিড়ে গেলাম। সেই থেকে তাদের সঙ্গে কাজ করছি।"

বিকাশ চোখ দু'টো আরও বড় করে চেয়ে রইল সুবোধের দিকে ; একবার শুধু জিজ্ঞেস করলে, "তারপর আপনার স্ত্রীর কি ব্যবস্থা করছেন?"

সুবোধ বললে, "সেটা এখনও ঠিক করিনি। সে এখন দাদার কাছে আছে। এখানকার কাজ তো শেষ হোক, তারপর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে।"

নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইল শুধু বিকাশ।

সুবোধ তারপর বললে, "এখন কাজের কথা বলি, যার জন্য তোমার কাছে এসেছি!..আমি এসেছি আমাদের কাজের জন্যে কিছু টাকা তুলতে। হাজার দশেক টাকা আমি নিয়ে যাব এই আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার তাতে সাহায্য করতে হবে তিন প্রকারে। চাঁদা দিতে হবে, চাঁদা তুলতে হবে, আর খেলতে হবে।"

বিস্মিত হয়ে বিকাশ বললে, "খেলতে হবে মানে?"

"আমি আই এফ-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে গোটা দুই এক্সিবিসন ম্যাচের বন্দোবস্ত করেছি। তাতে তোমার খেলতে হবে।"

বিকাশ বললে, "বেশ, খেলব, আর একটা চাঁদার বই আমার কাছে রেখে যান, যতদূর পারি টাকা তুলতে চেষ্টা করব।"

হেসে সুবোধ বললে, "আর নিজের চাঁদা?"

বিকাশ শুষ্কমুখে বললে শুধু, "দেব। এক সঙ্গেই সব দেব।"

সুবোধ চলে' গেল। অনেকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল বিকাশ।

একটা কথা তার মাথার ভেতর ঝন্ ঝন্ করে বাজতে লাগল —"সখের দরদী!"

হাঁ, এ কথা বিকাশকে সুবোধের বলবার অধিকার ছিল।

সুবোধের প্রাণে যখন দরদ জেগে উঠল, দরিদ্র বন্যাপীড়িতদের জন্যে, তখন সে তাঁর দরদকে শুধু বাক্যে বা তর্কে পর্য্যবসিত হতে দেয় নি। সে করছে কাজ। আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে সে সেই কাজে।

আর বিকাশ!—দশ হাজার টাকা মাত্র চাই আজ, তার জন্যে সুবোধ আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। সে দশ হাজার টাকা বিকাশ একাই দিতে পারত! পারেনি। দেবার প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেনি। কেন না, ওই দরিদ্র ক্ষুধিত, গৃহহারাদের জন্য তার সে দরদ নেই। সুবোধ তার স্ত্রীর কথাও ভাবেনি, তাকেও ভাসিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। বিকাশের স্ত্রী নেই, বাপ, মা বা নিকট আত্মীয় বলতে গেলে কেউ নেই, তবু সে পারে না সুবোধের মত সর্ব্বস্ব বিলিয়ে আর্ত্তের সেবা করতে। কেন না, তার মামীমা আছেন, তার পরিজন আছেন, তাদের অজস্র বাহুল্য সে কমাতেও পারে না।

নিজেকে তার একটা কেঁচোর মত মনে হল সুবোধের এই মহীয়ান্ আত্মত্যাগী আদর্শের পাশে। মনটা তার ভারী অবসন্ন হয়ে গেল।

মনে পড়ল তার সেদিনকার প্রতিজ্ঞার কথা। নিজের জন্য সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র রেখে তার যথাসর্ব্বস্ব দরিদ্রের সেবার জন্য বিলিয়ে দেবার যে সঙ্কল্প সে কারছিল, সে শুধু কল্পনাই রয়ে গেল। তারপর অনেক টাকা সে রোজগার করেছে। সবই সে খরচ করেছে, কিন্তু দরিদ্রের সেবায় নয়। সম্পন্নের বিলাস ও খেয়াল মেটাবার জন্যে।

এখনও সে ভেবে দেখলে—পারে না সে সুবোধের মত আত্মত্যাগী হয়ে তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে দরিদ্রের সেবা করতে। মেসোম'শায়ের স্মৃতি, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর

বিষাদভরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখখানি তার পথ আগলে বসে আছে। মাসীমার প্রতি অত্যুগ্র কর্ত্তব্যবোধ তাকে বেঁধে ফেলেছে। তাঁকে সে যে আশ্বাস দিয়ে তার ঘাড়ে নিয়ে এসেছে, সে আশ্বাস, সে প্রতিশ্রুতি সে ভাঙ্গতে পারে না। একি শুধু কর্ত্তব্যবোধ না কাপুরুষতা? এই কি তার কর্ত্তব্য? তার মনে পড়ল হিতোপদেশের কথা

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরোগস্য কিমৌষধৈঃ॥"

কর্ত্তব্য তার কোন্‌খানে? কোন প্রতিশ্রুতি তার বড়, সে কথা নির্ণয় করতে তার কষ্ট হল না। কিন্তু সেই কর্ত্তব্য করবার শক্তি বা সাহস তার নেই।

সুবোধ ঠিক বলেছিল। সে সখের দরদী, সে হাম্বাগ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠল। আপিসে গিয়ে সে তার কাজ ক'রে গেল অন্যমনস্ক ভাবে। বিকেলের দিকে যতীন বাবু এলেন তার কাছে। অন্য কথার মাঝখানে হটাৎ থেমে সে যতীনবাবুকে বল্লে "দু' হাজার টাকা ধার দিতে পারেন আমাকে?"

যতীনবাবু বললেন, "পারব না কেন? কিন্তু হঠাৎ আজই আপনার টাকার দরকার হল কিসে? কি মতলব করেছেন শুনি? আর যাই করুন, এখন ফাটকার বাজারে যাবেন না, অতি লোভে শেষে তাঁতী নষ্ট হবে।"

হেসে বিকাশ বললে. "না, ফাটকা খেলব না। অন্য কাজ আছে।"

যতীন বাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপিস ফেরবার পথেই সুবোধকে তা পৌঁছে দিয়ে তার মন একটু সুস্থির হল।

তারপর সুবোধের হয়ে তিন দিন উপরো উপরি তিনটে ম্যাচ খেলে আর হাজার তিনেক টাকা চাঁদা আদায় করে দিয়ে সে তার অনুতপ্ত চিত্তকে কতকটা সুস্থ করলে।

বিকাশের কাছে টাকাগুলো পেয়ে সুবোধ উল্লসিত হয়ে বললে, "বাঃ grand। বাহাদুর তুমি। তুমি একাই পাঁচ হাজার টাকা দিলে আমায়।

এ না হলে দশহাজার টাকা তুলতে আমার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেত। তুমি wonderful!"

বিকাশ আন্তরিক লজ্জার সহিত বললে, "ওকথা আপনি আমায় বলে লজ্জা দেবেন না সুবোধ দা। এমনিই লজ্জায় মরে যাচ্ছি। এর চেয়ে ঢের বেশী করা আমার উচিত ছিল।"

সুবোধ বললে, "তুমি জান না কতবড় বাহাদুর। আমি সেটা জানতে পেরেছি সম্প্রতি অনেক মোটা মোটা পেটওয়ালা পুরাণো বন্ধুদের কাছে ঘোরা-ফেরা করেছি। তাদের এক একজনের কাছে দু'শো টাকার চেক বের করতে আমার মুখে রক্ত উঠে গেছে! আর তুমি একেবারে দিলে দু' হাজার টাকা। কিই বা রোজগার তোমার।"

সুবোধের প্রশংসা ও সমাদরে তার মনের গ্লানি অনেকটা মিটে গেল। অনেকটা আত্মপ্রসাদও সে লাভ করল। শেষে সুবোধ বললে, "মনে রেখো ভাই। এই টাকা পেয়ে আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ—grateful—

হাত জোড় করে বিকাশ বললে, "ও কথা বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।"

"না না লজ্জা দেবার জন্য ও কথা বলছি না। কৃতজ্ঞতা—gratitude কথাটার definition জান? Gratitude is a lively sense of benefits to come. কাজেই বুঝতে পারছ আমার কৃতজ্ঞতার মানে। ভবিষ্যতের অনেক আশা রাখি, এর পরে যখন দরকার হবে হাত পাতব তোমারই কাছে।" বলে সে হেসে উঠল।

বিকাশও হেসে বললে "আমি সেটা আমার অধিকার বলেই দাবী করব।"

এর পর সে যখন বাড়ী ফিরল তখন তার মনটা খুব হাল্কা—উল্লসিত।

পথে চলতে চলতে সে তখন কল্পনা করতে লাগলো অনেক কিছু! আরও কত টাকা দেবে সুবোধকে—কত সে চিরদিন ব্যয় করবে দরিদ্রের সেবায়, তার কল্পনায় বিভোর হ'য়ে বিকাশ বাড়ী ফিরলো।

## এগার

পরের দিন সকালবেলায় উঠে বিকাশ মাসিমার কাছে গিয়ে মাথা চুলকে ব'ললে, "মাসিমা, ব'লছিলাম কি?"—কিন্তু বলা আর হ'ল না, সে শুধু মাথা চুলকাতেই লাগলো।

মাসিমা একটু হেসে ব'ললেন "কী ব'লছিলি বল না—চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

আরও খানিকক্ষণ মাথা চুলকে দু'টো ঢোক গিলে সে বললে, "ব'লছিলাম কী—এই—মানে বিয়েটা যখন ক'রতেই হবে, তখন দেরী ক'রে আর কি হবে? পরশু দিন তো একটা লগ্ন আছে, সেই দিনেই।"—

"তবে রে গোলামের পো, কাল রাত্তিরে হ'ল বিয়েটা অসম্ভব, আর এখন তর সইছে না। 'ক'রতেই হবে'—বেটা যেন ওষুধ গিলছেন! থাক না ওষুধ —নাই খেলি! আর কিছুদিন ভেবেই দেখ না।" মাসিমা একগাল হেসে বললেন।

হেসেই বিকাশ বললে, "তা নয় মাসিমা, ভাবছিলাম কি? বিয়ের ক'নের সঙ্গে এমনি এক সঙ্গে থাকলে,—নিন্দে হ'তে পারে, তাই গোলটা চুকিয়ে ফেল্লে—"

"থাম, থাম, আর নেকামী ক'রতে হবে না। বিয়ে অমনি পাকা ফলটি কি না? পাড়া যখন হ'য়ে গেছে গালে করলেই হ'লো। দু'দিনে বিয়ের জোগাড় হয় কখন? ওসব হবে না। তুই পালা এখন—টাকার জোগাড় করগে, আমি আর সব করবো।"

বিকাশ বললে, "টাকাটা আর বেশী কী লাগবে। একজন পুরুত ডেকে—"

"পাগল ছেলে! বিয়ের যজ্ঞি—সে কি অমনি হয়? আত্মীয়-কুটুমদের আনতে হবে, তাদের ব্যবহার দিতে হবে, নেমন্তন্ন করতে হবে, কেউ যেন বাদ না পড়ে, খাওয়া দাওয়ার উজ্জুগ"—

বিকাশ অবার মাথা চুলকাতে লাগলে, এবার অন্তভাবে। মাসিমার কথার বহর দেখে সে অন্দাজ করলে যে, তিনি খরচের আঁচ করছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের আদর্শে। ছাঁকা বারো হাজার খরচ করেছিলেন মেসোম'শায় সে বিয়েতে! অনেক ছাটকাট দিয়েও মাসিমার মনের মত উৎসব ক'রতে কমসে-কম সাত হাজার টাকা না হ'য়ে যায় না।

কোথায় পাবে সে সাত হাজার টাকা? এ যে বেয়াড়া আবদার মাসিমার! রাগই হল তার। কিন্তু সে মুখ ফুটে মাসিমাকে ব'লবে যে—সে হবে না, এত বড় বুকের পাটা তার নেই "

উভয় সঙ্কট!—কিন্তু উপায় নেই। তার সাহসের অভাবটাকে সে ঢাকলে একটা কর্ত্তব্যের ওজুহাত দিয়ে। দুঃখিনী মাসিমাকে মেসোম'শায়ের মৃত্যুর পরই —এই মনোভঙ্গের আঘাত দেওয়া তার অকর্ত্তব্য হবে। সে নীরবে সরে গেল।

সামনে পড়ল গীতা। সে বোধ হয় আড়ি পেতে কথা শুনছিল, কিন্তু এমন ভাবে পিছন ফিরে চললে সে, যেন ভিজে বেড়ালটি, কিছু জানে না।

তার নিটোল গোল নরম হাতখানা এমন লোভনীয় ভাবে পাশে ঝুলছিল যে, বিকাশ কিছুতেই আপনাকে সামলাতে পারলে না। সে পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে মারলে একটা চিমটি।

"উঃ! মেরে ফেললে গো!" ব'লে সেস্থানে হাত বুলোতে বুলোতে গীতা ফিরে দাঁড়াল। সহাস্য গর্জ্জন ক'রে সে চোখ পাকিয়ে বললে, "বুড়ো ধিঙ্গী হ'লে, এখনও শয়তানী গেল না। ছিঃ! লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ। এখন —এখন কি আর অমনি করতে আছে? লোকে বলবে কি?"

হেসে বিকাশ বললে, "কী আর ব'লবে? বলবে এরা দুটো বয়ে গেছে। তাতে ব'য়ে গেল আমাদের। 'তুম্ হম্ তো মজা লিয়া'!"

"তবে রে! মজাটা দেখাচ্ছি!" বলে হঠাৎ গীতা বিকাশকে একটা কীল মারলে। বিকাশ ফস করে ঘুরে পেশী ফুলিয়ে এমন ক'রে দাঁড়ালো যে কীলটা প'ড়লো গিয়ে তার বাহুমূলের কঠিন পেশীপিণ্ডে।

বজ্রের মত কঠিন পেশীতে আঘাত ক'রে তার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে গীতাই বলে উঠল, "উঃ হাত টা গেল আমার! দেহ তো নয় যেন পাথর। গুণ্ডা একটা!"

বিকাশ ব'ল্লে, "যাক শোধবোধ। এখন কথার জবাব দে আমার"—

জিভ কেটে গীতা ব'ল্লে "ও কি? ছিঃ! বউয়ের সঙ্গে বুঝি ভদ্রলোক তুই-তোকারী করে!"

কপট অনুতাপের সুরে বিকাশ ব'ল্লে, "ক্ষমা কর দেবি, ভুল হ'য়ে গেছে। এখন, হে দেবি. আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৃতার্থ ক'রবে কি?"

গর্বিতভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকিয়ে চোক টেনে গীতা ব'ল্লে, "কি প্রশ্ন প্রভু!"

"ও ঠিক হ'ল না। প্রভুটা modern নয়। ব'লতে, হবে, প্রিয়তম—"

"যাও, কি যে বল?" বলে লজ্জায় লাল হ'য়ে গীতা তার পিঠে একটা চড় লাগালে।

"যাক, এখন প্রশ্নটা হ'চ্ছে এই। এখন আমার হবু বউটিকে তোর পছন্দ হ'য়েছে কি?"

গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে গীতা ব'ল্লে, "মোটেই না।"

কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বিকাশ ব'ল্লে, "তবেই তো মুস্কিল, তোর পছন্দ না হ'লে আমি বিয়ে করি কি ক'রে? তবে এ বিয়েটা ভেঙ্গেই দি—কি বলিস্?"

গীতা খুব গম্ভীরভাবে মাথানেড়ে ব'ল্লে "আমার সন্দেহ হয় তা পারবে না —কমলি নেই ছোড়েগা।"

"না ছাড়াই সম্ভব, কেন না তা'হলে, হয় গয়নাগুলো বেহাত হ'য়ে যাবে, না হয় কথার খেলাপ হবে। —তবে কী আর করা যাবে, ক'রবোই বিয়ে।" ব'লে একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলেলে বিকাশ।

গীতাও সমান ওজনে একটা দির্ঘশ্বাস ফেলে ব'ল্লে, "আমারও সেই কথা। উপায় নেই, ক'রতেই হবে বিয়ে।" ফস্ ক'রে গীতার হাত ধ'রে বিকাশ তখন ব'ল্লে, "তবে এসো প্রিয়তমে, আমরা দু'জনে হাতে হাত ধ'রে এই বিবাহ-অনলে

আত্মবিসর্জ্জন করি।" বলেই সট ক'রে সে গীতাকে একেবারে বুকের ভিতর সাপটে ধ'রলে।

"ছিঃ! কি যে কর? ছিঃ! ছেড়ে দাও, কে দেখে ফেলবে।" ব'লে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বল্‌লে, "একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া—আর একটা দানব! হাত তো নয় যেন লোহার বেড়ী। আমার হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে গেছে।" ব'লে সে এমন একটা পুলকোজ্জল দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে চাইলে যে বিকাশের মনে হ'ল যে এই দানবীয় অত্যাচারটার পুনরাবৃত্তিটা একেবারেই অপ্রীতিকর হবে না।

কিন্তু ঝি তখন ঝাঁটা হাতে এসে প'ড়েছে।

গীতা অত্যন্ত শান্ত সম্ভ্রান্তভাবে ব'ললে "কিন্তু শোন বিকাশদা, জেঠাইমার কথায় ভুলে তুমি একগঙ্গা টাকা খরচ ক'রো না। কি দরকার মিছে কতকগুলো টাকা ঢেলে? বিশেষ যেখানে টাকা নেই তোমার। জোগাতে হবে হয় ধার করে না হয় চুরী ক'রে।"

"কিন্তু মনের মতন খরচ ক'রে একটা যজ্ঞি ক'রতে না পারলে যে উনি বড় কষ্ট পাবেন গীতা। ওঁর খুব বেশী করেই মনে হবে যে মেসোমশায় নেই, এখন আমার কাছে হাত পাততে হ'চ্ছে তাঁর, তাই হ'ল না।"

"কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি ডুববে নাকি? ওঁর খরচের খেয়াল মেটাতে মেসোমশায়ই ডুবতে ব'সেছিলেন। তিনি তো তবু সে সব ক'রেছেন তাঁর শেষ বয়সে যখন রোজগার তাঁর শেষ সীমায় পৌছেছে। তুমি সবে রোজগার আরম্ভ ক'রেছ—এখনি যদি সেই খরচের ভার নির্ব্বিবাদে গলায় বেঁধে নাও তবে নির্ঘাত ডুবতে হবে তোমার সপরিবারে। একেই তো রাবণের সংসার তোমার ঘাড়ে প'ড়েছে।"

বিকাশের মনে হ'ল এসব ছাঁকা সত্যি কথা, কিন্তু শুনে তার বুক কেঁপে উঠলো। সে বল্‌লে, "চুপ, গীতা চুপ, ও কথাও নয়! আমি কী গীতা? মেসোমশায় মাসিমা আমাকে গড়ে পিটে মানুষ ক'রেছেন তাই না আমি দাঁড়িয়ে

আছি। আমার কি তোমার মনে বা মুখে যদি একবারও একথা আসে যে মাসিমার সংসার আমাদের একটা বোঝা, তবে আমাদের পাপের যে শেষ থাকবে না গীতা।"

বক্তৃতা ক'রে তার মনে হ'ল বেশ বলা হ'য়েছে। বেশ গর্ব্ব হ'ল তার। সে অনেক চটপট্ ভোগা দিলে যে এইটাই তার মনের আসল কথা! সে ত্যাগী সেবক। অপ্রস্তুত হয়ে গীতা চুপ ক'রে গেল। তার ছায়াচ্ছন্ন মুখ দেখে বিকাশের মনে হ'ল যে এই সাদা কথাটা গীতাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটাও একটু তিরস্কারের মতই হ'য়েছে। তখন সে তাকে আদর ক'রে বল্‌লে, তুমি রাগ ক'রো না লক্ষীটি। কিন্তু ভয় নেই তোমার। সাধ্যের অতীত খরচ আমি ক'রবো না। মাসিমাকে ব'লে ক'য়ে খরচ আমি যথাসাধ্য কমাবো। কেমন? খুসী হলে তো?"

সংক্ষেপে গীতা ব'ল্‌লে. "আচ্ছা।" কিন্তু তার ভ্রূ কুঞ্চিত হ'য়েই রইলো!

তখন বিকাশ বল্‌লে, "অমন ক'রে মুখভার ক'রে থেকো না লক্ষী!—হাস তুমি, নইলে বড় দুঃখ পাব আমি।"

নিরুপায় হ'য়ে হাসতে হ'ল গীতার। কিন্তু একটু পরেই সে বল্‌লে, "একটা কাজ ক'রলে হয় না?"

"কি?"

"জেঠাইমার যজ্ঞি হ'তে তো সেই এক মাস বাদে হবে। এর ভেতর চল না চুপি চুপি আমরা রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়ে—"

হেসে বিকাশ ব'ল্‌লে, "তাই বল, ভয়টা খরচার নয়—দেরী হবে তাই—কি জানি, যদি ফস্কে যায়! কেমন? সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু, তাতেও অমনি চট ক'রে হবে না। নোটিশ দিতে হবে, তাতেও দেরী হবে।"

"তবে আর কি করা যাবে?"

"দেখি, যাই টাকার চেষ্টায়।"

বিকাশ চলে গেলন।

# বার

মাসিমা সেইদিনই অনন্তকে আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন। শুনে বিকাশ মাথায় হাত দিলে। মাসিমার খরচ তবু সামলান যাবে কিন্তু অনন্তর খরচ যে মহাসমুদ্র! একা রামে রক্ষা নেই—ইত্যাদি—

বিকাশ খুব সাহস ক'রে একবার শুধু বল্লে, "বড়দাকে আনবার মানে এমন কি দরকার? তা' ছাড়া তিনি যা কাণ্ড ক'রেছেন বাড়ীটা নিয়ে—"

মাসিমা বল্লেন, "ছোট লোক সে তাই ছোটলোকী করেছে। তার সে কাজের জবাবদিহি ক'রবে সে তার ধর্ম্মের কাছে। সেই কথা মনে ক'রে আজ যদি তার বোনের বিয়েতে আমি তাকে না ডাকি তবে সে যে আমার অধর্ম্ম হবে। তা ছাড়া তার বোনের বিয়ে—সে নইলে সম্প্রদান ক'রবে কে? আর, এত বড় একটা যজ্ঞি সে কি তুই সামলাতে পারবি? সে জানে শোনে, পাঁচটা ক'রেছে, সে না হলে চলবে না।

নিরুপায় হ'য়ে বিকাশ হাত পা ছেড়ে দিলে।

এলো অনন্ত!

অবিলম্বে সে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বেশ সহজভাবে দখল ক'রে নিলে।

প্রথমেই সে বল্লে, "তা' হ'লে আমার তো একটা আলাদা বাড়ী নিতে হয়। বিয়ের আগে বর ক'নে এক বাড়ীতে থাকা তো ভাল দেখায় না।"

কথাটা শুনে বিকাশের হাড় জ্বলে গেল। উনি বাড়ী নেবেন! টাকাটা গুণতে তো সেই বিকাশ! অথচ এত বড় মান তাঁর যে তাঁর বোন বিয়ের আগে বরের বাড়ী থাকলে তাঁর মানের হানি হবে।

মাসিমা কিন্তু ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "তা' তো নেবেই। দেখ একখানা বাড়ী! বেশ বড় সড় দেখেই নিও বাড়ী—বিয়ে তো সেখানেই দিতে হবে।"

বিকাশ তাড়াতাড়ি বললে, "আমি বাড়ী ঠিক ক'রে দেবো'খন।"

অনন্ত বললে, "না হে ভায়া না। নিজের বিয়ের কাজ নিজে ক'রবে কি? তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।"

বাড়ী নেওয়া হ'ল একখানা—পাঁচশো টাকা ভাড়ায়। বিরাট প্রাসাদ।

বিকাশের টাকা, দরাজ হাতে খরচ ক'রতে অনন্তের কোনও সঙ্কোচ নেই। কেন থাকবে? অনন্ত চিরদিনই পোদ্দারী ক'রে এসেছে—আর চিরদিনই পরের ধনে। বিশ্বাত্মতার অর্দ্ধেকটা তার বেশ আয়ত্ত করা আছে। পরের ধনে আপনার ধনে তার ভেদজ্ঞান নেই, সবার ধনই সে আপনার ব'লে মনে করে এবং সুযোগ পেলেই আপনার ব'লে ব্যবহার করে।

সেইদিনই গীতা ও বসন্তকে নিয়ে, অনন্ত সপরিবারে সেই প্রাসাদে গিয়ে আড্ডা নিলে আর এমন ষ্টাইলে বাস ক'রতে লাগলো যাতে সে প্রাসাদের কোনও অমর্য্যাদা না হয়।

বিয়ে হ'তে একমাস দেরী। তার আগে গোটা আষ্টেক তারিখ ছিল, অনন্ত সব নাকচ ক'রে দিলে, বললে এক মাসের আগে জোগাড় হ'য়ে উঠবে না।

বিকাশ গীতা দুইজনেরই মুখ অন্ধকার হ'য়ে উঠলো।

নিমন্ত্রণ হ'ল—নারদের নিমন্ত্রণ!

শুধু তাই নয়—লোক পাঠিয়ে খরচ ক'রে দূর দূরান্ত থেকে নানাবিধ উচ্চ ডাইলিউশনের মাসি, পিশি, দিদিমা, ঠাকুরমা, ভাই, বোন, খুড়ো, জেঠা, মেসো, পিশে প্রভৃতি আমদানী ক'রে দুই বাড়ী ভরে ফেলা হ'ল।

বিকাশের চক্ষু ক্রমশঃই উর্দ্ধগামী হ'য়ে উঠলো—আকাশ স্পর্শ ক'রবে ব'লে আশঙ্কা হ'তে লাগলো।

এক একটা আয়োজন দেখে আর তার বুক কেঁপে ওঠে। কোথায় পাবে সে এত টাকা?

ফাটকার বাজারে একবার সে ঢোকা দিয়ে এসেছে। বাজার একেবারে

ঠাণ্ডা—উঠতি পড়তি নেই একেবারে, হবেও না শীগ্‌গির। কাজেই সেখানে হঠাৎ কোনও টাকা করবার সম্ভাবনা নেই।

মাসিমার কাছে সে আর কল্কে পায় না। তাঁর ব্যয় বিভাগের মহামন্ত্রী অনন্ত আসবার পর তিনি খরচ পত্র সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই করেন না বিকাশের সঙ্গে—মাঝে মাঝে কেবল বলেন—টাকার জোগাড় কর।

মরিয়া হ'য়ে বিকাশ স্থির ক'র্‌ল, ব'লবেই সে মাসিমাকে যে টাকা সে দিতে পারবে না এত। বুক ফুলিয়ে সদর্পে সে এগিয়ে গেল। কিন্তু মাসিমার সামনে এসে সে সুধু দাঁড়িয়ে রইল; কথা ফুটলো না তার।

মাসিমা মহা আনন্দে ছুটোছুটী ক'রে বেড়াচ্ছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাপারের আয়োজনে তার মুখখানি খুসী ক'রে ব'সে আছেন। কোন্ প্রাণে বিকাশ তাঁকে ব'লবে এসব কিছু হ'তে পারবে না, টাকা নেই তার!

নীরবে সে ফিরে গেল।

একদিন অনন্ত তাকে বললে, "এই বার মোটা মোটা খরচ আসছে, পাঁচ হাজার টাকা হাতে কর।"

বিকাশ বললে, "কোথায় পাব টাকা বড়দা? কোথাও টাকা পাচ্ছিনে—এসব খরচ"—

তার কথা সম্পূর্ণ করবার অবসর দিলে না অনন্ত। সে ফস্ ক'রে ব'লে ফস্‌'লো আচ্ছা, কোনও চিন্তা নেই, আমি টাকার জোগাড় করচি। বেচেই দি'গে রাঁচীর বাড়ীখানা।

বিকাশ একেবারে বিমূঢ় হ'য়ে গেল। সে যখন রাঁচীর বাড়ী বেচবার কি ভাড়া দেবার প্রস্তাব ক'রেছিল তখন অনন্ত কী প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। আর আজ সে এক কথায় বাড়ীটা বিক্রী ক'রতে চায় বিকাশের ও গীতার বিয়ের জন্য! গীতা অবশ্য তার বোন, কিন্তু গীতার যোল বছরের জীবনে কোনও দিন তার সম্বন্ধে অনন্তের এতখানি দুর্ব্বলতার নিঃশ্বাস মাত্রও বিকাশ কোনও দিন দেখেনি—দেখেছে নির্দ্দয় তিরস্কার ও প্রহারের প্রাচুর্য্য!

বিস্ময়ের অবধি রইলো না তার।

সে বললে, "রাঁচীর বাড়ী বেচবেন ?"

অনন্ত বললে, "আর উপায় কি ?—তা ছাড়া একটা সুবিধাও হ'য়েছে বড্ড। জান তো ও বাড়ীর টাইট্‌ল নিয়ে যা গোলমাল, কেউ নিতেই চায় না। এক বেটা জমীদার ভারী ঝুলোঝুলি ক'রছে তাই। বলে জ্যাঠাইমার কাছে কবালা পেলেই সে নেবে—আর আমাকে বাড়ীর একটা অংশ ছেড়ে দেবে, আমার একটা নাদাবী লিখে দিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা সে দেবে। এমন সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না।—যাক গে, তাই করবো—টাকার জন্যে তুমি ভেবো না।

অনন্ত উঠ্‌তেই বিকাশ বাধা দিলে।

গোড়া থেকেই কথাটা তার অদ্ভুত ঠেকছিল। এখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে এটা কেবল অনন্তের নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির একটা চাল। মাসিমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে সে নিজস্ব ক'রে নেবে বাড়ীর খানিকটা, আর, কোন না আর হাজার দুই চার টাকা মারবে।

সে ব'ল্লে, "না, বড়দা', থাক, ও বাড়ী বেচে কাজ নেই। আমি যেমন ক'রে পারি টাকার জোগাড় ক'রবো।"

কথাটা হ'চ্ছিল বিয়ের বাড়া, অর্থাৎ অনন্তের বাড়ীতে। এখানে বিকাশ বড় একটা আসে না, আজ এসেছে অনন্তের নিমন্ত্রণে—টাকার জন্য।

তার কথা শুনে অনন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেল। তখন গীতা এদিক ওদিক চেয়ে বিকাশের কাছে এসে ব'ল্লে, "বলি কি সব কাণ্ড হ'চ্ছে বিকাশ দা, খবর রাখ ?"

বিকাশ শুষ্ক মুখে ব'ল্লে ; "খবর রাখবার দরকার করে না, অনুভবেই বুঝতে পারছি—হ'চ্ছে রাজসূয় যজ্ঞ। এবং তার বলি তুমি। কিন্তু শুধু তাই নয়। খরচ যা হ'চ্ছে—তার চেয়ে বেশী গিয়ে উঠছে দাদার সিন্দুকে"—

নিভৃতেও এ কথা গীতার মুখে শুনে তার বুক কেঁপে উঠলো। অনন্ত

শুনলে নাকি? সে ব'ল্লে, "থাক গীতা, এ কথা নিয়ে আলোচনা ক'রে কাজ নেই।" "না থাকলো আমার কাজ, কিন্তু তোমার চেহারাখানা যে এই ক'দিনে আমনি হ'য়ে গেছে"—

একটু হেসে বিকাশ ব'ল্লে, "বিরহে এমনি হয়, কবিরা বলেন।"

"তামাসা রাখ। তুমি টাকার জন্যে ভেবে ভেবে শুকিয়ে ম'রছো, সে কথা আর কেউ না বোঝে, আমি বুঝি। আমি তোমাকে এমনি ক'রে বধ হ'তে দেবো না। অমন ভালো মানুষটি হ'লে চ'লবে না। সাহস ক'রে ব'লতে হবে তোমায়, আমি দিতে পারবো না। এত ভয় কিসের তোমার?"

সাহসের অভাব তা'র? গীতার মুখে এই সম্পূর্ণ সত্য অভিযোগেও সে কেঁপে উঠলো। "দাদা কি বলছিলেন জান?—রাঁচীর বাড়ী বেচবেন, তা হ'লে!"

"সে তিনি বেচবেনই। সে সব যুক্তি আমি জানি—বউদিকে দাদা ব'লছিলেন, আড়াল থেকে শুনেছি সব। কথাটা বিয়ের কথার আগেই ঠিক হ'য়ে গেছে।"

একটা বোকা জমিদারকে বাগিয়ে উনি দশ হাজার টাকায় অর্দ্ধেকটা বাড়ী তারই ঘাড়ে গছাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন, এই ফাঁকে গুপ্ত গুপ্ত কাজটা সেরে ফেলে জ্যাঠাইমাকে দেখাবেন পাঁচ হাজার টাকা, তারপর বিয়েতে হাজার দুই টাকা খরচ ক'রে বাকী টাকা নিয়ে লটকাবেন।"

"কিন্তু আমি তা' বারণ ক'রেছি"—

"ব'য়ে গেছে। তুমি মানা ক'রবে তাই জ্যাঠাইমাকে দিয়ে বাড়ী বেচাতে পারবেন না দাদা! তুমি ভেবেছ কি?"

"আমি যেমন ক'রেই হোক টাকাটা তুলে দেবো!"

"তাতে লাভ হবে এই যে আর পাঁচ হাজার টাকা বেশী খরচ দেখাতে হবে। মোটের উপর এই লাভের কাজটা দাদা ছাড়বেন না কিছুতেই।"

"বটে, আচ্ছা দেখি উপায় হয় কি না।"

"আমি বলি, কোনও চেষ্টা ক'রো না। ধনঞ্জয় হয় বর্ব্বরেরই হোক—তুমি সে বর্ব্বর নাই হ'লে! উপায়ের চেষ্টায় বিকাশ সটান গেল উকীলের বাড়ী। সেখান থেকে পরামর্শ সেরে সে গেল আফিসে। কাজে তার মন বস্‌লো না, টাকার চিন্তায়।

ভাবলে সে, এ কী নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে সে আপনাকে? গীতার কথা যে ঠিক তা' সে জানে। সে দুঃখ পাচ্ছে কেবল জোর ক'রে না বলবার তার সাহস নেই ব'লে। কিন্তু কি ক'রবে সে?

তবু এ আর চলবে না। বার বার এই শেষ বার। বিয়েটা চুকে গেলে আর সে ভাল মানুষটী থাকবে না, নাগপাশ থেকে মুক্তি নেবে সে।

কিন্তু এখন উপায়? কোনও উপায়ই সে খুঁজে পেলে না। ধার ক'রতে পারে সে, জমীটা বাঁধা দিয়ে—কিন্তু বিয়ের জন্য ধার ক'রে ডুববে? সে যে আশা ক'রে আছে ঐ জমী বাঁধা রেখে আস্তে আস্তে ওর উপর বাড়ী করবে একখানা।

যতীনবাবু এসে ব'ললে, "বিকাশবাবু, জমীটা বেচবেন আপনি?"

বিকাশ চমকে উঠলো. এ লোকটা কি শয়তান? তার মনের দ্বন্দ্বটা টের পেলো কেমন ক'রে? আমতা আমতা ক'রে সে বল্‌লে, "না—কেন বলুন তো?"

"ভারী একটা ভাল অফার আছে। ছাঁকা বিশ হাজার টাকা cash down। আমি বলি, বেচে ফেলুন। আর ঐ টাকা দিয়ে ৯ নং স্কীমের একটা গোটা বাড়ী কিনে ফেলুন। সে চমৎকার জায়গা হবে, আর সেখানকার কতগুলি ভাল বাড়ী না ভেঙেই বিক্রী ক'রছে। তাই করুন।"

নেচে উঠলো বিকাশের প্রাণ। এতদিন ভাগ্যদেবীর যে অপর্য্যাপ্ত প্রসাদ সে পেয়ে এসেছে তার ধারা আজও অব্যাহত আছে, আর আজ তার প্রয়োজনের দিনে সে প্রসাদ উথলে পড়েছে দেখে সে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

যতীনবাবুর সাহায্যে সেই দিনের ভিতর বাড়ী বিক্রী হ'য়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একখানা মাঝারী গোছ বাড়ী কেনবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। সব দিয়ে থুয়ে সে ছয় হাজার টাকার নোট পকেটে পুরে সে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরলো।

সবচেয়ে এই কথায় সে আরাম শেষ করলে যে, তার কোনও সাহসের কাজ করতে হ'ল না আপনা আপনি সব বিপদ কেটে গেল। একটু বুকে জোরও হ'ল—ভাবলে মাসিমাকে এবার দু'টো কথা ব'লবে।

মাসিমাকে সে বললে, "টাকার জোগাড় করেছি মাসিমা, কিন্তু তার তিনটে সর্ত্ত আছে।"

টাকা হ'য়েছে শুনে খুসী হয়েও মাসিমা এই সর্ত্তের কথায় বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন। মেসোমশায়ের কাছে তার কোনওদিন কোনও সর্ত্তের কথা শোনা অভ্যাস হয় নি। একটু ভার মুখে সে বললে, "কি সর্ত্ত?"

"প্রথম সর্ত্ত এই যে পাঁচ হাজার টাকার ভিতর সব খরচ সারতে হবে। কেন না, আর টাকা পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে রাঁচীর বাড়ী বিক্রী বা তার সম্বন্ধে কোনও বন্দোবস্ত আপনি ক'রতে পারবেন না। তৃতীয় সর্ত্ত এই যে আর একহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনবেন, আর এর পর যখন যা পাবো তার যা বাঁচে সব দিয়ে আপনার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনবেন।"

মাসিমা একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে, "এমন কড়া শাসন তো তোর মেসো কোনওদিন করেন নি।"

"তিনি করতে পারেন নি কেন না তিনিই আপনাকে বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু আমি যে আপনার ছেলে, আমার বেলায় যে ভালবাসাটা আপনার বেশী, তাই আমার এ আবদার আপনার না রেখে উপায় নেই।"

ব'লে বিকাশ ছ' হাজার টাকার নোট মাসিমার পায়ের কাছে রেখে দিলে। প্রসন্ন হাস্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখ। টাকাগুলো হাতে ক'রে

নিয়ে বল্‌লে, এখন এগুলো রাখি কোথায়! গীতাটা না থেকে বড় মুস্কিল হয়েছে। অনন্ত—"

"আমি রেখে দেবো মাসিমা? আমার কাছে থাক, যখন যা দরকার হবে আমিই দেবো।"

"আচ্ছা তাই রাখ্‌, দেখিস্ হারিয়ে বা খরচ ক'রে ফেলিসনে যেন। যে মনভোলা তুই!" ব'লে টাকাগুলো বিকাশের হাতে দিয়ে ব'ল্‌লেন, "কোথ্‌ থেকে জোগাড় করলি টাকা?"

"টাকা কি আর আমি জোগাড় ক'রেছি মাসিমা? অন্নপূর্ণা মার টাকার দরকার হ'য়েছে কুবের পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাঁড়ার থেকে।"

হেসে মাসিমা ব'ল্‌লেন, "ভারী জ্যাঠা হ'য়েছিস। বল্ না কোথায় পেলি?"

সব কথা খুলে ব'লে বিকাশ ব'ল্‌লে, "আপনি চেয়েছিলেন খুব জাঁক করে আমার বিয়ে দিয়ে আমার ঘর গোছাতে, দালালের মারফত কুবের পাঠিয়ে দিলেন টাকা, তাতে বাড়ীকে বাড়ী রইলো, বিয়ের খরচও জুটে গেল।—মাসিমা, সে বাড়ী দেখলে খুসী হ'য়ে যাবেন। একমাসের মধ্যেই বাড়ী মেরামত হ'য়ে যাবে তারপর ভাড়াটে ঘর ছেড়ে আপনাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবো।"

"কিন্তু একটা কথা বাবা, রাঁচীর বাড়ীর কথা—"

"কেন কি ক'রেছেন আপনি? বেচা হ'য়ে গেছে?" চমকে উঠে ব'ল্‌লে বিকাশ।

"অনন্ত একখানা চিঠি আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে যে আমি ঐ বাড়ী বেচতে সম্মত আছি।"

বিকাশ লাফিয়ে উঠে ব'ল্‌লে "সে চিঠি কোথায়?"

"ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে—"

বিদ্যুদ্বেগে বিকাশ ছুটে বেরিয়ে গেল উকীলের কাছে। তার পরামর্শ নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ রাঁচীতে চারখানা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম ক'রলে, মাসিমার নামে আর তার ভাগ্নে অমলের পক্ষে কমলার নামে। টেলিগ্রাম ছুটো গেল যে বাড়ী

কিনতে চেয়েছিল তার নামে, আর দুখানা গেল রাঁচীর একজন বড় উকীলের নামে।

অনন্ত চিঠি ডাকে পাঠায়নি, নিজেই সে চিঠি নিয়ে রাঁচী গিয়েছিল, চটপট্ কার্য্য শেষ ক'রে আসবার জন্য। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেলে বিকাশের পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে খরিদ্দার পেছ পা'। আর যে উকীলকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছিল, তিনি তাকে ডেকে শাসিয়ে দিলেন যে বাড়ী বেচবার কোন চেষ্টা করলে অনন্তকে আদালতে লাঞ্ছনা পেতে হবে।

রাগে ফোঁস ফোঁস ক'রতে ক'রতে অনন্ত ফিরে এলো ক'লকাতায়। মাসিমার কাছে এসে লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে তাঁকে গালাগালি ক'রতে লাগলো—ব'ল্লে, "আমি এবিয়ের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আমি চল্লাম, কেমন ক'রে বিবাহ হয় দেখি।"

রাঁচীর বাড়ী বিক্রি বন্ধ হ'য়ে গেছে, সেখানকার উকীলের চিঠিতে এই খবর পেয়ে মহা উল্লাসে বিকাশ আসছিল মাসিমার কাছে। তাঁর সামনে অনন্তকে দেখে তার বুক কেঁপে উঠলো।

উকীলের পরামর্শ—সুধু পরামর্শ নয় তার তীব্র উত্তেজনার ফলে বিকাশ টেলিগ্রামগুলো পাঠিয়েছিল। তার পর থেকেই তার বুক কাঁপছিল অনন্তের সঙ্গে এই অবশ্যম্ভাবী সাক্ষাতের কল্পনায়। সে ভাবলে যে অনন্ত তাকে গাল দিয়ে ভূত ঝেড়ে দেবে। কী যে সব কাণ্ড ক'রবে তা' কল্পনাই করতে পারছিল না, শুধু ভয় করছিল। ছেলে বেলায় কারণে অকারণে অনন্তর কাছে কাণমলা ও চড় চাপড় খেয়ে তার অবচেতনায় অনন্তের সম্বন্ধে যে একটা অহেতুক ভীতি ছিল তাতে তাকে সেই সাক্ষাতের সম্ভাবনা কল্পনায় ভারী সঙ্কুচিত ক'রে দিয়েছিল।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে প'ড়েই সে দেখতে পেলো অনন্ত ভীষণ ক্রুদ্ধ; গর্জ্জনশীল অনন্ত। দেখে তার পেটের পীলে চমকে গেল।

কিন্তু ফিরবার পথ নেই, কাজেই সে যেন কিছুই জানে না এই ভাবে

দাঁড়িয়ে রইলো: অনন্তের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ও তিরস্কার শোনবার শশঙ্ক প্রতিক্ষায়।

কিন্তু না হ'ল গর্জ্জন না হ'ল তিরস্কার!

ফলে দেখা গেল যে অনন্তের সামনা সামনি দাঁড়াতে বিকাশের যে সঙ্কোচ, অনন্তের ভয় বা সঙ্কোচ তার চেয়ে ঢের বেশী। বিকাশের কাছে তার সব ফন্দী ফাঁক হ'য়ে গেছে জেনেই অনন্ত কাবু হ'য়ে প'ড়েছিল। তারপর রাঁচীতে একবার বিকাশের মুখ ভেঙে দেবার একটা সামান্য প্রস্তাব করায় অনন্ত যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিল তাতে বিকাশের সামনে ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করা সম্বন্ধে তার একটা বেশ সুস্থ অরুচি জন্মেছিল।

তাই বিকাশকে দেখেই তার লম্ফ ঝম্ফ হঠাৎ চুপসে গেল এবং তার মানসিক লাঙ্গুল নিঃশেষে গুটিয়ে নিয়ে সে নিঃশব্দে সটকান দিলে।

বিকাশের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

সে মাসিমাকে তার সংবাদটা জানালে।

মাসিমা বললেন, "সে শুনেছি অনন্তের কাছে। তাতে ভারী রাগ হ'য়েছে বাবুর!" ব'লে তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, "যাক বাবা একথা নিয়েও যদি আর কিছু বলে তাতে কিছু বলিস নে তুই। ও কথা আর ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রে কাজ নেই। এখন বিয়েটা নির্বিঘ্নে—।"

অনন্ত যদিও বললে যে, সে এ বিয়ের সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তবু, এখনও যখন বিয়ের পাঁচ হাজার টাকা খরচ হ'তে বাকী আছে তখন সেগুলো খরচ না ক'রে অমনি হাত পা ধুয়ে ব'সে থাকবার মতলব তার সত্যি ছিল না।

টাকাটা বিকাশের হাতে পড়েছে—সেটা আদায় করবার চেষ্টায় দু'দিন পর সে বিকাশকে বললে, "টাকাগুলো চাই যে এখন!"

টাকা দিতে সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, কিন্তু 'না' বলাও বিকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুখের উপর কাউকেই সে 'না' ব'লতে পারে না কোনও দিন।

বিস্তর সাহস সংগ্রহ ক'রে বিকাশ বললে, "আজ কত দরকার?"

অনন্ত দেখলে—হিসেব চায়। আর সব টাকা চাইতে সাহস হ'ল না। ব'লতে গেলে আজ কিছুই ছিল না। তবু অনন্ত বিস্তর চেষ্টা ক'রে মাথার আনাচে কানাচে খুঁজে দশ বারোটা দফা উদ্ভাবন ক'রে ফেললে, তার সব যোগ ক'রে খুব টেনেও চারশো টাকার বেশী হ'ল না।

সে টাকাটা ফেললে বিকাশ।

এর পর অনন্ত হতাশ ও নিরুৎসাহ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে, তারপর খরচ খুব বাহুল্যের সঙ্গে হ'লেও একটু শৃঙ্খলার সঙ্গে হ'ল।

## তের

বিয়ে হ'য়ে গেল।

যে বিরাট ষষ্ঠি মাসিমা চেয়েছিলেন তার চেয়ে এক চুলও কম হ'ল না। মাসিমা আনন্দে ভাসতে লাগলেন।

বিয়ের আগেই বিকাশের নতুন বাড়ীর কাজ শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাড়ীতে বিকাশ উঠলো বিয়ে ক'রে ক'নের বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে এসে।

গীতা কখনও এ বাড়ী দেখে নি। মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীতে অনেক কিছু নতুন হ'য়েছে—তাতে বাড়ীখানা তক্ তক্ ক'রছে—নতুন বিজলীর আলোয় ঝকমক ক'রছে যেন ইন্দ্রপুরী! আনন্দে নাচতে লাগলো গীতার প্রাণ।

বাড়ীর ইট কাঠ পাথর সব যেন পরম আত্মীয়তার সঙ্গে গীতাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন ক'রে নিলে। গীতা দেয়াল স্পর্শ ক'রে থাকে—তাতে বুকের ভিতর ব'য়ে যায় আনন্দের স্পন্দন। চকচকে মেঝের উপর লুটিয়ে প'ড়ে তার নিবিড় স্পর্শ নেয়, থামগুলোকে দেয় তার আলিঙ্গন। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সে অনুভব ক'রতে চায় 'এ আমার বাড়ী—আমার স্বামীর'।

বিকাশ ছট্‌ফট্ ক'রছিল যতক্ষণ আত্মীয়-স্বজনের অনাবশ্যক ভীড় তাকে

আর গীতাকে ঘিরে অযথা তার হাত-পা আড়ষ্ট ক'রে রাখছিল।—অবশেষে—দীর্ঘ-সুদীর্ঘকাল পরে তারা দয়া ক'রে তাদের দু'জনকে রেখে সরে গেল।

অমনি বিকাশ তড়াক ক'রে উঠে গীতাকে ঘিরে নাচতে লাগলো।

নাচটা বিকাশের স্বভাব। ফুটবল খেলবার সময় সবাই তাকে বলতো নাচওয়ালা—কেন না, সে প্রায়ই নেচে উঠতো। গোলে যখন বল আসছে, সে তখন উবু হ'য়ে দুই হাঁটুর উপর দুই হাত দিয়ে নেচে নেচে গোলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াত। আর বল এলে যখন সে তাকে ধ'রে মেরে দিত অনেক দূরে, তখন গোল-পোষ্টের নীচে ফিরবার আগে চক্রাকারে ঘুরে এক চোট নেচে নিতো। আর যখন তাদের পক্ষ গোল দিত, তখন বিকাশ ধেই ধেই ক'রে নাচতো।

বিয়ের সময় থেকে বিকাশের তাই নাচ পাচ্ছিল, কিন্তু এই শত্রুগোষ্ঠী—এরা এক-দণ্ড তাকে সময় দিলে না নাচবার।

এখন সময় পেয়ে সে মনের সুখে এক চোট নেচে নিলে।

গীতারও প্রায় নাচতে ইচ্ছা ক'রছিল, কিন্তু সে ব'সে রইলো। বিকাশের নাচ দেখে সে বললে, "ও কী রঙ্গ?"

বিকাশ বললে, "ঠিক ধ'রেছ—এ রঙ্গ—আনন্দ-তরঙ্গ!" ব'লেই গীতাকে দুই হাত দিয়ে সবলে বেষ্টন করে ধ'রে বললে, "ওঃ! গীতা—গীতা তুমি কী?"

গীতা হেসে বললে, "আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি একটা পাগলের হাতে বন্দিনী।"

ছেড়ে দিয়ে বিকাশ আর এক পাক নেচে এসে ব'সে বললে, "তুমি নিশ্চয় মনে ভাবছ তুমি গীতা—শুধু গীতা! কেমন?"

"তা নয় তো কী?" হেসে বললে গীতা।

"তা নয়, তা নয়! ছিলে তুমি শুধু একটা বাজে গীতা এখন তুমি—প্রিয়া। অনাদি অনন্ত প্রিয়া—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিল মথিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে,
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
প'ড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণালক্ষ শত
করি অবনত।

ঠিক এমনি।"

ব'লে বিকাশ গীতার আলতাপরা পা দু'খানির কাছে মাথা নুইয়ে নিয়ে দু'হাতে পা চেপে ধ'রে ক'রলে চুম্বন।

"ও কি? ছি!" বলে গীতা পা দু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে বিকাশকে ক'রলে প্রণাম।

তাকে তুলে নিয়ে তফাতে ধ'রে বিকাশ সুধু চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। গীতাও বিকাশের মুখের দিকে বিপুল আনন্দে শুধু চেয়ে রইলো।

গীতা বললে এবার, "ভয়ানক আশ্চর্য্য, না?"

"কি আশ্চর্য্য?"

"ষোলটি বছর ধ'রে আমরা পরস্পরের মুখ দেখে আসছি, কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান? যেন এ মুখ দেখি নি কোনও দিন।"

"ঠিক্! আমারও তাই মনে হচ্ছে যে, তোমার মুখখানি যেন ঠিক এই মুহূর্ত্তে বিশ্বকর্ম্মার কামারশালা থেকে সদ্য ঢালাই হ'য়ে এলো।—কাল কি তোমার এ মুখ ছিল?—পরশু ছিল? ছ' মাস আগে ছিল? তবে কেন আমি দেখতে পাই নি এ মুখে এত রূপ, দেখিনি ওই চোখের ঐ অপূর্ব্ব লাবণ্য, পাতলা মেঘঢাকা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত ঐ অপরূপ মিষ্টি রঙটি তোমার!"

গীতা হেসে বললে, "বলবো কেন?"

"বল।"

"তখনও তুমি সুস্থ ছিলে, তাই—পাগল হও নি, তাই।" ব'লে হেসে বিকাশের কোলের উপর গড়িয়ে পড়লো।

বিকাশ গীতার মাথা কোলে ক'রে ব'সে তাকে দীর্ঘ চুম্বন দিলে। তারপর তার হাত ধ'রে গয়নাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

হঠাৎ বিকাশ বল্লে "গীতা, এ কী অন্যায়? এ গয়নাগুলো তোমার আমার স্ত্রীকে দেবার কথা ছিল!"

হেসে গীতা বল্লে, "দিয়েছি তো সব!"

"কি আশ্চর্য্য—বল, সব দিয়েছ অথচ সব র'য়ে গেছে তোমার। এই কথা ভেবেই বোধ হয় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ব'লে গেছেন, 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'।"

গীতা বল্লে, "ওটা কি? গাল দিলে না কি আমায়? দিয়ে থাক তো বুঝিয়ে বল। জান তো সংস্কৃত পড়ি নি কোনও দিন।"

"ওর মানে হচ্ছে এই যে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট রইলো।—আচ্ছা গীতা, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হ'ত। আর ঐ গয়না যদি তোমার সত্যি সত্যি দিতে হ'ত আমার স্ত্রীকে, তা' হ'লে তোমার হার্ট ফেল হ'ত নিশ্চয়।"

গীতা বল্লে, "যেটা একেবারেই অসম্ভব. তা' কল্পনা ক'রে কি লাভ?"

"কেন, আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পার্তো না? আমি বিয়ের বাজারে এমনি অচল জিনিষ ছিলাম না কি?"

"একেবারে অচল হ'লে চল্লে কি ক'রে এখানে? কিন্তু তবু অসম্ভব। এ গয়না আমি প'রেছিলাম, তাই কাণ টান্‌লে যেমন মাথা আসে তেমনি গয়নাটায় টান পড়্‌তেই আমার আসতেই যে হবে।"

একটা ছোট মেয়ে—বিঘ্ন যেন মূর্ত্তিমতী—এসে বল্লে, "আপনার এক বন্ধু এসেছেন, কাকাবাবু।"

মুখ খিঁচিয়ে বিকাশ বল্লে, "আ মরি বন্ধু রে আমার। এমনি সময় মর্‌তে এসেছেন! বন্ধু! জন্মজন্মান্তরের শত্রু আমার।"

ব'লে সে বাইরে যেতে যেতে ব'লে গেল, "পালিও না কিন্তু, আমি এলাম ব'লে ফিরে।"

গীতা কিন্তু উঠে পড়লো। বল্‌লে, "ফিরে এলে খুঁজে নিতে পারবে, এ বাড়ী তোমার গোলক-ধাঁধাঁ নয়।"

ব'সে থাকতে তার মন চাইছিল না। তার ইচ্ছা করছিল আনন্দে ছুটে বেড়াতে। সব ঘরে গিয়ে সবগুলিকে তার আলিঙ্গনে বেষ্টন করতে—তার নূতন সৌভাগ্যের কথা সবাইকে কাণে ধ'রে শোনাতে।

বের হ'তেই তার সাম্‌নে পড়লো বসন্ত। সে অমনি ফস্ ক'রে তার ধ'রে টেনে বল্‌লে, "এ বাড়ীর শালাবাবু, কোথায় বাওয়া হচ্ছে?"

বসন্ত ফস্ ক'রে ঘুরে গীতাকে এক প্রবল চিম্‌টি কেটে দিলে দৌড়।

"দস্যি ছেলেটা", ব'লে সে তাকে তাড়া করতে গেল, কিন্তু বিয়ের জবড়জঙ্গ কাপড়-চোপড় গয়না-পত্তর নিয়ে ছোটাটা সুবিধে হবে না ব'লে ছেড়ে দিলে।

সে সবার সঙ্গে হাসি-মস্করা ক'রে বেড়াতে লাগলো। কমলাকেও ছাড়লো না।

কমলা মাসিমার বিধবা মেয়ে, ভারী ঠাণ্ডা স্বস্তির চুপ চাপ মেয়েটি। সে নিঃশব্দে বোনের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে, আপনার ঘরে ব'সে পড়ে বা সেলাই করে, আর মায়ের ফরমায়েস মত এটা ওটা কাজ করে। বিধবা সে, কিন্তু বাপ-মা তাকে থান প'রতে দেন না, চওড়া কস্তা পেড়ে শাড়ী ও হাতভরা চুড়ী প'রে থাকে সে। এ বেশ সে পরে দায়ে প'ড়ে, মা বাপের মুখ চেয়ে। বেশভূষা বা সংসারের আর কিছুতেই তার আসক্তি নেই।

এ হেন বৈরাগিণীকেও গীতা স্বস্তি দেয় না। সে তার কাছে গিয়ে বলে, "হাঁ দিদি, কি কাণ্ডটা হ'ল বল দেখি—একটা দারুণ সীমানার মামলা চারদিকে। জ্যাঠাইমা—তিনি আমার জ্যাঠাইমা, না মাসী?—তুমি আমার দিদি, না ঠাকুরঝি?—অমল আমার বোনঝি, না ভাগনে?—এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আচ্ছা, তুমি বল তুমি কার দিদি?"

কমলা হেসে ব'ল্লে, "যে বেশী পাগল, তার।"

"বুঝেছি, তবে তুমি ঠাকুরঝি।"

"পোড়ারমুখী, বিকাশ পাগল হ'ল কিসে ?"

"বদ্ধ পাগল, দিদি, বদ্ধ পাগল ! একেবারে কাঁকের গারদের পাগলা। বিয়ের আগে এত কি জানি ? এখন দেখছি একেবারে unmanagable."

## চোদ্দ

বিকাশের সমস্ত চিত্ত কূলে কূলে ভ'রে ছিল শুধু উৎসবে, আনন্দে, উল্লাসে। তার অনন্ত-সাগরের একটা তীব্র উচ্ছ্বাসের সামনে এসে প'ড়েছিল—বন্ধু ! একটা অত্যুগ্র বিরক্তি তাতে গর্জ্জন ক'রে উঠেছিল। তার তোড়ে মুহূর্ত্তে এই বন্ধুরূপী বিঘ্নটিকে ভাসিয়ে দিয়ে বাবার জন্য সে এলো বাইরে। এসে দেখলে—সুবোধ চ্যাটার্জ্জী !

এক মুহূর্ত্তে সে যেন লুপ্ত হ'য়ে গেল। সুবোধের সামনে আনন্দ করবে কি ? তার সমস্ত বর্ত্তমান তার সামনে এত তুচ্ছ এত খেলো হ'য়ে গেল যে লজ্জায় সে আপনাকে লুকাবার পথ খুঁজতে লাগলো।

সুবোধ যেন তারই অবজ্ঞাত অন্তরাত্মা মূর্ত্তিমান হ'য়ে এসেছে। যেন একটা জীবন্ত তিরস্কার। তাই তাকে দেখলে তার তপ্ত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে এপার ওপার হ'য়ে যেন বিদ্ধ হ'য়ে যায় তুষার-শীতল একটা ইস্পাতের ফলক।

চুপসে গেল সে।

নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে সে বললে, "এই যে, সুবোধ দা' !"

সুবোধ হেসে বললে, "হাঁ সুবোধদাই—যতই চেহারা বদলে থাক তবু সুবোধ দা'ই। তুমি নেমন্তন্ন ক'রেছিলে, কাল আসতে পারি নি। পারলেও হয় তো আসতাম না। কেন না তোমার এখন আমার সঙ্গে দেখা করার সময় তো হবে না। আজ কালরাত্রি, তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা হবে না।

তাই হয়তো একটু অবসর পাবে ব'লে এলাম—তা' ভাই congratulations."

সুবোধ জানালে তাকে আনন্দ, কিন্তু সে যদি তার বদলে বিকাশকে ঠাস ক'রে একটা চড় মেরে দিত তবে এর চেয়ে বিকাশ নিজেকে বেশী লাঞ্ছিত বা তিরস্কৃত মনে করতো না। সে যে শুধু দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে অনবরত এই কথাই তাকে বলছে, আমি হচ্ছি যা' তোমার হওয়া উচিত ছিল, যা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে! সখের দরদী—হায়াগ।

চাবুক খাওয়া কুকুরের মত মুখ নীচু ক'রে বিকাশ বললে শুধু, "ধন্যবাদ।"

সুবোধ তার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "বাঃ বিয়ের জল গায় প'ড়তেই দেখছি চেহারা ফিরে গেছে তোমার। সেই চোয়াড়ে চেহারার উপর বেশ একটা শ্রী গজিয়েছে দেখছি। বউমার বাহাদুরী আছে।"

লজ্জিত হ'লেও সুবোধের এই রসিকতাটুকুতে বিকাশ একটু আশ্বাস পেলো। সুবোধ ত্যাগী সন্ন্যাসী হ'তে পারে, তবু সে যে মানুষ, তার কাছে মানুষের সাধারণ হাসিকান্না একেবারেই 'ট্যাবু' নয় তা জেনে তার একটু সাহস হ'ল।

ক্রমে সে বললে, "তা সুবোধদা, উত্তর বাঙলার রিলিফের কাজ তো এখন শেষ হ'য়ে গেছে। এখন একটা কিছু করুন।"

হেসে সুবোধ বললে, "তুমি কি ভাবছ আমি কিছু করছি না। দিন রাত খাটছি আমরা। যে কাজে গিয়েছিলাম, এখন দেখছি সেটা তার চেয়ে ঢের বড় কাজের সূত্রপাত শুধু। বন্যা ও দুর্ভিক্ষে যে দুর্দ্দশা হ'য়েছিল তা গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে যে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ লেগে র'য়েছে তা তো যায় নি! এখানে কাজ ক'রতে গিয়ে আমার চোখ খুলে গেছে, দেশের এই স্থায়ী দুর্দ্দশা, গরীবদের এই চিরন্তন দুর্ভিক্ষ এটা দূর করবার জন্য সামান্য যেটুকু করতে পারি তাই করছি।"

"চিরদিন তো আর এই করলে চলবে না। পেট চালাতে হবে তো, এ

কাজের খরচ জোটাতে হবে তো। শুনুন, আপনি আসুন, একটা ব্যবসা করুন।"

"ব্যবসা করবো? তা মন্দ কী, যদি ঠিক মনের মত পার্টনার পাই।"

"আমি আপনার পার্টনার হব, আসুন।"

হেসে সুবোধ বললে, "আমার পার্টনারসিপের সর্ত্তে তোমার পোষাবে কি? আমি আমার পার্টনারের সঙ্গে কাজ ভাগ করে নেব। সে করবে আমদানী আমি করবো খরচ—সে ব্যবসা চালিয়ে টাকা রোজগার ক'রে দেবে, আমি করবো শুধু খরচ! রাজী আছ এতে?"

হেসে উঠে বিকাশ বললে, "এরকম পার্টনারসিপ হয় জগতে! আমার মেশোমশায়ের তা ছিল আর আমারও বোধ হয় হ'ল। কিন্তু জানেন এমন পার্টনারসিপ জগতে শুধু একজনের সঙ্গেই হয়।"

"পরিবারের সঙ্গে, কেমন? কিন্তু সব জায়গায় তাও হয় না।"

"কিন্তু তামাসা রাখুন সুবোধ দা', চিরদিন তো এমনি চ'লবে না। লোকের কাছে হাত পেতে টাকা আদায় করা যে কি ঝকমারী তা' তো দেখেছেন। রোজগারের একটা উপায় করুন। তা ছাড়া বউদি—তাঁর দিকেও তো আপনার চাইতে হবে।"

সুবোধ বললে, হাঁ ভাই ওইটাই ছিল আমার বড় সমস্যা। আমি তো ভেবেছিলাম যে তাঁকে তো দাদার অন্নদাসী ক'রে চিরদিন রাখা যাবে না! তাই ভারী উদ্বিগ্ন হ'চ্ছিলাম। কিন্তু সে সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেছে।"

"কী সমাধান করেছেন আপনি—বড় জোর তাঁর ভাতকাপড় জোগাড়"—

"সমাধান আমি করিনি ভাই, তিনি নিজেই করে দিয়েছেন।"

শঙ্কিত চিত্তে বিকাশ বললে, "কী বলছেন সুবোধদা, বউদি কি তবে নেই?"

হেসে সুবোধ বললে, "অত্যন্ত আছেন এবং হয় তো এখনি এসে পৌছুবেন এখানে। তোমার গিন্নীর জন্যে সিঁদুর কিনতে গেছেন একপাত।"

"তবে?"

"শোন। আমি যখন ভেবে আকুল হ'চ্ছি, তার প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি উপায়ে ক'রবো, তখন একদিন তিনি হঠাৎ আমার সামনে এসে প্রণাম করলেন। অনেকদিন পর তাঁকে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এখন তো ইনি তাঁর পত্নীত্ব ও ভার্য্যাত্বের অধিকার দাবী ক'রে বসবেন —কী জবাব দেব এঁকে? আমি বললাম, "তুমি? এখানে? হঠাৎ!"

"তিনি হেসে বললেন, 'এলাম'। ব'লে তিনি তাঁর তোরঙ্গ ও বিছানা গুছিয়ে রাখতে লাগলেন।"

"আমি ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘেমে উঠলাম। কী বলবো এঁকে?"

"সব গুছিয়ে টুছিয়ে মুখহাত ধুয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে তিনি বললেন, 'রান্নার জোগাড় কোথায়?'

"আমি বললাম, সে কথা পরে হবে, আগে বস, গোটাকয়েক কথা আছে।"

"বসলেন তিনি। আমি বললাম, সেখানে কোনও কিছু হ'য়েছে। ঝগড়া হ'য়েছে?—অপমান ক'রেছে কেউ?"

"ঝগড়া কেন হবে? তোমার দাদা-বউদির আমাকে আদর যত্ন ক'রে কিছুতেই আশ মেটে না। তাদের ভাবটা এই যেন আমার কাছে তাঁরা কত অপরাধী। উঠতে বসতে তাঁরা আমায় আদর করেন কচি খুকীটির মত।"

"তবে? তবে এলে কেন?"

"খিল খিল ক'রে হেসে তিনি বললেন, 'বারে! তোমার কাছে আমি আসবো তার আর কেন কি? ছ'মাস তোমায় ছেড়ে আছি এই ঢের।"

"কিন্তু এখানে তোমাকে রাখবার মত জায়গা তো নেই—তা ছাড়া—"

"কেন? আমি কি তাড়কা রাক্ষসী যে আমাকে রাখবার জন্য মস্ত বড় ঘর লাগবে? ঐ তক্তপোষে দুজনের দিব্যি জায়গা হবে।"

"আমি বললাম, পাগলামী রাখ। তুমি হয়তো জান না যে আমার এখানে খাবার জোগাড়ের খুব বাহুল্য নেই। আর কোনও কিছুই নেই। আর আমার কাজ—"

"তিনি বললেন, 'সব জানি, জেনে শুনেই এসেছি—কেননা আমি তোমার সহধর্ম্মিণী' !"

"Splendid !" ব'লে বিকাশ একেবারে লাফিয়ে উঠলো'। "সুবোধদা', আপনি ভাগ্যবান্ !"

"সে অভিযোগ আমি স্বীকার করি। তোমার বেউদি এসে আমার সামান্য ঘরখানি লক্ষ্মীশ্রীতে ভ'রে দিয়েছেন, আমার কাজের অর্দ্ধেকের বেশী ভাগ নিয়েছেন—তার উপর আমার মনের মতন partnerও হ'য়েছেন।"

"মানে ?"

"মানে তিনি সেখানকার একটা ইস্কুলে মাষ্টারী ক'রে কিছু রোজগার ক'রছেন। তাতে আমাদের খাওয়া-পরা চলে। আর আমরা দুজনেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি।—তিনি রোজগার ক'রছেন, আমি খাচ্ছি—ঐ যে এসেছেন !"

বাইরের দিকে চেয়ে সুবোধ এই ব'লে উঠে গেল। বিকাশও সঙ্গে গেল।

একটি কৃশাঙ্গী সুন্দরী আপাদমস্তক খদ্দরে মণ্ডিত হ'য়ে এসে দাঁড়ালেন।

পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই বিকাশ মাথাটা একেবারে মালতী দেবীর পায়ে ঠেকিয়ে দীর্ঘ প্রণাম করে বললে, "আপনাকে দেখে ধন্য হ'লাম বউদি ?"

মালতী হাসতে হাসতে বললে. "পুরুষ মানুষেরা এত অল্পে ধন্য হয় বলেই আমরা তাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারি ভাই।"

ব'লে তিনি একটা কাগজের মোড়ক বের করতে করতে বললেন, "চল ঠাকুরপো, তোমার বউকে দেখে আসি।"

বিকাশ বললে, "না, আপনি তার কাছে যাবেন না, সেই এসে আপনাকে প্রণাম ক'রবে।"

ছুটে গিয়ে সে গীতাকে নিয়ে এলো। গীতা তাঁদের প্রণাম ক'রলে।

কাগজের প্রকাণ্ড মোড়ক থেকে উপহার বের হ'ল, একখানা বিশ্রী মোটা খদ্দরের শাড়ী আর একখানা সিঁদূর!

উপহার পেয়ে গীতা খুব প্রফুল্ল হ'ল না; নীরবে মাথা নীচু ক'রে সে নিলে।

সুবোধ বললে, শাড়ীখানা আমাদের তুজনের কীর্ত্তি—আমাদের প্রথম চেষ্টা। কাজেই এমন মোটা ও বিশ্রী। কিন্তু তবু গাছের প্রথম ফলের দাম বেশী, তাই এটা তোমার বউকে দিতে এনেছি।"

বিকাশ ফট্ ক'রে শাড়ীখানা নিয়ে তার মাথায় রেখে বললে, "তবে একে মাথায় তুলে রাখতে হ'বে—এ অমূল্য।"

মালতী ও গীতাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে মাসিমার হাওলা ক'রে দিয়ে বিকাশ এসে সুবোধকে বলে, "আচ্ছা সুবোধ দা' মনে কিছু না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"কী?"

"আপনি কি গান্ধীজীর প্রোগ্রাম বিশ্বাস করেন?"

"নিশ্চয়। ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টাকে ঘুসি মেরে আমি যে হিংসার পরিচয় দিয়েছিলাম তাতে আমি অনুতপ্ত নই—আর উপযুক্ত স্থানে আবার অমনি কাজ ক'রতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

"অহিংসার কথা বলছি না। ব'লছি এই খদ্দর প্রোগ্রাম—সুতো কেটে দেশ স্বাধীন করবার প্রোগ্রাম।"

"বিশ্বাস করি না।"

"তবে আপনারা এই সুতো কেটে খদ্দর বুনে আপনার শক্তির অপচয় ক'রছেন কেন? এই শক্তি দিয়ে আপনারা দেশের অনেক বেশী সম্পদ সৃষ্টি ক'রতে পারেন।"

"শক্তির অপচয় আমরা করিনে। কিন্তু কোনও মানুষই সব সময় শুধু কাজের কাজ ক'রতে পারে না। তাদের মনে একটু relaxation দরকার।

তাই আমরা খেলাধূলো করি। আমাদের সুতো কাটা ও কাপড় বোনা এমনি relaxation—ভারী আনন্দ হয় এ কাজে—তুলো থেকে আঁশ বের করে টেনে সুতো করায় সৃষ্টির আনন্দ পাই। তাই যখন কাজ থাকে না তখন ব'সে ব'সে এই করি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবের সংসারের একটা বড় অভাব মোচন হয়। আমি শুণ্ডামীতে অদ্বিতীয় হ'লেও পলিটিক্স বা ইকনমিক্স খুব বেশী বোধ হয় বুঝি না। যেটুকু বুঝি তাতে মনে হয় যে খাদি প'রে দেশ স্বাধীন হবে না, আর, দেশশুদ্ধ লোক যে আর সব শিল্প ছেড়ে খাদিই বুনতে থাকবে এ হ'তে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। খাদি দিয়ে ব্যবসা চলবারও বোধ হয় সম্ভাবনা বা উপকারিতা নেই। কিন্তু গরীব বা মধ্যবিত্ত লোক যদি তাদের দীর্ঘ অবসরে নিজের কাপড় নিজে সুতো কেটে বুনে নিতে পারে তবে তাদের উপকার হবে। এটা নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি।"

তার পর একটু ভেবে সুবোধ বললে, "তা ছাড়া আর একটা কথাও আছে। গত যুদ্ধের সময় যে কাপড়ের সঙ্কট হ'য়েছিল তা থেকে আর একটা শিক্ষা আমরা পাই। আমাদের এই সুতো কাটা ও কাপড় বোনা বিদ্যাটা যদি শেখা থাকে তবে অমনি সঙ্কটের কালে এতে হবে প্রভূত উপকার।"

বিকাশ ভেবে দেখলে কথাগুলি ফেলবার নয়। তার মনের ভিতর যে কথাটা কাঁটার মত বিঁধছিল সে কথাটা অবশেষে বিকাশ ব'লেই ফেল্লে, "সুবোধ দা', আপনাকে দেখে আমার লজ্জা হয়, নিজের জীবনের উপর ধিক্কার আসে। এত ত্যাগ স্বীকার ক'রে কষ্ট স'য়ে আপনি করছেন লোক-সেবা, আর আমি—আমি করছি শুধু পয়সা রোজগার। কিছুই ক'রছি নে। আপনি সেদিন ঠিক ব'লেছিলেন—আমি একটা হাঘাগ।"

হেসে তার পিঠ চাপড়ে সুবোধ ব'ললে, "আরে সেদিনকার সেই কথাটা তুমি মনে ক'রে রেখেছ? জান, আমিও কিন্তু তোমার সেদিনকার কথা ভুলতে পারিনি। সেই দিন থেকে আমার মনে হ'য়েছে কেবলি তোমার সেই

কথা—ওরাও আপনার মত মানুষ! সেইদিন থেকে দিনে রাতে, কর্ম্মে বিশ্রামে বারে বারেই ও কথাটা আমার কাণের ভিতর বেজেছে। ব'লতে গেলে তোমার কথাটাই আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাই যখন গরীবের দুঃখ দেখেছি স্থির থাকতে পারিনি। কাজেই তুমি আমার বর্ত্তমান জীবনের একরকম মন্ত্রদাতা গুরু বলতে হবে।"

বিষণ্ণভাবে হেসে বিকাশ ব'ল্লে, "যেমন ঐ মাতাল বদমায়েস জীবানন্দ ভট্টচায অনেক সাধু সজ্জনের মন্ত্রদাতা গুরু!"

"ওঃ! বিনয়ের অবতার! যেন তুমি অপদার্থ! কেন? সমাজে সুবোধ চ্যাটার্জ্জীর দরকার আছে, বিকাশের দরকার নেই? তবে দরকার হ'লে আমার টাকা যোগাবে কে?—টাকাওয়ালা লোক না থাকলে আমরা যে শুকিয়ে ম'রবো। আমরা দুধের বেপারী, আমাদের দুইবার গরু চাই যে।" ব'লে সুবোধ হেসে উঠলো।

এরা স্বামী-স্ত্রী যখন খাওয়া দাওয়া সেরে উঠলো তখন বিকাশের মনে ভারী অস্বস্তি বোধ হ'ল এই ভেবে যে এখন সে এদের হাতে মোটা কিছু টাকা দিয়ে দেবে সে শক্তিও সম্প্রতি নেই তার, বিয়ের খরচে সব গেছে। তা' দিতে পারলেও তার মনে কতক স্বস্তি হ'ত।

তারা চ'লে গেলে বিকাশ ব'সে ব'সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

তার মনের ভিতর সব চেয়ে তীব্রভাবে অনুভব ক'রছিল একটা বাধা—একটা বন্ধন। নিজে হাতে বেঁধেছে সে এ বন্ধন—স্বাধীনতা হারিয়ে ব'সেছে তার। নইলে—

মালতীর কথা মনে হ'ল। কি মহীয়সী এ নারী। গীতা তো মালতী নয়। গীতা যদি মালতীর মত হ'ত—তা' হ'লেই বা কি হ'ত? মাসিমা—

নাঃ তার পক্ষে এসব আকাশকুসুম। নিয়তির কঠোর আদেশ—হাঘাগ্‌ নামটাই তার বহাল থাকবে।

ক্রমে সুবোধের শেষ কথা মনে হ'ল, তারও কথা মনে হ'ল, তারও কাজ

একেবারে অসার্থক নয়। সুবোধের মত কর্ম্মী ক'রবে কাজ, সে জোগাবে টাকা। ক্রমে ভাবলে সে সুবোধের কথাটা মিথ্যে নয়। সে যদি রোজগার ক'রে যথেষ্ট টাকা সুবোধের মত কর্ম্মীদের দিয়ে যায় তবে তার লোকসেবার গৌরব কারও চেয়ে কম হবে না।

সবাই কিছু কাজই ক'রতে পারে না। কেউ বা খাটতে পারে, কেউ শুধু চিন্তা দিয়ে সেবা করে, কেউ করে দান। সবারই কাজ সার্থক হয়। রাসবিহারী ঘোষ কি তারক পালিত হাত পা খাটিয়ে কোনও সেবার কাজ করেন নি, তবু তাঁরা দেশবাসীর চিরদিনের নমস্য হয়ে র'য়েছেন।

বিকাশ যদি একদিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা উপায় ক'রে দেশের কাজে দান ক'রতে পারে তাতে তার জীবন অসার্থক বলে মনে করবার কোন হেতু থাকবে না। সুবোধের মত ত্যাগী কর্ম্মবীর হবার উপায় নেই, সাহস নেই, শক্তি নেই তার, কিন্তু দান ক'রে সে হ'তে পারবে ত্যাগবীর।

এই চিন্তায় তার মনের অবসাদ ক্রমে কেটে গেল। তার জীবনের ছক সে নূতন ক'রে কাটলে। ধনী হবে সে—নিজের জন্য নয়, পরিবারের জন্য নয়, দেশবাসীর জন্য, দরিদ্রের সেবার জন্য। ধনের সাধনা হবে তার জীবনের যজ্ঞ।

মনটাকে এমনি ক'রে নূতন প্রতিজ্ঞা দিয়ে উৎসাহিত ক'রে সে উঠে গেল ভিতরে।

গীতা তখন সুবোধের দেওয়া খদ্দরখানা আর কয়েকটি বউয়ের কাছে মেলে ধ'রে ব'লছে, শাড়ী দিয়েছে দেখছিস, যেন সতরঞ্চী। আক্কেলখানা দেখ! এমন জিনিষ তোদের না হয় দায়ে প'ড়ে প'রতে হয়—তাই ব'লে এইটা নাকি প্রেজেন্ট দেয়—আর আমাকে? খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো গীতা।

এ হাসিটা বিকাশের মনের ভিতর তীক্ষ্ণ শলাকার মত গিয়ে বিঁধলো।

এই গীতা! ত্যাগী বীর বন্ধুর এ স্নেহের উপহারের সত্য মর্য্যাদা বোঝবারও শক্তি নেই তার।

কোথায় গীতা আর কোথায় মালতী।

বিকাশের নূতন ত্যাগের জীবনেও যে সহধর্ম্মিণী হ'য়ে দাঁড়াবে, সে মেয়ে গীতা নয়।

গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল তার সারা অন্তর।

কাল বিবাহ-বাসরে উদ্বোধন হ'য়েছিল তার যে উৎসবের দিন, দু'ঘণ্টা আগেও বিকাশ ভেবেছিল এ উৎসব তার চিরজীবনের, এর আনন্দধারা ক্ষীণ হবে না কোনও দিন।

এখন ?—এখনি নিভে গেল তার মনে উৎসবের রঙিন আলো। বিয়ের উৎসবের পায় পায় এলো কালরাত্রি।

## সতেরো

পাঁচটা বছর যেন এরোপ্লেনের বেগে উড়ে গেল। বিকাশ ব'লতে গেলে টেরই পেল না সময়ের চোরা পায়ে এই দ্রুত পলায়ন

কেন না এ পাঁচ বছর সে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায়নি। টাকা শীকারের অবিশ্রাম চেষ্টায় সে কাটিয়েছে এর প্রত্যেকটি দিন, আর রাত্রি ভ'রে শুধু চিন্তা ক'রেছে, কাল সে কোথায় টাকা পাবে ?

তার প্রথম কারণ তার মাসিমা, মেসোম'শার মারা যাবার পর যে প্রতিজ্ঞা সে ক'রেছিল, যতদিন গেল, ততই সে বুঝতে পারলে কি ভীষণ তার ভার। মাসিমার দরাজ হাতের সব খরচ জোগানর কাছে হাতীপোষা একটা তুচ্ছ ব্যাপার ! ব্যয়ের সংযম তিনি কোনও দিন শেখেন নি, আর তাঁর স্বামীর জীবনের শেষ কুড়িটি বৎসর তা' শেখবার তাঁর কোনও দরকার হয় নি। তখন হরিনাথ বাবু বিস্তর রোজগার ক'রতেন, আর যা পেতেন সবই দিতেন স্ত্রীকে। অন্নপূর্ণার

কাজ ছিল, শুধু সে টাকাগুলো খরচ ক'রে পরিষ্কার হওয়া। তার জন্য তাঁর উপায় উদ্ভাবন ক'রতে হ'ত, টাকা বাঁচাবার নয়, টাকা খরচ করবার।

তাই তিনি মুক্তহস্তে আত্মীয়-অনাত্মীয়, নিকট ও দূরবর্ত্তী এত লোককে নিয়মিত টাকা সরবরাহ ক'রতেন যে তাদের সেই টাকায় একটা দাবী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

হরিনাথ বাবুর মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণা অনুভব করেছিলেন যে সেদিন তাঁর আর নেই। না চাইতে অজস্র টাকা আর তাঁর হাতে আসবে না, তার বিস্তীর্ণ খরচের অংশমাত্রও তাঁর চালান সম্ভব হবে না। তাই কিছুদিন তিনি হাত গুটিয়েই ছিলেন।

তাঁর কাছে পাওয়া যাদের অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল এবং আরও যাঁরা জানতো যে হাত পাতলে তাঁর কাছে পাওয়া যায় তাদের বোধ হয় তাঁর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ক্ষতির পরিমাণটা অনুভব করবার শক্তি বা ইচ্ছা ছিল না—তাই তারা তাঁকে চিঠি লিখতো প্রায় রোজ, তাঁকে তাদের অভাব জানিয়ে। চিঠিগুলো প'ড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি সেগুলি তুলে রেখে দিতেন আর থেকে থেকে চোখের জল ফেলতেন—এদের তিনি কিছুই দিতে পারেন না ব'লে।

বিকাশ যখন মাসের পর মাস তার মাইনা এবং প্রায়ই তার উপরি রোজগারের টাকা এনে তাঁর কাছে দিতে আরম্ভ ক'রলে অন্নপূর্ণার তখনও অনেকটা সঙ্কোচ ছিল। তিনি জানতেন যে তার স্বামীর রোজগারের মত এটাকা তাঁর নিজের নয়, তিনি বিকাশের ক্যাসরক্ষক মাত্র।

টাকা হাতে আছে দেখে অনেকটা সঙ্কোচের সঙ্গে তিনি একদিন বিকাশকে ব'ললেন, "দেখ তোর টাকা থেকে পঞ্চাশটা টাকা অনন্তকে পাঠিয়ে দেবো? বড় কষ্টে প'ড়েছে সে।"

বিকাশ তাঁকে ব'ললে "কী ব'লছেন মাসিমা? আমার টাকা আবার কোথায়? আপনার টাকা, আপনি খরচ ক'রবেন তাতে আমাকে জিজ্ঞেস ক'রবেন কি?"

এরপর আর যখনই তিনি কাউকে কিছু দেবার কি কোনও খরচ করবার অনুমতি চাইতে গেছেন, বিকাশ তখনই কাণ বন্ধ ক'রে উঠে গেছে।

এতে ধীরে ধীরে মাসিমার সঙ্কোচ কেটে গেল আর ক্রমে তাঁর খরচের হাত আবার খুলে গেল। ঠিক আগের মত নয়, কিন্তু সে তাঁর ইচ্ছা বা চেষ্টার অভাবে নয়, শুধু টাকা ফুরিয়ে যায় ব'লে।

হিসাব মাসিমা কোনও দিন রাখতেন না, রাখতে জানতেনও না। মাসে দু'শো' তিনশো' কি পাঁচশো' টাকায় কতদূর কি খরচ করা যেতে পারে এ দুশ্চিন্তা তিনি কখনও করেন নি। যে টাকা হাতে আসে খরচ ক'রে যান, তাতে যদি মাসের মাঝপথে টাকা ফুরিয়ে যায় তিনি টাকা চান। এই ছিল তাঁর চিরদিনের অভ্যাস, আর মেসোমশায় বেঁচে থাকতে টাকা চাইলেও পাওয়াটাও তাঁর ছিল তেমনি অভ্যাস। বিকাশের সংসারে এসে সে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হ'ল না। তাই একবার যখন সঙ্কোচ কেটে তাঁর হাত খুলে গেল তখন বিকাশ দেখে আঁৎকে উঠলো যে আবশ্যকের অতিরিক্ত প্রচুর খরচ ক'রে মাসের মাঝপথে টাকা যায় ফুরিয়ে আর মাসিমা টাকা চান।

তাই হন্তদন্ত হ'য়ে সে ছুটতো টাকার সন্ধানে।

ভাগ্যদেবী তার উপর প্রসন্নই বরাবর, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে একটু পরিহাস করতে ছাড়েন না। টাকার জন্য বিপন্ন বিকাশের কোনও দিনই হ'তে হয় নি। ঠিক যখন টাকার দরকার তখন তা' জুটিয়েই দিয়েছেন তিনি, কিন্তু এমন প্রচুর পরিমাণে টাকা কখনও দেন নি যাতে বিকাশ হাতে কিছু না নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। দু'দিন কি দশ দিন পরে যে টাকা চাই তা' পাবার কোনও স্থির ক'রতে না পেরে যখন সে অধীর হ'য়ে উঠেছে তখন, সময়ে যে টাকা আসবে সে ইঙ্গিতও বিকাশ পায় না, ছট্‌ফট্ ক'রে মরে, যদিও ঠিক সময়ে টাকাটা এসে যায়।

মাসিমা এমনি ক'রে টাকার জন্য তাকে নিরন্তর ছটফটানির ভিতর রাখতেন। তাই দিন রাত সে রোজগারের ফিকিরে ঘুরতো—ক'রতোও রোজগার।

বিয়ের ব্যাপারটাও তার এমনি ক'রে মিটে গেল। তার পরেও ছটফটানি কমলো না।

ক্রমে বিকাশের এতে বেশ বিরক্তি অনুভব হ'তে লাগলো। সে কর্ত্তব্যবোধে মাসিমাকে রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার মত ছেড়ে দেবার সঙ্কল্প করেছে; তাই ব'লে মাসিমার কি উচিত নয় তার দিকটা দেখা? কত ধানে কত চাল হয় সেটা বুঝতে যে মাসিমার প্রকৃতিগত অক্ষমতা আছে তা' বিকাশ বোঝে না, তার মনে হয় শুধু মাসিমার ঘোরতর অবিবেচনার ফল। টাকা টাকা ক'রে ছোটাছুটি ক'রে যখন জিভ বেরিয়ে আসছে তখন সে যেদিন দেখে যে মাসিমা এক ডজন মণি-অর্ডার ফরম নিয়ে টাকা পাঠাবার ঠিকানা লেখাচ্ছেন, তখন সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে ক্ষিপ্ততার ফল হয় শুধু বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া—অরাও টাকার সন্ধানে। মাসিমাকে একটি দিনের তরেও সে ব'লতে পারে না, এ-খরচটা ক'রো না।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি?

খুব যখন বিরক্ত হয় সে, তখন তার অন্তরাত্মা তাকে তিরস্কার ক'রে বলে,—"ছাই কর্ত্তব্যবুদ্ধি! মাসিমাকে খাইয়ে পরিয়ে আরামে রাখবার কর্ত্তব্য তোমার আছে মানি কিন্তু তাঁর পাগলামীর খেয়াল মেটাবার সঙ্গে কর্ত্তব্যের কি সম্পর্ক? বাজে কথা—এ স্রেফ কাপুরুষতা!"

কিন্তু অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনি সাক্ষাৎকার সে ভয় করে—কেবলি তাকে ভোগা দিয়ে এড়িয়ে যেতে চায়।

ক্রমে দাঁড়াল এই যে মাসিমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে তাঁকে খুসী রাখবার সঙ্কল্প একদিন ক'রে সে পেয়েছিল তৃপ্তি ও আনন্দ। আজ তার কাছে এ-কাজ হ'য়ে উঠেছিল একটা অসহ্য অত্যাচার। কিন্তু সে-কথা বলবার সাহস তার নেই, তাই সে মনে মনে গজর্ গজর্ করুক; তাই সে একদিন নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না—দিনরাত চলে তার টাকার শীকার।

এত ক'রেও সে যে মাসিমাকে খুব খুশী করতে পেরেছে এমন নয়। তাঁর

সাধের খরচ সবই নিঃশেষে মেটাবার মত টাকা সে কোন দিনই দিয়ে উঠতে পারে না। যখন যেটার টাকা না পান তাতেই বিরক্ত হন, কেন যে পান না তাতে কিছু আসে যায় না। বিকাশের অশক্তিকে ইচ্ছাকৃত ত্রুটির থেকে ভিন্ন ক'রে তিনি দেখেন না। প্রথমে এতে তিনি শুধু মুখ ভার ক'রতেন বা চোখ মুছতেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই তাঁর অতৃপ্তি মুখর হ'য়ে উঠল।

বিনোদিনী অভাব জানিয়ে পঁচিশটা টাকা চেয়েছিল। টাকা ছিল না, বিকাশও পারলে না দিতে। মাসিমা মুখ ভার ক'রে ব'ল্লেন—"হুঁ, এও হ'ল আমার! মাত্র পঁচিশটে টাকা তাও দিতে পারলাম না।"

কথার সুর শুনে বিকাশের রক্ত গরম হ'য়ে উঠলো। সে বেরিয়ে গেল। ফিরে যখন এল তখন এটা ওটা কথার পর মাসিমা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বিনু পঁচিশটে টাকা চেয়েছিল তা' দিতে পারলাম না তাকে।"

বৈকালে আবার সেই কথা! রাত্রে আবার! এমনি তিনি চার দিন ক্রমান্বয়ে এই কথা নিয়ে তিনি এমন তীক্ষ্ণ অদৃশ্য অনুযোগ ক'রতেন যে বিকাশ ক্ষেপে উঠতো।

কিন্তু কথা কইবে কে? সাধ্য কি? সাহস কোথায়? শেষে মরিয়া হ'য়ে দু'তিন দিনের চেষ্টায় সে টাকাটা এনে দিয়ে তবে খালাস হ'ত—যে দু'দিন আবার এমনি একটা কাল্পনিক প্রয়োজন মাসিমার না হয়।

বিকাশের অন্তরাত্মা তাকে টিট্‌কারী দিয়ে বলে, "বৃথা, বৃথা, বৃথা। মাসিমাকে খুসী ক'রে রাখবে? মোসোম'শায় না পেরে ভেবে ভেবে ম'রে গেলেন, তুমি তো কোন ছার! এখনও সামলাও—সাহস ক'রে রুখে দাঁড়াও। নইলে গেলে!"

অন্তরাত্মার এ শাসনে বিকাশ যখন সত্যি সাহস ক'রে রুখে দাঁড়াবার জন্য সঙ্কল্প ক'রছে তখনই হয় তো আবার গীতা তাকে ব'লত ঠিক এই কথাই। সে ব'লতো, "মাসিমার আক্ষেপ মেটাতে পারবে না কোনও দিন····এ চেষ্টা ক'রতে গেলে ডুবতে হবে শেষে।"

নিজের প্রাণের এমনি কথাটাই পরের মুখে শুনে বিকাশের মনে হ'ত সেটা যেন তার নির্ব্বুদ্ধিতার উপর টিট্‌কারী। অমনি সে বিদ্রোহ ক'রে উঠতো। মাথা খাড়া ক'রে সে ব'লতো, "ডুবি ডুববো!" জেদ ক'রে বেরিয়ে যেতো সে। যেমন ক'রে হ'ক টাকা সংগ্রহ ক'রে এনে মাসিমাকে শান্ত ক'রতো।

প্রচুর উপার্জ্জন ক'রেও তাই টাকার চিন্তা ছাড়া বিকাশ কখনও থাকতো না। তার প্রত্যেকটি ঘণ্টা কাটতো টাকার শীকার আর রাত কাটতো পরদিনের শীকারের পরিকল্পনায়।

তার টাকার উপর এই টান, চিরস্থায়ী অভাবের এই যে অবস্থা এটা ষোল আনাই যে মাসিমার কর্ম্মের ফল তা' নয়। এর ভিতর গীতার কারচুপি ছিল যথেষ্ট।

হরিনাথবাবুর উড়নচণ্ডী পরিবারের গীতা ছিল যেন মরুভূমির ওয়েসিস্। তার মন স্বভাবতঃই গোছালো এবং বলতে কি সে একটু দৃষ্টিকৃপণ। যখন তার বয়স দশ বছর, তখন একদিন বসন্ত জ্যাঠাইমার কাছে পেয়েছিল একটা টাকা। সে অমনি চাকর নিয়ে বাজারে গিয়ে রাজ্যের জিনিষ কিনে টাকাটা সম্পূর্ণ খরচ ক'রে ফিরে এল। গীতা তার সেই কাণ্ড দেখে মাথায় হাত দিয়ে বললে, "সর্ব্বনাশ। একটা টাকা তুই দেখতে দেখতে খরচ ক'রে ফেল্‌লি, টাকা পয়সা অমনি নষ্ট করতে হয়?" সে-বাড়ীতে এ-সুরে কেউ কোনদিন বল্‌তো না। দশ বছরের মেয়ের মুখে এই কথা শুনে হরিনাথবাবু এত খুসী হ'য়ে গেলেন যে, তাকে তক্ষুনি পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলেন। তাহার সাতদিন পর তিনি খোঁজ ক'রে জানলেন যে, গীতা সে পাঁচ টাকার পাঁচ পয়সাও খরচ করে নি। ভারী খুসী হয়ে গীতাকে গোপনে ডেকে বল্‌লেন, "বেশ মা বেশ! এই তো চাই। মেয়েছেলে ঘরের লক্ষী। তারা যদি গুছিয়ে খরচ না করে তবে সংসার উচ্ছন্নে যায়। এই কথাটা চিরদিন মনে রাখিস্।"

গীতার স্বাভাবিক ব্যয়কুণ্ঠতা জ্যাঠাম'শাইর কাছে এই উৎসাহ পেয়ে আরও বেড়ে গেল! জ্যাঠাম'শাইর এই গোপন প্রশংসা আরও পাবার জন্য সে

লালাইত হয়ে উঠল। তার ফলে সে হ'য়ে উঠল রীতিমত গোছালো হিসাবী মেয়ে। অনেক দিন এমন হয়েছে যে জ্যাঠাইমা তাকে একটা সখের জিনিষ কিনে দিতে চেয়েছেন তাতে সে বলেছে, "আমার তো দরকার নেই জ্যাঠাইমা। কেন মিথ্যা টাকা খরচ করছেন।" ঐ কথায় জ্যাঠাইমার কাছে সে পুরস্কার পেত না, পেত তিরস্কার।

যখন তার বিয়ে হয় নি, তখন সে বিকাশের অতিব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে ব্যয়সঙ্কোচের পরামর্শ দিত এবং প্রত্যুত্তরে শুনত তার জ্যাঠামি বা ডেঁপোমির নিন্দা।

বিয়ের পর যখন সে দেখত বিকাশ রাশি রাশি টাকা এনে দিচ্ছে, আর অন্নপূর্ণা সেগুলো তছনছ ক'রে খরচ করছেন আর তা' দূরসম্পর্কের রাজ্যের লোককে বিলিয়ে দিচ্ছেন, তখন তার চোখ টাটাত। কিন্তু বিকাশ তাকে অনেকদিন আগে যে তিরস্কার করেছিল, তাতে সে অনেকদিন এ-সম্বন্ধে কথা কইতে সাহস পায় নি।

একদিন যখন বিকাশই জ্যাঠাইমার কথায় বিরক্ত হয়ে গোমড়া মুখে ঘরে এলো, তখন সে বলেছিল, "জ্যাঠাইমাকে খুসী করবে তুমি? সে ক্ষমতা তোমার নেই। এমন যদি চলে, তবে উনিও খুসী হবেন না, তুমিও ভুগবে।" নিজের মনের গোপন কথা এমনি করে গীতার মুখে শুনে বিকাশ অমনি চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে হঠাৎ মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, "খবরদার গীতা, বলেছি তোমাকে অমন কথা তুমি আমাকে বল্‌বে না।"

কাজেই গীতা দেখলে যে বন্যার স্রোতে যখন সবই ভেসে যেতে বসেছে, তখন নিজের গোপন বুদ্ধি খাটিয়ে সে এথেকে যা রক্ষে করতে পারে, তারই চেষ্টা করতে হবে।

একটা সুবিধে ছিল এই যে, মাসিমা টাকাকড়ি নিজে রাখতেন না, রাখতে দিতেন গীতাকে। যখন যা দরকার হত, তা' গীতাকেই দিতে বল্‌তেন। কিন্তু কি যে এলো, কি যে গেল তার হিসেব রাখবার ইচ্ছেও ছিল না তাঁর, শক্তিও

ছিল না। কেন না লেখাপড়া তিনি মোটেই জানতেন না। আর সাধারণ বাজারের হিসেবটা করতে গেলেও তাঁর মাথা যেত গরম হয়ে।

কিন্তু গীতা তাঁর টাকা চুরি করত না। সে শুধু নানারকম খরচের ফন্দী বের করত যাতে টাকাটা বারোভূতের ভোগে না লেগে, হয় কোন স্থায়ী জিনিষ কেনা, কিম্বা নিজেদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে খরচ হয়। সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকত এমন সব খরচ উদ্ভাবন করতে। গয়না, কাপড়চোপড়, এবং ক্রমে মোটর গাড়ী, আসবাবপত্র, এবং তারও পরে আস্তে আস্তে জমি, বাড়ী কেনবার নানারকম প্রস্তাব সে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখত, যাতে টাকা আসবার সঙ্গে সঙ্গে, চাইকি তার কিছুদিন আগে থেকেই তার মোটা অংশ খরচের ব্যবস্থা হয়ে থাকত। এসব খরচ সে নিজে হাতে কখনো করত না। শুধু মাসিমার কাছে প্রস্তাব করত, কিম্বা আব্দার করে চাইত। জানত যে, খরচের কোন প্রস্তাব হলে, তাতে না বলবার শক্তি বা ইচ্ছা মাসিমার কখনও হবে না। প্রস্তাবিত খরচের জন্য টাকা আছে কিনা কিম্বা টাকা পাওয়া যাবে কিনা, সে দুর্ভাবনা তাঁকে কখনও ব্যস্ত করত না।

গীতার এই চক্রান্তের ফলেই অধিকাংশ সময়ে মাসিমাকে শুনতে হত যে টাকা ফুরিয়ে গেছে। তখন তিনি চাইতেন বিকাশের কাছে। আর বিকাশের হত গলদঘর্ম্ম।

গীতার এই চালের ফল হল ভালই। এতে করে ক্রমে বিকাশের কলকাতার কতকগুলো জমি কেনা হয়ে গেল। আর boom-এর হিড়িকে জমি বেচাকেনা করে তার লাভও হল বিস্তর। কিন্তু তাতে তার হাতে নগদ টাকার বাহুল্য রইল না। বরং ধারের বোঝা বেড়ে গেল। জমি কিনতে প্রায়ই হাতের টাকা ছাড়াও ধার করতে হত। Improvement Trust-এর জমির দাম কিস্তি কিস্তি দিতে হত। ধারের সুদ টানতে হত। আর জমি থেকে উপস্থিত লাভ কমই হত, লাভ হত শুধু যখন তাকে চড়া দামে বেচা যেত। জমি থেকে আয় করবার জন্য তার পেছনে খরচ করতে হয়, বাড়ী করতে হয়, তাতেও দেনা

বেড়ে যায়। এমনি করে বিকাশের সম্পদ্ যতই বেড়ে গেল, তার ব্যয়ও তেমনি বাড়ল। আর সেই দেনার টাকা চালাবার জন্ত তার সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে টাকার সন্ধানে ঘুরতে হত।

গীতা সবই মাসিমাকে বলেই করাত, আর বিকাশের সব খরচই হত মাসিমার আদেশে। গীতার কথায় তিনি এসব আদেশ দেন খুব আনন্দ করেই। তাঁর এই সব খরচে যে তাঁর বাজে খরচের উপর টান পড়তে পারে, সে হিসাব করবার মত শক্তি বা প্রবৃত্তি তাঁর কোনদিন ছিল না।

কিন্তু টান পড়তেই হল। ক্রমে যখনই মাসিমা কাউকে দেবার জন্ত, বা কোন বাজে খরচের জন্ত একশো দুশো টাকা চাইতেন, তখনই গীতা শুকনো মুখে এসে বল্‌ত সম্পূর্ণ সত্য কথা, "টাকা তো নেই জ্যাঠাইমা।"

মাসিমা সবিস্ময়ে হয়ত বল্‌তেন, "সেকি, এই সেদিন যে বিকাশ হাজার টাকা এনে দিল।"

গীতা বলে, "সেতো আজ পনেরো দিন হল, আর তা থেকে চুণের দাম দেওয়া হল একশো টাকা, স্যাকরাকে দিলে দুশো টাকা, আর—"

মুখে মুখে হাজার টাকার হিসাব বলে দেয়। মাসিমা চান টাকা, গীতা শুনায় হিসাব। কি গেরো! হিসেবে তো পেট ভরে না।

বিরক্ত হয়ে মাসিমা বিকাশকে বলেন, "পাঁচশো টাকা চাই বিকাশ।"

বিকাশ বলে, "পাঁচশো টাকা! এখন তো পাওয়া যাবে না মাসিমা! আপনার কাছে আর নেই?"

"কোত্থেকে থাকবে? যা এনে দিয়েছিস্ তা থেকে চুণের দাম আর কি কি সব দেওয়া হয়েছে, ওই গীতার কাছে শোন না হিসেব।"

"থাক্ মাসিমা, আপনাকে টাকা দিয়ে তার হিসেব নেব আমি?"

সেদিন সে চেষ্টাচরিত্র করে আড়াইশো টাকা এনে দিল। বল্‌লে, "আর পাবার উপায় নেই মাসিমা। এখন এই দিয়েই চালাতে হবে।"

হাত পেতে নিলেন তিনি টাকা অপ্রসন্নভাবে, ভ্রূকুঞ্চিত করে। ভাবলেন,

হায়রে, স্বামী তাঁকে দিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা নামের যে গৌরব ও সার্থকতা, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেকি এমনি করে গেল!

সমস্ত ব্যাপার সমগ্রভাবে হিসাব কর্‌লে গীতার কাজে দোষ ধর্‌বার কিছু হেতু ছিল না। বেহিসাবী অপব্যয় সে দেখতে পারে না, কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ সে নয়। মাসিমা, কমলা, অমল ও শ্যামলীর আরামের জন্য সে আবশ্যকের অতিরিক্ত খরচে কখনই পরাঙ্মুখ হয় না। মাসিমার সেবায় সে অশেষ যত্ন নেয়, তাঁর সুখ ও আরামের জন্য সে সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এবং মাসিমার ব্যবহারের কোনও জিনিষ দরকার হবার আগে সে তার জোগাড় ক'রে রাখে।

কমলার কোনও কিছুরই দরকার নেই, কিন্তু যা' দরকার নেই এমন রাশি রাশি জিনিষ গীতা কমলাকে জোগায়—অর্থাৎ সেই সব জোগাবার কথা সে প্রস্তাব করে মাসিমার কাছে আর তাঁর সম্মতি নিয়ে তাই আনিয়ে দেয়। অমল ও শ্যামলীর কাপড়-চোপড় আগের চেয়ে বেশী সুন্দর। স্কুলে তারা পড়ে। তার উপর গীতাই প্রস্তাব ক'রে তাদের জন্য ভাল একজন গৃহ-শিক্ষক রেখে দিয়েছে। অমলের খেলায় সে উৎসাহ দেয় আর তার হকিষ্টিক্, টেনিস-র‍্যাকেট, ক্রিকেটের ব্যাট সবই খুব উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্। যাতে সে খেলায় তার মামার নাম রাখতে পারে তাতে গীতার যত্নের অবধি নেই।

শ্যামলীর বারো বৎসর বয়স হয়েছে, গীতা তাই তার বিয়ের কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছে। মাসিমাকে সে বল্‌লে, "শ্যামলীর কিছু গয়না গড়িয়ে রাখা দরকার।" অনুমতি পেতে দেরী হ'ল না। দেখতে দেখতে তার জমে গেল প্রায় হাজার টাকার গয়না। তার পর একদিন সে মাসিমাকে বল্‌লে, "একটা কাজ করবেন মাসিমা?"

"কী কাজ?"

"এই শ্যামলীর বিয়ের জন্যে কিছু টাকা,—আমি বলি কি, দিদির নামে মাসে মাসে কিছু কোম্পানীর কাগজ কিনে রাখলে কেমন হয়? ওর বিয়ের সময়

আমাদের এমনি সুদিন যে থাকবে, কে জানে? যদি কোম্পানীর কাগজ থাকে তবে দিদি তাই থেকে খরচ ক'রে ওর বিয়ে দিতে পারবেন।"

এ যুক্তি মাসিমার মনঃপূত হ'ল সে বলাই বাহুল্য। বিকাশও আদেশ পেলো। কয়েক দিনের মধ্যে হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ নিয়ে গীতা কমলাকে দিয়ে বললে, "দিদি তোমার ভাই তোমাকে এইটা দিতে বললেন।"

ম্লান হাসি হেসে কমলা বললে, "ও দিয়ে আমি কি করবো ভাই?—তুমি নাও।"

"না দিদি, উনি বললেন, 'শ্যামলীর বিয়ের জন্যে এখন থেকে কিছু কিছু না জমালে'—"

"তা' বেশ, তোর কাছেই জমিয়ে রেখে দে।"

আবদারের সুরে গীতা বললে, "কেন দিদি, তুমি নেবে না আমাদের কাছে কিছু?"

"কেন নেব না? সবই তো নিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে সব খরচই তো তোমাদের ভাই! বাপের কাছে যা' পেয়েছি তার চেয়ে তোদের কাছে কম নিচ্ছি কি?"

তারপর একটু থেমে সজল নয়নে সে বললে, "টাকা-কড়ি আমায় দিতে আসিস নে ভাই—টাকা ব'লে যে কিছু আছে জগতে সেটা আমি ভুলতে চাই। —টাকা! আমার অভাব কি তার? পোড়া অদৃষ্টে ভোগ নেই তাই তিনি গেছেন, আর শশুর আমার দিকে ফিরে চান না।"

গীতা তাড়াতাড়ি ব'ল্লে, "মাপ ক'রো দিদি, আর আমি তোমায় টাকা দিতে আসবো না।" ব'লে সে পালিয়ে গেল।

যাকে সে ন্যায্য খরচ মনে করে তাতে গীতার কুণ্ঠা নেই, কিন্তু মাসিমার রাজ্যের আত্মীয় কুটুম্বের জন্য দশ বিশ টাকা খরচ দেখলেও তার গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর এই দশ বিশগুলো যোগ ক'রলে যে কত বড় অঙ্ক হয়, তা'

তার জানা আছে। তাই সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকে; যাতে মাসিমার হাতে টাকা না জমতে পায়, সেজন্য সে অতিমাত্র ব্যস্ত।

এই ব্যস্ততা মাসিমা ও কমলা একেবারে না বুঝতে পারেন, এমন নয়, কিন্তু তা নিয়ে কোনও কথা অনেক দিন হয় নি। কিন্তু একদিন গীতা হঠাৎ একটু সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়ে গোলযোগ বাধালে।

বিকাশ সেদিন এক হাজার টাকা এনে মাসিমাকে দিলে, এবং মাসিমা, অভ্যাস অনুযায়ী সেটা গীতাকে রাখতে দিলেন।

টাকাটা হাতে ক'রেই—গীতা ব'ল্লে, "আর পাঁচ দিন বাদে বালীগঞ্জের জমিটার কিস্তি দিতে হবে যে। এ টাকাটা তার জন্যে থাক। কি বল জ্যাঠাই মা?"

বালীগঞ্জের জমির কিস্তির টাকা দিতে হবে সত্যি, কিন্তু টাকাটা মাসিমার হাতে প'ড়তেই এই কথা তুলে টাকাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা যেন অতিরিক্ত রূঢ়তার সহিত প্রকাশ হ'য়ে প'ড়লো।

মাসিমা এমন একটা ক্লিষ্ট কাতর দৃষ্টিতে গীতার দিকে চেয়ে বললেন, "হাঁ তাই থাক", যে বিকাশের অন্তর একেবারে চিরে গেল। কমলাও তরকারী কুট্‌তে কুট্‌তে একবার একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ক'রলে গীতার দিকে—শুধু এক মুহূর্ত্ত।

বিকাশ তাড়াতাড়ি বললে, "সে টাকার জোগাড় আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ক'রবো, এ টাকা শুধু আপনার হাতখরচের জন্য মাসিমা।"

মাসিমা ম্লান হাসি হেসে ব'ললেন, "না বাবা, দেনা ফেলে রেখে খরচের দরকার নেই, কিস্তির টাকা দিয়ে দে তারপর আমাকে যা পারিস দিস্। ও টাকাটা আলাদা ক'রেই রেখে দিস্ গীতা।"

বিকাশ চোখ গরম ক'রে একবার চাইলে শুধু গীতার দিকে, তারপর সে চ'লে গেল নিঃশব্দে।

গীতারও মনে হ'ল ব্যাপারটা অত্যন্ত বিসদৃশ হ'য়ে গেছে। এখন মনে

প'ড়ল যে কালই মাসিমা গীতাকে ব'লেছিলেন যে মাসিমার এক খুড়তুত বোন বিনোদিনী বিধবা হ'য়ে ছেলেপিলে নিয়ে ভারী কষ্টে প'ড়েছে, এবার কিছু টাকা পেলে দুশো' টাকা তাকে পাঠাতে হবে। গীতার সে কথা মনে ছিল না কথাটা বলবার সময়; এবং এখন তার মনে হ'ল যে তার এই বাড়ীর কিস্তীর কথাটা যেন ঠিক মাসিমার সেই প্রস্তাবের পাল্টা জবাব দাঁড়িয়ে গেল।

সে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠে গেল।

তারপর তখনি সে গোপনে মাসিমার সেই খুড়তুত বোনকে দুইশো টাকা মণি অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিলে মাসিমার নামে।

কিন্তু যে আগুনের ফুলকী তার মুখ থেকে হঠাৎ ছিটকে প'ড়েছিল এতেই তা নির্ব্বাণ হ'ল না।

বিকাশ সে দিন গীতাকে যখন একা পেলো, তখন সে কথাটা তুললে। সে যদি শুধু কথাটা তুলে ব'লতো গীতার এটা অন্যায় হ'য়ে গেছে, তবে গীতা অনুতপ্তভাবে তার ত্রুটি স্বীকার ক'রতো,—সব মিটে যেতো। কিন্তু "ভালো মানুষ" বিকাশের নিবদ্ধ বোঝা আজ ছাড়া পেয়েছে। সে একেবারেই ব'লে বসলো, "মাসিমার হাতে টাকা দিতে দেখলে তোমার গায়ে ফোস্কা পড়েনা?—এমন ভাব মনে ক'রতেও লজ্জা হয় না তোমার? যার থেকে তোমার আমার সব, তাকে দুটো টাকা দিতে এত সঙ্কোচ!—কী অকৃতজ্ঞ তুমি! কী ছোটলোক!"

এত বিশ্রী গালাগালি গীতা সইতে পারলে না। সে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। তীব্র কণ্ঠে সে বললে, "আমি ছোটলোক! বটে! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। তোমার টাকা বারভূতে মিলে তছনছ ক'রবে তাতে 'কিন্তু' বললেই আমি হ'লাম ছোটলোক! এত যদি বাদশাই মেজাজ তোমার তবে জেনে শুনে এ ছোটলোককে বে ক'রেছিলে কেন? ওরা তোমার সব উড়িয়ে পুড়িয়ে খাবে, ভিটেয় ঘুঘু চরাবে তবু ওরা তোমার প্রাণের বন্ধু হবে, আর আমি আর আমার ছেলেপিলেরা মালা হাতে ভেসে বেড়াব এই যদি চেয়েছিলে

তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন? 'ছোটলোক'!—একেবারে দিল্লীর বাদশা এসেছেন।"

ব'লে সে মুহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে সিন্দুক খুলে একটি একটি ক'রে গয়না, দামী কাপড়-চোপড় প্রভৃতি সব ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো, বললে, "নাও, এ সব নিয়ে যাও. বেচে কিনে দাও গে যারা তোমার আপন জন—তোমারই মত যারা বড় লোক, তাদের—ছোটলোকের এ-সবে কোনও দরকার নেই—"

এই অবিশ্রান্ত বাগ্‌ধারা ও কর্ম্মস্রোত বিকাশকে একেবারে হতভম্ব ক'রে দিলে। একেবারে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে পলায়ন ছাড়া সে অন্য পথ খুঁজে পেলো না।

এত বড় একটা কাণ্ড মাসিমার কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। ঝগড়াটা যে তাঁকে বিকাশের টাকা দেওয়া নিয়ে এই মোটা কথাটাও তিনি শুনলেন।

এরপর একদিন অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে তিনি বললেন, "বিকাশ, তুই এতই তো ক'রছিস আমার, আমার আর একটা কাজ ক'রবি?"

"হুকুম করুন মাসিমা।"

'আমার কাশীবাসের একটা ব্যবস্থা ক'রে দে।—আর কমলা—"

বেত্রাহতের মত বিকাশ উঠে বললে, "আমি আজই আপনার নামে কাশীতে বাড়ী কেনবার কথা লিখে দিচ্ছি, কিন্তু এখন যদি কাশী যেতে চান আপনি তবে আমার মৃতদেহ দেখে যেতে হবে। যাবার আগের দিন আমি বিষ খাব।"

"ষাট্, ষাট্!—অমন পাগলের কথা বলে না—বুড়ো বয়সে কাশীবাসে বাধা দিতে নেই।"

"বাধা তো দিচ্ছি নে, শুধু আমাকে জ্যান্ত রেখে যেতে পারবেন না তাই ব'লছি।"

গীতাও সাশ্রুনয়নে তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে ভয়ানক কান্নাকাটি ক'রলে।

কাশী যাওয়া বন্ধ হ'ল। কিন্তু মাসিমার লোককে দেওয়া থোয়াও বন্ধ হ'ল।

এরপর মাসিমা তাঁর সেই খুড়তুতো বোন বিনোদিনীর চিঠি পেলেন, সে টাকা পেয়ে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছে।

মাসিমা গীতাকে বললেন, "এ কী, বিনিকে টাকা তো পাঠান হয় নি, তবে সে এ কথা লেখে কেন?"

"না জ্যাঠাই-মা টাকা তো আমি সেই দিনই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বিস্মিত হ'য়ে জ্যাঠাই-মা বললেন, "কেন পাঠাতে গেলে?"

"সে কি জ্যাঠাই-মা? আপনি যে আমাকে আগের দিন বলেছিলেন, দুশো' টাকা পাঠাতে হবে। যখন সে হাজার টাকা এনে দিলে তখন মনে ছিল না। একটু পরে মনে হ'তেই আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

মাসিমা শুধু বললেন, "বেশ ক'রেছ মা।"

কিন্তু মনের মেঘ এতে কাটলো না।

## ষোল

গীতার উপর 'বারো ভূতের' উপদ্রব যেন হঠাৎ মিটে গেল।

একটি ছেলে হ'তে গীতার অনেক কষ্ট হ'য়েছিল। এমন সময় হ'য়েছিল যে ডাক্তারেরা ভয় পেলেন বুঝিবা রক্ষা হয় না! প্রসবের পরও অনেকদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কেটেছিল।

এই সময় দিবারাত্রি বিনিদ্র সেবা ও উদ্বিগ্নতার ফলে মাসিমা প'ড়লেন শুয়ে। অসুখটা সামান্যই, কিন্তু দুদিন না যেতে যেতে হঠাৎ হ'য়ে উঠলো ভীষণ।

মাসিমা তাঁর সব দুঃখ কষ্ট অভিমান, সব স্নেহ করুণার যাতনা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন।

বিকাশের হঠাৎ সংসারটা ভারী শূন্য বোধ হ'ল। তার এত দিনকার জীবনে বরাবরই মাসিমার ছিল একটা মস্ত বড় স্থান, আর মেসোমশায় তাকে নিঃস্ব রেখে মারা যাবার পর তিনি হ'য়ে পড়েছিলেন বিকাশের জীবনের কেন্দ্র। যা' কিছু ক'রেছে, যা কিছু ভেবেছে সে, সবই মাসিমাকে কেন্দ্র ক'রে। মেসোমশায় তাঁকে যে রকম রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি অবস্থায় তাঁকে রাখা, তাঁর গায় অভাবের অনুভূতির ছায়া মাত্র স্পর্শ নিবারণ, এ কয় বৎসর তাই ছিল বিকাশের একান্ত সাধনা। সে সাধনায় সে যে সফলতা লাভ ক'রতে পেরেছে এতদূর, সে কেবল তার অপূর্ব্ব ভাগ্যবলে। তাতে সে তৃপ্তি পেয়েছে কিন্তু শেষের কিছুদিন যে গীতার সঙ্কীর্ণতা ও অবিবেচনার ফলে তিনি মনে ব্যথা পেয়ে গেছেন, এই কথা ভেবে যেমন হ'ল বিকাশের মনে ব্যথা, তেমনি হ'ল তার গীতার উপর অশ্রদ্ধা।

এতদিন মাসিমাকেই সে তার সব টাকা এনে দিয়েছে—আজ তিনি গেছেন, কাকে টাকা দেবে সে।

এ নিয়ে সে সামস্তায় প'ড়লো। মাসিমা গেছেন কিন্তু কমলা আছে। কমলাও বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ। অবস্থার বিপাকে তার আজ বিকাশের আশ্রয়ে থাকতে হ'চ্ছে। মাসিমা ছিলেন গৃহের কর্ত্রী হ'য়ে, তখন এ কথা ভাবতে হয়নি, কিন্তু এখন যদি গীতা কর্ত্রী হ'য়ে বসে, তবে কমলার মনে আসতে পারে একটা পরাধীনতার গ্লানি।

তাই বিকাশ স্থির ক'রলে, যে এখন টাকা কড়ি সে দেবে কমলাকে।

গীতার সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা সে আবশ্যক মনে ক'রেনি, আর ব'লতে কি গীতার কাছে এ কথা ব'লতে সে সাহসও সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারে নি।

এর পর প্রথম যেদিন টাকা এলো, সে তা নিয়ে গেল কমলার কাছে। কমলা তার শান্ত ম্লান হাসি হেসে বললে, "আমাকে ওসবে জড়িও না ভাই। যার ভাগ্যে তোমার এখন তাকেই দাও গে। গীতাকে দাও।"

বিকাশ বললে, "ও ছেলেমানুষ, ও পারবে না সংসারের ভার নিতে। তোমারই নিতে হবে।

"আমি? আমি এ সংসারের জাহাজের দু'দিনের প্যাসেঞ্জার। সে দু'দিন শুধু হেসে খেলে বেড়িয়ে যাব। হাল ধ'রবে সেই যে এতে চিরদিন থাকবে।"

বিকাশ কিছুতেই ছাড়লে না। হাতে ক'রে টাকাটা নিয়ে কমলা গীতাকে বললে, "রেখে দে ভাই।"

গীতা দাঁড়িয়ে অভিমানে ফুলছিল। জ্যাঠাইমা যতদিন ছিলেন ততদিন তাঁকে টাকা দেওয়া বরং বোঝা যেতো কিন্তু আজ জ্যাঠাইমা নেই, আজও টাকাটা দিতে হবে গীতাকে নয়—দিদিকে—কেন না—সেদিনের কথা মনে প'ড়লো—সে ছোটলোক! তাই সে বললে, "না দিদি, তোমাকে দিয়েছে, তুমিই রেখে দাও।" বলে ঠোঁট ফুলিয়ে সে চলে গেল। কমলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে টাকা কয়টা নিজের বাক্সেই তুলে রাখলো।

এই নিয়েও সে দিন রাত্রে বিকাশের সঙ্গে গীতার বেশ একটু ঝগড়া হয়ে গেল।

বিকাশই কথাটা তুল্‌লে। সে গীতার অভিমানটা লক্ষ্য করছিলো। আজ সে না বলে পারলে না, "গীতা, মিছে কেন তুমি এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে দুঃখ কর? সবই তো তোমার, কিন্তু যারা এত বড় সম্পদ্ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে, আজ দুর্দ্দিনে তাদেরকে তোমার টাকা পয়সা একটু নাড়বার চাড়বার সুযোগ দিয়ে একটু যদি আনন্দ দিতে পার. তাতে দোষ কি?"

ক্রুদ্ধ অভিমান এতক্ষণে অশ্রুজলে ফেটে বেরোল, সে উগ্র কণ্ঠে বললে, "ওদের সেবা, ওদেরই দাসত্ব চিরদিন করবে তুমি, এই যদি মনে ছিল তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন? বিয়ে না করলে আজ তোমার দয়া যে পরিমাণ দিদি পাচ্ছে, তারই কতকটা ভাগ হয়ত আমিও পেতাম, কিন্তু বিয়ে করেছ বলেই আমার প্রতি তোমার কোন কর্ত্তব্যই নেই, কেমন?"

গীতাকে আদর করে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে

বিকাশ। কিন্তু সে ছিটকে বেরিয়ে গেল, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিকাশ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, এ কি বিষম সমস্যা? গীতাকে সে ভালবাসে, তাকে সুখী করবার চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা তার কিছুই নেই, কিন্তু মেসোমশায়ের পরিবারের প্রতি তার যে কর্ত্তব্য, সে কল্পনা করে নিয়ে ছিল তাকেও সে এই ভালবাসার চেয়ে ছোট করে দেখতে কিছুতেই পারে না। গীতা কি কোনদিনই বুঝবে না এ মনের কথা। তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একপ্রাণ হয়ে তার কর্ত্তব্য পালন সহজ করে দেবে না?

খানিক পরে গীতা আবার বললে, "আমি না হয় তোমার কেউ নই, অসহায় অনাথাকে শুধু দয়া করে তুমি বিয়ে করেছ, কিন্তু ছেলেটাও কি কেউ নয় তোমার? এর কথাও কি একবার ভাব না? জ্যাঠাইমাকে তুমি যা করতে সে বুঝতে পারি, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের গুষ্ঠীর যে যেখানে আছে, সবারই খোস খেয়াল মেটাবার জন্য তোমার ছেলেটাকেও তুমি ভাসিয়ে দেবে?"

বিকাশ অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলে। আদর করে অভিমান জয় করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সকলই নিষ্ফল হল। আজকের এই সামান্য কয়েক শ' টাকা নিয়ে গীতার উৎপীড়িত অন্তরের সকল রুদ্ধ ব্যথা আজ অনিবার্য্যরূপে মুখর হয়ে উঠেছে। শেষে হতাশ হয়ে হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিকাশ। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে কি সে কোন দিন?

সে হয়ত খুঁজে পেত না, কিন্তু যে শুভাদৃষ্ট তাকে পদে পদে আপদ থেকে উদ্ধার করছে, সেই এসে করে দিলে এ সমস্যার অনবদ্য সমাধান।

কমলার শ্বশুর ছিলেন কলকাতার একজন প্রকাণ্ড ধনী, কমলা তাঁর বড় ছেলের বউ। কমলার স্বামী পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে চাকরী নিয়ে চলে গিয়েছিল বাইরে। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে ছিল। খুব ভাল চাকরী

পেয়ে ছিল কমলার স্বামী, কাজেই পিতা যে এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, তাতে তারা ভয়ও পায়নি, কুণ্ঠিতও হয়নি।

কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে হঠাৎ কমলার স্বামী মারা গেল। শ্বশুর বিদ্রোহিণী পুত্রবধূকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কমলা পিতৃগৃহে আশ্রয় পেল।

যখন হঠাৎ হরিনাথবাবু মারা গেলেন, এবং দেখা গেল যে, তিনি তাঁর পরিবারকে ভাসিয়ে গেছেন দারিদ্র্যের সাগরে, তখন কমলা প্রথম চম্‌কে উঠল এই ভেবে যে এখন সে দাঁড়াবে কোথায়? বড়লোক বাপ ও বড়লোক শ্বশুর দুইয়ের আশ্রয়চ্যুত হয়ে বিকাশের গলগ্রহ হবার কল্পনায় তার মনে এসেছিল দ্বিধা ও শঙ্কা। কিন্তু বিকাশ তার উদার সহৃদয়তায় ক্রমে ক্রমে কমলার অন্তরের সংশয় মুছে ফেলেছিলো। কেন না, বিকাশ কমলার মাকেই রেখেছিলো সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ক'রে।

এখন মার মৃত্যুতে তার মনে ভাববার নতুন ক'রে শঙ্কা ও সঙ্কোচ জেগে উঠল। কমলা শান্ত, স্থির ও নির্ব্বিরোধী। কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, কিন্তু গীতার অন্তরে তাদের প্রতি যে বিরোধটা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে, তা' সে না বুঝে পারেনি। যখন বিকাশ মায়ের মৃত্যুর পর মাইনের টাকা এনে দিলে কমলাকে, তখন গীতার এ বিরুদ্ধতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল কমলার চোখে। সে নিভৃতে নীরবে অশ্রুত্যাগ করলো, ভাবতে লাগলো, এত আশা, এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তার জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, সে-কি অবশেষে গীতার অশ্রদ্ধার অন্নে পরিপুষ্ট হয়ে জীবন ধারণে পরিণতি লাভ করবার জন্য!

এই ঘটনার পরদিন কমলা সংবাদ পেল যে, তাঁর ধনকুবের শ্বশুর মৃত্যুমুখে।

সে ভাবলে, আজ মরণের সম্মুখে দাঁড়িয়েও কি শ্বশুর তার স্বামীকে ক্ষমা করবেন না? মৃত্যুশয্যার পাশেও কি তাকে ডেকে নেবেন না। প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশা করতে লাগল—হয় ত' বা শ্বশুরের দয়া হয়েছে, হয় ত' এখুনি আসবে তাকে নিতে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হ'ল না।

কমলা সংবাদ পেল যে, শ্বশুর মরবার আগে যে উইল করেছেন, তাতেও তার জন্য এক কপর্দ্দকও সংস্থান নেই।

হতাশ হয়ে সে শুয়ে পড়ল।

তিন দিন পর বিকাশ এসে বললে "দিদি তোমার দেওর এসেছে।"

বিছানায় শুয়ে কমলা অশ্রুত্যাগ করছিলো, কথাটা শুনে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো ; তার সেজ দেওর এসে তাকে প্রণাম ক'রে বললে, "বৌদি তোমাকে বাড়ী নিতে এসেছি।"

অশ্রুর বন্যা ছুটিয়ে দিয়ে কমলা বললে, "এতদিনে অভাগীকে মনে পড়ল ভাই ?"

তার দেওর বললে, "আমাদের অপরাধ নিও না বৌদি, আমরা সব কটী ভাই কতবার যে বাবার পায়ে ধরে সেধেছি, তাঁ'কে টলাতে পারি নি। আজ তিনি নেই। এখন আপনার ঘরে তুমি চল।"

যাবার জন্য উঠতে গিয়ে কমলা আবার বসে পড়ল। চোখের জল মুছে সে বল্লে, "কেমন করে যাব ভাই ? আমি যে এখানে আটকে পড়েছি।"

দেওর বল্লে, "কিসে ?"

"দিদি যে আমায় দু'টী ছেলে মেয়ে দিয়ে গেছেন, তাদের ছেড়ে কেমন ক'রে যাব ?"

"কেন ছেড়ে যাবে ? তোমার সে ছেলেমেয়ের খবর আমরা জানি। তাদের ছাড়া তোমাকে নিতে আসিনি।"

কাঁদতে কাঁদতে কমলার মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে বললে, "না, বলবে কেন তোমরা এ কথা ? তোমরা যে তোমাদের দাদার ভাই।"

এমনি ক'রে বিকাশের সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল। গীতারও মনের কাঁটা উঠে গেল !

## সন্তের

পাঁচ বছর পর বিকাশের চাকরী-কন্ট্রাক্ট নতুন করবার সময় এলে তার মাইনে বাড়ানো হ'লনা, ঠিক পূর্ব্বেকার স্কেলেই আর পাঁচ বছরের জন্য চাকরী দেওয়া হল। এ নিয়ে তার মুরুব্বি ছোট সাহেব ম্যাক্‌রের সঙ্গে বড় সাহেবের একটু ঠোকাঠুকি হল। ম্যাকরের সঙ্গে বড় সাহেবের কিছুদিন হল বনিবনাও হচ্ছিল না এবং তাই নিয়ে উভয় পক্ষে বিলেতে লেখালেখি চলছিল। এমনি মন-কষাকষি অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে ম্যাক্‌রে বড় সাহেবের এবং বড় সাহেব ম্যাক্‌রের অনবরত ত্রুটীর সন্ধান করতে লাগলেন। ম্যাক্‌রের এই সব আবিষ্কৃত ত্রুটীর মধ্যে একটা হল বিকাশের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব, বিকাশ খেলোয়াড় বলে ম্যাক্‌রে তাকে অন্যায় রকম প্রশ্রয় ও সুবিধা দেন, বড় সাহেব এ কথা বললেন। ম্যাক্‌রে তাতে হাড়ে-হাড়ে জ্বলে গেলেন। কেননা, তার মতে-বিকাশের মত উপযুক্ত কর্ম্মচারী তাঁদের বেশী নেই। ফার্ম্মের হাজার টাকা মাইনের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের চেয়ে বিকাশ ঢের ভাল কাজ করে। বড়সাহেব যখন বিকাশকে বেতন বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করলেন, তখন ম্যাকরেও বেশ তীব্র ভাবেই প্রতিবাদ করেছিলেন। তাতে বিশেষ ফল হল এই যে, বড়সাহেব বিকাশকে ম্যাক্‌রের অধীনস্থ পাট-রপ্তানী বিভাগ থেকে বদলী করে দিলেন অন্য একটা কারবারে।

এর কিছুদিন পর বিকাশ খবর পেল, তাদের আপিসে পাটের ব্যবসার সব হোমরা-চোমরা সাহেবদের ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে। বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে, তার সন্ধান সে পেলে না।

এদিকে পাটের বাজারে হাহাকার লেগে গেছে। পাটের দর এত কমে গেছে যে, চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। মহাজনেরাও ভবিষ্যত অন্ধকার দেখছেন, বিকাশের ফাটকা বাজারে কিছু পাট কেনা ছিল। বাজারের অবস্থা দেখে সেও শঙ্কিত হল।

এমন সময় একদিন ম্যাক্রে আফিস থেকে বের হবার সময় বিকাশকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলেন। গাড়ীতে বসে তিনে বিকাশকে বললেন, "আমি এখানকার কাজে ইস্তফা দিয়েছি। বিলেতে চলে যাচ্ছি। কালই ক'লকাতা ছাড়ব।"

বিকাশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন স্যার ?"

উগ্র কণ্ঠে ম্যাক্রে বললে, "ওই swine ( অর্থাৎ বড়সাহেব ), ওটার সঙ্গে কাজ আমি করবনা। ওটা পিশাচ। ও শুধু চায় তোমাদের দেশী লোকেদের রক্ত শুষে খেতে। আমি তা পারিনা।"

বিকাশ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলে। ম্যাক্রে তার শুধু মুরুব্বি নন বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। তাই সে সত্য সত্যই দুঃখিত হ'ল।

তারপর ম্যাক্রে তাকে বললেন, "তোমাকে যার জন্য ডেকে এনেছি শোন, তুমি কালই চাকরীতে ইস্তফা দাও। বেরিয়ে যাও পূর্ব্ব বাঙ্গালায়। যত পাট পাও কিনে ফেল, একথা ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করো না।"

বিকাশ অবাক হয়ে বললে, "পাটের বাজার যে বড় খারাপ স্যার।"

"সেই জন্যেই বল্‌ছি। এখনি কেনবার সময়। সাতদিন পর আর সময় হয়তো পাবেনা। আর কিছু জিজ্ঞেস করোনা আমাকে। যা বল্‌ছি তাই কর।"

বিকাশ অনুমান করলে যে এ কয়দিন পাটের বড় সাহেবদের যে সব বৈঠক হয়েছে, সে এইজন্য। কোন একটা গোপন খবর এসেছে, সেটা বাজারে প্রকাশ হবার আগে কি করে মহাজনদের মেরে এঁরা মোটা টাকা লাভ করতে পারবেন, সেই ফন্দী হচ্ছিল। তাই সে পরের দিন চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা করে ফেলল। আর নিজে যতীনবাবুকে নিয়ে চলে গেল বাইরে, এবং বিস্তর পাট কিনে ফেল্‌ল যতীনবাবুর সঙ্গে ভাগে।

সেবারে সেই পাট বেচে ও ফাটকার বাজারে কাজ করে বিকাশের নিজের অংশে লাভ পেল সাফ ষাট হাজার টাকা। আর সব টাকার মত এ টাকাও বিকাশ চোখে দেখতে পেলো না। দফায় দফায় টাকা আসে, কিন্তু আসবার

আগেই গীতা তার খরচের ফন্দী ক'রে রাখে। তাই বছরের শেষে বিকাশ দেখতে পেলো যে তাঁর ব্যবসায়ে খাটছে যে টাকা তা' ছাড়া জমী কেনা হয়েছে প্রায় বিঘে খানেক আর একটা নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে তার সমস্ত খরচ হবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

গীতা যখন বিকাশের কথাবার্ত্তায় বুঝতে পারলে যে এবার তার খুব মোটা লাভ হবে, তখনি সে মাসিমাকে সে খবর দিয়ে বললে, "হাঁ, জ্যাঠাইমা এইবার তা হলে ওকে আপনার মনের মতন একখানা বাড়ী করতে বলুন। এ বাড়ীখানা একে পুরাণো, তায় ছোট। এক ফোঁটা জমী নেই বাগান করবার! আপনার এ রকম বাড়ীতে তো থাকবার অভ্যাস নেই। ঐ যে মিনতি নতুন বাড়ী করেছে, অমনি একখানা করতে বলুন।"

মাসীমা বললেন, "খাসা বাড়ী হয়েছে মিনতিদের—ওখানে যে দু'দণ্ড ছিলুম যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেছলো। কিন্তু ও যে অনেক খরচ—" মিনতি বললে, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা নাকি ওতে লেগেছে।"

গীতা বললে, "উনি এবার যে টাকা পাবেন তাতে অমন দু'খানা বাড়ী করতে পারবেন। দোহাই জ্যাঠাইমা, আপনি বলুন অমনি বাড়ী একখানা করতে। ঐ যে বালিগঞ্জের নতুন রাস্তায় জমী কেনা আছে, ওখানে বাড়ীখানা হলে মিনতিদের চেয়েও ভাল হবে।"

মাসিমাকে খুব বেশী উত্তেজিত করবার দরকার হল না। তিনি খুশী হয়েই বিকাশকে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বাড়ীর হাজার অসুবিধা ও অস্বস্তির কথা বললেন। বিকাশ শুনে বললে, "আচ্ছা দেখি।"

আরম্ভ হ'ল বাড়ী, ধাঁ ধাঁ করে কাজ এগিয়ে গেল। ছ' মাস না যেতে যেতে একখানা প্রকাণ্ড হালফ্যাসানের বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। তার খরচের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা রইল ধারে।

এমনি করে ষাট হাজর টাকা লাভ করেও বিকাশ সেবারকার বছরের শেষে দেখলে যে এই বাড়ী নিয়ে তার যে নূতন সম্পত্তি হয়েছে তার দাম প্রায় লাখ

টাকা কিন্তু তাতে তার দেনা হয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজার, সেটা তার কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করতে হবে।

নতুন বাড়ীতে আসবার কিছুদিন পর মাসিমা গেলেন মারা। তার কিছুদিন পর কমলা অমল ও শ্যামলীকে নিয়ে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ী। এখন বাড়ীতে বিকাশ, গীতা ও তাদের ছেলেমেয়ে ছাড়া রইল শুধু বসন্ত। এখন বিকাশ ও গীতা দুজনেই অনুভব করলে যে এখন তারা নির্ঝঞ্ঝাট। গীতা অসঙ্কোচে একথা নিজের কাছে স্বীকার করলে। কিন্তু বিকাশ মনের ভিতর এই মুক্তি ও উল্লাসের গলা টিপে ধরে প্রাণপণে অনুভব করতে লাগলো যে, সে অত্যন্ত দুঃখিত। মাসিমার দয়ায় সে মানুষ হয়েছে, কমলার বাপমার পয়সা হতেই তার যা কিছু সবই। অতএব তারা ছেড়ে যাওয়াতে তার অতিমাত্র দুঃখিত হওয়াই তার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

সেই জন্য মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে বিকাশ ব'সলো গিয়ে তার নূতন বাড়ীর তিন নম্বর ব'সবার ঘরে।

এখানে বলা দরকার যে, বিকাশের নতুন বাড়ীখানা তৈরী হ'য়েছে তার ও গীতার পছন্দ মত। চারিদিকে বেশ বিস্তীর্ণ বাগান, মাঝখানে ছবিটির মত বাড়ীখানা। আগাগোড়া মার্ব্বল আর মোজেইকের ছড়াছড়ি, এক গঙ্গা ঘর, আর সবগুলিই একেবারে আনকোরা নতুন আসবাবে বোঝাই। শোবার ঘরই তার চারখানা, বসবার ঘর বিকাশের তিনখানা, গীতার দুখানা। বাথরুম সে যে কত তা' বলা যায় না।

তিন নম্বর ঘরখানায় দিনের বেলায় খুব তীব্র আলো আসতে পায় না; তার রং তেমনি মৃদু সবুজ, মেঝেটাও প্রায় সেই রঙের। এক কথায় ঘরখানা বেশ sober—খুব গভীর চিন্তার জন্য বিশেষ উপযোগী।

এইখানে একখানা ঘোরানো চেয়ারে ব'সে মুখ ভার ক'রে বিকাশ দুঃখ সাধনা ক'রবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

মাসিমা ও মেশোমশায় এবং তাঁদের পরিবারের সংস্পৃষ্ট জীবনের বাছা

ঘটনাগুলো নিয়ে সে মনের ভিতর আবৃত্তি ক'রবে এবং সেই সব স্মৃতির ধ্যান ক'রে মনটাকে একেবারে বিষাদে ছায়াছন্ন ক'রে রাখবে এই হ'ল তার সাধনা।

আধঘণ্টা পর সে আবিষ্কার ক'রল যে সে সারা ঘরটা জুড়ে আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে।

তার সাধনা ব্যর্থ হ'য়েছে।

ওদের কথা ভাবতে গিয়ে এখন তার কেবলি মনে আসতে লাগলো সেই সব ঘটনা, যাতে সে যারপরনাই দুঃখ পেয়েছে। মনে প'ড়লো ছেলেবেলা থেকে অনন্ত'র অত্যাচার, মনে প'ড়লো মাসিমার সব বেয়াড়া আবদার যার জন্য সে হন্ত-দন্ত হ'য়ে বেড়িয়েছে টাকা টাকা ক'রে, মনে প'ড়লো যে হাজার ক'রেও সে কমলাকে খুশী ক'রতে পারে নি, সে কেবলি তার সব সেবা অশ্রদ্ধার সঙ্গে হাঁড়িমুখ ক'রে নিয়েছে। আর মনে প'ড়লো সব চেয়ে বেশী ক'রে যে, এক-দিকে এদের আর একদিকে গীতাকে নিয়ে সে কি বিপদেই প'ড়েছিল। এদের জন্যে কিছু ক'রলেই যে শোবার ঘরে রাত্তিরে কুরুক্ষেত্র লাগতো, আর কিছু না ক'রবার সাহসও যে তার কুলোতো না সে কথা মনে হ'ল।

তার সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে তার মন একেবারে ছেয়ে গেল এই চিন্তায় যে, সব ঝঞ্ঝাট একদম চুকে গেছে এবং—তার জন্যে তার নিজের কোনও দুঃসাধ্য সাহসের কাজ ক'রতে হয় নি! এই দৈবকৃত আপদমুক্তির আনন্দে সে এত সম্পূর্ণ ভাবে ভরে' গেল যে নিজের অজ্ঞাতসারে সে উঠে নাচতে লাগলো।

গীতা দরজার কাছে এসে এ দৃশ্য দেখে অবাক্।

গালে হাত দিয়ে সে ব'ল্লে, "ও কি হ'চ্ছে? পাটের ব্যবসা ছেড়ে কি নাচের বায়না নিয়েছ না কি?"

চুপসে গেল বিকাশ হঠাৎ এমনি একটা বেকায়দায় গীতার কাছে ধরা প'ড়ে। সে মাথা চুলকে ব'ল্লে, "না—এই—হাত পা-গুলো ভয়ানক stiff বোধ হ'চ্ছিল—তাই একটু—এই একসারসাইজ—যাক গে, কোন দরকার আছে তোমার?"

ভ্রূকুটী একটু কুঁচকে গীতা ব'লে, "কেন? দরকার ছাড়া কি আসতে নেই নাকি তোমার কাছে?—না হয় বিনা দরকারেই এলাম।" ব'লে গীতা একখানা গদীওয়ালা চেয়ারে চেপে ব'সলে।

বিনা দরকারে যে গীতার সঙ্গে তার সর্ব্বদাই দরকার হ'তে পারে সে কথা সে এই ক'বছরের জীবনে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এক'টা বছর তার কেটেছে প্রায় অবিশ্রান্ত উদ্বেগে। মাসিমার তাড়ায় রাশি রাশি টাকা রোজগার করা, গীতার তাড়ায় জমীর পর জমী কেনা, বাড়ী করা, গয়না গড়ান ইত্যাদি, এই সবের জন্ত সে সর্ব্বদা হন্ত-দন্ত হ'য়ে ছুটে বেড়াত টাকার শীকারে। টাকা এলে তা নিয়ে বাধতো একটা বিরাট হাঙ্গামা। মাসিমা দিতেন খরচের ফরমায়েস, গীতা চাইতো তাঁকে পাশ কাটিয়ে টাকাটা কাজে লাগাতে। তাতে যে মন-কষাকষির আয়োজন হ'ত, তাই কোনও মতে ঠেকিয়ে পালিস ক'রে রাখবার সাধনা ও দুশ্চিন্তায় বিকাশের দিন রাত কাটতো। বিশেষ ক'রে দিনান্তে যখন গীতার সঙ্গে তার দেখা হ'ত তখন এ ছাড়া তাদের প্রায় কথাই হ'ত না। তাই সে ভুলেই গিয়েছিল প্রায় যে, বিনা দরকারে গীতার সঙ্গে কোনও কথা-বার্ত্তার আবশ্যকতা আছে।

গীতার কথায় অপ্রস্তুত হ'য়ে বিকাশ ব'লে, "আসবে বই কি; একশোবার আসবে, হাজার বার আসবে—আর এখন তো আর কোনও হাঙ্গামা নেই—শুধু তুমি আর আমি—" ব'লে সে গীতার পাশে ব'সে তাকে জড়িয়ে ধ'রলে।

কিন্তু তখনই প্রমাণ হ'য়ে গেল যে অতটা একা তারা নয়। ফট্ ক'রে বসন্ত ঘরে এসে তাদের এই অবস্থায় দেখে বোঁ ক'রে ঘুরে দে ছুট্।

আর সবাই গেছে কিন্তু বসন্ত যায়নি। তার যাওয়া গীতাও চায় না, বিকাশও চায় নি। বসন্ত বি-এ পাশ ক'রেছে। তার মতলব, সে আর প'ড়বে না, বিকাশের সঙ্গে ব্যবসা ক'রবে।

বসন্ত বিকাশের মতই খেলোয়াড় হ'য়েছে, হকি খেলায় তার ভারী নাম।

গীতার বসন্তকে না হ'লে চলেনা। তার ফুট ফরমায়েস, কেনা-কাটা

করবার দ্বিতীয় লোক নেই। বিকাশের তো একে নেই অবসর তাতে গীতার মতে সে এসব কাজে একেবারেই অকর্ম্মণ্য। একটা জিনিষ কখনও পছন্দমত কিনতে পারে না, আর যা কেনে তাতে ঠকে' আসে। অথচ গীতার দু' বেলা কেনা-কাটা লেগেই আছে, আর যা সময়, নিজের গিয়ে কেনবার সুবিধা হয় না। কাজেই বসন্তকে চাই।

হঠাৎ বসন্ত এসে তাদের আলাপের রসভঙ্গ ক'রে দিতেই বিকাশ লাফিয়ে উঠে একটু তফাতে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়লো।

তার পর—কি কথা ব'লবে বিকাশ ভেবেই পেলোনা, বিনা প্রয়োজনে গীতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা, তার মনে হ'ল একযুগ হ'ল বন্ধ হ'য়ে গেছে। তাই সে পাঠ সে ভুলেই গেছে। দিনরাত মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে যে সব অনাবশ্যক মিষ্টি কথা সে একদিন ঘড়া ঘড়া মধুর মত ঢালতে পারাতো, তার একটা কথাও এখন তার মনে এলো না। যা' মনে এলো, সেই সব প্রথম প্রেমের শুধু প্রিয় সম্ভাষণ, সে সব তার মনে হ'ল বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে অচল…কতকগুলো নিরর্থক হিজিবিজি!—আর এ কথাও ঠিক যে বিকাশ প্রধানতঃ কর্ম্মী—কোনও কালেই সুবক্তা নয়। কথার চেয়ে কাজেই তার মাথা খেলে বেশী। তাই তার উগ্রতম প্রেমাভিনয়ের দিনের বিকাশ আত্মপ্রকাশ ক'রতো কথার চেয়ে কাজেই বেশী। চিমটি, চড় চাপড় থেকে আরম্ভ ক'রে ক'রে চুম্বন ও হাড়-ভাঙা আলিঙ্গন পর্য্যন্ত কর্ম্মবহুল প্রেমসম্ভাষণই ছিল তার বেশী অভ্যস্ত।

তাই কি ব'লবে, সে তা' ভেবে উঠতে পারলে না।

অনেক ভেবে চিন্তে সে বল্লে, "তোমার জন্য একটা জিনিষ দেখে এসেছি, আজ আনবো—দেখলে মূর্চ্ছা যাবে। এমন"—

গীতা বল্লে, "কী সে জিনিষ?"

—"না ব'লবো না—একেবারে এনে দেখাবো।"

"না না বল; নইলে নিশ্চয় তুমি এমন একটা অদ্ভুত বিশ্রী জিনিষ এনে ফেলবে যা আমার রাখতে যায়গা হবে না। বল আগে।"

জিনিষ কেনবার সম্বন্ধে তার অপটুতার প্রতি এই কটাক্ষ আগে বিকাশের বেশ মিষ্টি লাগতো। স্বামী যে এ সব কাজে অকর্ম্মণ্য এ অভিযোগের তলায় তলায় সে দেখতে পেত একটা প্রচ্ছন্ন অনুরাগের সুর, যাতে ব'লতো, এমন অসংসারী সরল মিষ্টি মানুষটী—ঘোর প্যাঁচে নেই সে। তাই তার বেশ লাগতো। কিন্তু দিনরাত এই কথা শুনতে শুনতে এর মিষ্টিরস ভেসে গিয়ে তীব্র ঝাঁজাল এবং কটু হ'য়ে গেছে। এখন এ কথার তলায় যে সুর বাজে তাকে বলে 'অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য তুমি!'

তাই এ কথাটা তার ভালো লাগলো না। সে বল্লে, "একটা ভারী সুন্দর পেকিঙিজ কুকুর—এতটুকু!"—

"হো হো ক'রে হেসে গীতা ব'ল্লে, "ও-মা যা' ভেবেছি তাই, ওই বিশ্রী জানোয়ারটা এত ভাল লাগলো?—আর ভাল জিনিষ পেলে না। ওকে আনলে বাড়ী ঘর যেখানে সেখানে নোংরা করবে, কুকুর কিনতে হয় এমন একটা কেন যাতে বাড়ী পাহারার কাজ হ'তে পারে, চোরে যাকে ভয় পাবে। একটা Alsatian কি Great Dane."

কুকুর কিনবার মতলব কয়েক মুহূর্ত্ত আগেও বিকাশের মোটেই ছিল না। কোনও কথা মাথায় আসে না ব'লে সে ফস্ ক'রে কথাটা তৈরী ক'রে ব'লেছিল, কেন না একদিন গীতা তার এক বন্ধুর বাড়ীতে একটা পেকিঙিজ কুকুর নিয়ে ভারী আদর ক'রেছিল।

এখন তার মনে হ'ল কথাটা না তুললেই ভাল ছিল। কুকুর জিনিষটা বিকাশ নিজে খুব পছন্দ করে না। বিশেষতঃ Great Dane!...তাকে দেখলেই ভয় করে।

বিকাশ ভেবেই পায় না যে তাকে বাঘ না ব'লে লোকে মিছামিছি কুকুর বলে কেন? Alsatianগুলোর খেলা দূর থেকে দেখলে ভাল লাগে কিন্তু ওদের বিকট দাঁতাল মস্ত হাঁ দেখলে মনে হয় ওই নেকড়ের বাচ্চার কাছাকাছি থাকাটা খুব নিরাপদ নয়।—অথচ এই অনাবশ্যক কুকুরের কথা তুলে সে

বাড়ীতে Alsatian কি Great Dane আমদানী ক'রে একটা স্থায়ী ভয়ের হেতু সৃষ্টি ক'রে বসেছে, তা' বুঝতে পারলে। কেন না, কথাটা যখন উঠেছে তখন বিকাশ আর কিছু না ক'রলেও বসন্তর মারফত দু'এক দিনের মধ্যেই একটা বাঘা কুকুর যে আমদানী হবে সে-বিষয়ে বিকাশের সন্দেহ রইল না।

কথাটা পাল্টে ফেল্‌বার চেষ্টা বিকাশ ক'রলে, কিন্তু আর কোনও কথাই মনে এলো না।

এবার কথার ভার নিলে গীতা। তার প্রথম কথাতেই বুঝা গেল যে বিনা দরকারে এসেছে এই ভণিতা তার একেবারে বাজে। দরকারের কথা ছাড়া গীতা এ-ঘর পর্য্যন্ত তেড়ে আসেনি। এ-কথা বিকাশ শীগ্‌গিরই বুঝতে পারলে।

গীতা বল্লে, "শোন তোমার লাইফ ইন্‌সিওরেন্সটা এবারে বাড়িয়ে দাও। ওঁরা তো সব চলে গেলেন ; এখন টাকা যা বাঁচবে সে সব তা নইলে তুমি খরচ করে ফেলবে।"

বিকাশ মুখ গম্ভীর করে বললে, "না না, আর ইন্‌সিওর করলে সামলাতে পারবো না। এমনি তো প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়েছে।"

"এখন এক লাখ টাকা ক'রে ফেল। টাকা তোমার আসবেই, ইন্‌সিওরেন্সের বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকলে সেটা জমবে, নইলে তোমার যা স্বভাব, তুমি সব খরচ করে ফেলবে।"

তার স্বভাবের উপর এই খোঁচাটা এখন বার বার শুনে অনেকটা অভ্যস্ত হলেও এটা বিকাশের কাণে এখনও ঠিক অমৃত বর্ষণ করে না।

সে নানা কথা তুলে আপত্তি উত্থাপন করলে, কিছু টিকলো না।

তারপর গীতা বসন্তকে ডাকলে।

দেখা গেল এর ভিতর বসন্ত "একটা ইনসিওরেন্সের আফিসে দালালি নিয়েছে। সে তার ফরম এনে বিকাশকে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা প্রোপোজাল লিখিয়ে নিয়ে গেলো।

বিকাশ হতাশ চিত্তে ভাবলে, জ্যাঠাইমার গুষ্টি বিদায় হয়ে তার ভার যতটা

কমেছে ভাবছিল, ততটা কমেনি। তার এক দিককার বন্ধন আলগা হয়ে এসেছে, কিন্তু গীতার দিক থেকে সে বন্ধন পরিপূর্ণরূপে বেষ্টন করেছে। খরচ কমেছে কিন্তু খরচের স্বাধীনতা বাড়ে নি এক ফোঁটাও।

ক্রমে বিকাশ দেখতে পেলে যে গীতার হিসাবী মন তাকে তার হিসাবের জাঁতার ভিতর একেবারে পিশে মারতে চায়। তাকে একেবারে বেহিসাবী এবং অপদার্থ স্থির করে সে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে কোনও মতেই বিকাশের হাতে বাড়তি টাকা যেন না জমে।

এ প্রতিজ্ঞা গীতা করেছিল প্রথম জ্যাঠাইমার হাত থেকে টাকা উদ্ধার করবার জন্য, কিন্তু এখন এটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

জ্বালাতন হয়ে বিকাশ স্থির করলে এ পৃথিবী ভালমানুষীর জায়গা নয়। ভাল মানুষ হয়েছ কি লোকে তোমায় পেয়ে বসবে তা সে সম্পূর্ণ বাইরের লোকেই হোক কি তোমার স্ত্রী-পুত্রই হোক। সে প্রতিজ্ঞা করলে, এ সব আর চলবে না। এবার সে শক্ত হয়ে গীতার কথা শুনতে সাফ অস্বীকার করবে।

তাই একদিন গীতা যখন বললে, "দেখ ব্যাঙ ঘোড়া চা কোম্পানীর শেয়ার নাকি খুব ভাল," তখনই সে 'না' বলতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়ে বসলে।

গীতা বললে, "বসন্ত বলছিল ওরা এবার নতুন শেয়ার বের করছে, শতকরা একশো টাকা ডিভিডেণ্ড না হয়ে যায় না। আমি বলি দশ হাজার টাকার শেয়ার কিনে ফেল।"

খুব জোর করে বিকাশ বললে, "কোথায় পাব দশ হাজার টাকা? তা ছাড়া ও সব hundred per cent শেয়ার আমি বিশ্বাস করি না।"

গীতা বসন্তকে নিয়ে এলো। দেখা গেল বসন্ত এই কোম্পানীর শেয়ারেরও দালালি আরম্ভ করেছে। অনেকগুলো হিসাব পত্র দেখিয়ে সে বক্তৃতা করে বিকাশকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে প্রস্তাবিত লাভ অবশ্যম্ভাবী। দেখা গেল ইতিমধ্যেই চা বাগান ও চায়ের কারবার সম্বন্ধে বসন্ত বিস্তর জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। তার যুক্তি বা অঙ্কের ভিতর বিকাশ কোথাও কোনও ফাঁক ধরতে পারলে না।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করেছে এবার গীতার অবাধ্য হতেই হবে, তাই সে বললে, "না, ওসব হবে না। যে কারবার আমি নিজে বুঝি না, তাতে আমি নেই। তা ছাড়া কোথায় পাব এখন দশ হাজার টাকা।"

গীতা ব'ললে, "দশ হাজার তো এখনি দিতে হবে না। দু' হাজার এখন, দু' হাজার এলটমেন্টের পর, তারপর কিস্তি-কিস্তি। এ আর দিতে পারবে না?"

"না, তা ছাড়া পাটের সীজন এসে প'ড়েছে।"

—কিন্তু এমনি অদৃষ্টের ফের, সে দিনিই বিকাশ অফিসিয়াল অ্যাসাইনীর এক চিঠি পেলে যে ইনসলভেন্ট ঝঙ্কার মল টঙ্কার মল ফারমের দরুণ বিকাশের পাওনা মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা ডিভিডেণ্ড সে এখন পাবে!

আর যাবে কোথায়? গীতা ধ'রে ব'সলে এটা বিকাশের ডোবা টাকা। এ টাকাটায় ব্যাঙ্ ঘোড়ার শেয়ার কিনতে হবে।

তাই হ'ল।

যতই প্রতিজ্ঞা করুক, শক্ত কথায় বিকাশ প্রতিজ্ঞাটাকে আঁটো ক'রে তুলতে পারে না কিছুতেই, তাই গীতার কাছে তার পদে পদে হার হয়।

ফলে দাঁড়াল এই যে, বিকাশের রোজগার যদিও বিস্তর বেড়ে গেছে, তার হাতে পয়সা কোনও দিনই থাকে না। টাকা আসবার আগেই খরচের ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে, আর যদি কোনও ফাঁকে কিছু হাতে আসবার পথ হয়, তখনি গীতা উঠে প'ড়ে লেগে যায় সেটা খরচ ক'রে ফেলবার। বসন্ত একাজে তার মস্ত সহায়।

বসন্ত খেলোয়াড় বলে বিকাশ তাকে ভালবাসতো। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই সে অস্থির হয়ে পড়লো। এ আপদটা নামে না তার ঘাড় থেকে!

চিনির বলদের মত সে স্বধু টাকা রোজগার করেই যাবে—খরচের স্বাধীনতা পাবে না কি কোনও দিন?

অনেক ভেবে চিন্তে বিকাশ শেষে বসন্তকে তাড়াবার উপায় স্থির করলে।

অনেক সন্ধানের পর জোর তদ্বিরের ফলে বসন্তের একটা ভালো চাকরী জোগাড় হল।

পাঁচশো টাকা মাইনেতে তার চাকরী একটা বড় লবণ ব্যবসায়ীর কারবারে—সেই রাঁচীতে।

যে দিন বসন্তকে হাওড়ায় রেলে উঠিয়ে দিয়ে সে বাড়ী ফিরলে, তখন সে অনেক দিন পরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে। একটা মস্ত আপদ গেছে। এখন গীতা আর অন্ত সুবিধা করতে পারবে না!

ফ্যানটা খুব জোর ক'রে চালিয়ে ইজি চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে স্বস্তির একটা বিরাট নিঃশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজে আরাম করতে লাগলো।

গাড়ী-বারান্দায় একখানা—দু'খানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল!

চমকে উঠে বিকাশ চেয়ে দেখলে—

বিস্তর মাল মোটরা বোঝাই চিয়ে সপরিবারে এসেছে—অনন্ত!

মালের বহর দেখেই বোঝা যায়, এ দুই দিনের ভিজিট নয়—স্থায়ী বাসিন্দার গন্ধ!

আর এক রকমের লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বিকাশ উঠে গেল দেখতে।

## আঠার

অনন্ত নেমেই অবিলম্বে বিকাশকে যা বল্লে তাতে বিকাশ বুঝলে যে তার অনুমান মিথ্যা নয়।

অনন্ত বল্লে, "ওখানে আর পোষাল না ভায়া। টাকা পয়সার আমদানী নেই, জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য! আর শরীরটাও ভাল থাকছিল না। ভাবলাম বাঙলার ছেলে বাঙলায়ই ফিরে আসি। বাড়ীটারও বেশ ভাল ভাড়া হ'য়ে গেল। তাই কোথায় আর যাব, তোমার এখানেই এলাম! তোমার বউদিও

বললেন, কোথায় আবার ফ্যা ফ্যা ক'রে পড়ে ম'রতে যাব, আমার বিকাশ আছে, গীতা আছে, তাদের কাছে গিয়ে পড়ে থাকি, তারাই দেখবে শুনবে।"

অভিসন্ধির এই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে বিকাশের প্রাণ জল হ'য়ে গেল।

'না' বলবার উপায় নেই। ফিরিয়ে বা শীগ্‌গির তাড়িয়ে দেবার কোনও ওজুহাতই নেই। বাড়ীতে অপর্য্যাপ্ত জায়গা আছে; টাকার অভাব নেই বিকাশের!—বিশেষতঃ অনন্ত শীগ্‌গিরই জানালে যে বিকাশের ব্যবসায়ে কাজ করবে স্থির ক'রেই সে এসেছে। সে স্থির করবার আগে যে বিকাশের একটা অনুমতির বা সম্মতির আবশ্যক হ'তে পারে এমন আভাষও সে দিলে না।

অনন্ত যে এসেছে তাতে বিকাশ বিরক্ত হ'য়েছিল।—সপরিবারে আসায় আরও—স্থায়ীভাবে আসায় ততোধিক। তাদের ঐ গুষ্ঠী যে তার অন্নে উদর পুষ্ট ক'রবে এতে সে বিরক্ত বোধ ক'রছিল! কিন্তু এই শেষ কথাটায় তার বিরক্তি রূপান্তরিত হ'য়ে গেল আতঙ্কে। মনে হ'ল, থাকুক অনন্ত সপরিবারে, অনন্ত কাল সে অন্ন ধ্বংস করুক বিকাশের—শুধু যেন বিকাশের কারবারে সে মাথা না গলায়। অনন্ত একবার সেখানে যদি পেয়াদা হ'য়েও ঢোকে তবে কোথা থেকে কেমন ক'রে সে চুরি ক'রে ভাসিয়ে দেবে তার ঠিকানা নেই।

ভারী উদ্বিগ্ন হ'ল বিকাশ!—এই বিপদটা কেমন ক'রে সে ঠেকাবে তাই ভাবতে লাগলো।

বিস্তারিত সংবাদ ক্রমে প্রকাশ হ'ল। অনন্ত রাঁচীর বাড়ীটা দশ বছরের জন্য লীজ দিয়েছে আর কাউকে নয়—কমলার দেওর ভূপতিকে। ভাড়া মাসে 'দুশো' টাকা।

অনন্ত বললে, "জোর বরাত ভাই, নইলে আজকাল ঐ বাড়ী—যেমন বেমেরামত হ'য়ে আছে, পঞ্চাশ ষাট টাকায় কেউ নেয় না। পেয়ে গেলাম দুশো' টাকা মাস। একে বলে বরাত।"

মাসিমা মারা গেছেন, এখন বাড়ীর মালিক অমল, অনন্তের তাতে কোনও

অধিকারই নেই। সেই বাড়ী ভাড়া দিয়ে অনন্ত অম্লান বদনে মাসে দু'শো টাকা মেরে দিলে!

ভাবলে বিকাশ, একবার তার কারবারের ভিতর ঢুকতে পারলে কবে সে একদিন কারবারটাই বেচে দেবে দু' লাখ টাকায়। তার পক্ষে সবই সম্ভব।

তাই ব'লে মুখে আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হ'ল না বিকাশের কি গীতার! সবচেয়ে ভাল শোবার ঘরখানা অনন্তই বেছে নিয়ে বললে, "আমার এইখানেই বেশ সুবিধে হবে—খাসা দক্ষিণ হাওয়া!" ছেলেদের জন্যে হ'ল বসন্তের ঘর। খাওয়া দাওয়ার বিপুল আয়োজন হ'ল। দেখতে দেখতে তাঁরা বেশ আরাম ক'রে সব গুছিয়ে নিলেন।

দুপুর বেলা বিকাশ নীচের একটা ঘরে এসে দুয়োর বন্ধ ক'রে কেবলি চুল ছিঁড়তে লাগলো। উপায়?

ছাই উপায়। কোনও উপায় নেই।

মেশোমশায় তাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন মুখে, কিন্তু মনে মনে কি তিনি এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর গুষ্ঠী চিরদিন বিকাশের ঘাড়ে চেপে থাকবে—নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাবে না সে কোনও দিন।

তার মনের ভিতর থেকে কে একজন যেন ব'লছিল, "কেন পাবে না? গোলটা কিসের? জোর ক'রে বল না ওদের—পথ দেখ।"

সে কথা ভাবতেই তার প্রাণ আঁৎকে উঠলো। অনন্ত—যে ছেলেবেলায় তাকে কাণ ধ'রে রোজ নাচিয়েছে—তাকে গিয়ে বিকাশ ব'লবে 'বেরোও'—বুক কেঁপে উঠলো, বাপরে! সে অসম্ভব।

"তবে এমনি ম'রবে?" ব'ললে তার অন্তরাত্মা।

"না ম'রবো কেন? ফন্দী বের করি একটা। এই তো ফন্দী ক'রে বসন্তকে বিদায় ক'রলাম—তেমনি একটা ফন্দী।"

অনেক রকম ফন্দী খেলে গেল মাথায়। কত ব্যবসায়ীর কথা মনে হ'ল যাদের ধ'রলে তারা অনন্তকে চাকরী দিয়ে হয় তো পৃথিবীর অপর কোথায়

পাঠাতে পারে। কিন্তু বাবা! অনন্তকে চাকরী দিতে ব'লবে সে কি সাহসে, দু'দিন পরে যদি সে তাদের টাকা মেরে লম্বা দেয় তখন বিকাশ মুখ দেখাবে কেমন ক'রে?

ভেবে ভেবে বিশেষ কিছু এগুলো না। শুধু মাথার কতকগুলো চুল ছিঁড়ে উঠে এলো হাতের সঙ্গে।

—দরজায় কে এসে টোকা দিলে।

—এই সেরেছে, এখনি এসেছে ধেয়ে! খুললে দুয়ার।

যাক! অনন্ত নয়, গীতা! তার মুখে চোখে অমাবস্যার অন্ধকার।

দোর বন্ধ ক'রে গীতা একখানা চেয়ারে ব'সে বললে, "এখন কি করবে?"

"কি ক'রবো? তইতো!"

"একটা কিছু ক'রতে হবে তো?"

বিকাশের মন ঘুরছিল অন্য চিন্তার পেছনে ফন্দী ফিকিরের সন্ধানে সে অন্যমনস্ক ভাবে বল্লে, "কেন?"

ঝঙ্কার দিয়ে গীতা ব'ল্লে, "কেন? ন্যাকামী ক'রো না। কিছু ক'রবে না আর দাদা গুষ্টী শুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চেপে ভিটেয় ঘুঘু চরাবেন? কি বোকার মত বকছ তুমি?"

চমক ভেঙে উঠে বিকাশ বললে, "মানে, ক'রতে তো হবেই কিছু, কিন্তু কি করা যায়?"

"কেন, সোজা ওঁকে বল গে, এসেছেন, দু চার দিন থাকুন, পরে যেখান থেকে এসেছেন সেইখানে ফিরে যান।"

ম্লান হাসি হেসে বিকাশ ব'ল্লে, "সে পথ তো মেরে রেখে এসেছেন—যা'কে বলে burnt his boats. সে বাড়ীতে এখন ভাড়াটে।"

"তা বেশ, সেখানে না হয়, চুলোর দোরে যান ভাগাড়ে যান। দুশো টাকা পাবেন তাই দিয়ে যেখানে খুসী বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকুন গে।"

"কিন্তু, একটা তো অছিলে চাই!—কি ব'লে ব'লবো—"

"অছিলে আবার কিসের? ওঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? সাফ ব'লে দেও, 'হবে না'।"

"কিন্তু—"

"এর আর কিন্তু নেই, শক্ত না হ'লে ওঁর সঙ্গে পারবে না।"

বলা সোজা, কিন্তু সে সাহস পাবে কোথায় বিকাশ? সে বললে, "দেখ, সে কথাটা তুমিই ওঁকে বল না? তুমি ব'লতে পার—তোমার ভাই!"

"আহা! আমি ব'লবো! আমি দাদাকে ব'লতে পারি একথা? ভাববে কি সে?"

"আমারও ঠিক সেই কথা! ভাববে কি ওরা?"

ফলে সিদ্ধান্ত কিছুই হ'ল না, হ'ল শুধু স্বামী স্ত্রীতে ঠেলাঠেলি এবং শেষে চটাচটি!

অনন্ত বাড়ীতে বেশ জাঁকিয়ে বসলো।

প্রথম দিনই সে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বেশ লম্বা ফরমায়েস দিলে। গীতা, বৌদিদি এবং ঠাকুর চাকরেরা হন্তদন্ত হয়ে তার হুকুম তামিল করতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

খাওয়ার সময় দেখা গেল কোনও কিছুই তার রুচিকর হ'ল না। সে বললে, "এঃ! এ কী মাছ এনেছে, এর না আছে সোয়াদ না আছে কিছু। বাজারে কে গিয়েছিল?"

অপরাধী চাকরের সন্ধান হলে অনন্ত তাকে ধমকে দিলে। সে কোনও জিনিষের ভাল মন্দ চেনে না এবং তার প্রধান লক্ষ্য কত পয়সা সে চুরি ক'রতে পারে, এই ব'লে সে চাকরটাকে রীতিমত ধমকে দিলে।

মাংসটা রান্না মন্দ হয় নি, কিন্তু মাংসটা একেবারে যাচ্ছেতাই। ভাতের চাল ভদ্রলোকের অখাদ্য। ঠাকুরটা মোটে রাঁধতে পারে না ব'লে তাকে ভদরকে ফিরে যাবার আদেশ দিলে সে, দুটো মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলে।

খেয়ে দেয়ে তামাকে এক টান দিয়েই ব'ললে, "ও বাবা! এ যে একদম গাঁজা! দু'দিন এই তামাক খেলে মাথা গুলিয়ে যাবে।"

পরের দিন সকালেই অনন্ত গীতাকে বল্লে, "আমাকে কুড়িটা টাকা দে, আমি আজ বাজারে যাব।"

গীতা সুড় সুড় ক'রে টাকা বের ক'রে দিলে।

বাজার থেকে এসে অনন্ত তার স্ত্রীকে জোগাড় দেবার হুকুম দিয়ে স্নান ক'রে ব'সলো গিয়ে রান্নাঘরে। তার নিজের তদ্বিরে নানাবিধ সুখাদ্য রান্না হ'ল, সে পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক খেয়ে তার নিজের কেনা দামী তামাক টানতে ব'সে গেল।

এর পর রোজই অনন্ত এমনি বিশ পঁচিশ টাকা নিয়ে বাজারে যায়, ছত্রিশ ব্যঞ্জন রান্নাবাড়া করায় আর—তার নিজের ভাষায়—খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দেয়।

গীতাকে সে বলে, "তোরা ছেলে মানুষ, তায় আনাড়ী, তোদের চাকর বাকর যা দেয় তাই কোনও মতে গেলাকে মনে করিস খাওয়া। খাওয়াটা তা নয়, এটা একটা খুব উচ্চ অঙ্গের আর্ট। গেলে সবাই, কিন্তু খেতে জানে ক'জন?

গীতা কথা কয় না। কথা কইবে কি? রোজ খাওয়া দাওয়ার খরচের বহর দেখে তার চোখ কপালে উঠে যায়। এবং বলা বাহুল্য অনন্ত যদিও দিনরাতই টাকা নেয় এটা ওটা কেনবার জন্য, কোনও হিসাব দেওয়ার বালাই তার নাই। হিসাব নেই খরচের এতে গীতার মনটা ছট্ ফট্ করে, কিন্তু উচ্চবাচ্যই সে করতে পারে না।

চাকর বাকর মালী দ্বারোয়ান সবাই একেবারে তটস্থ। তাদের গালাগালি ছাড়া প্রায় কথা বলে না অনন্ত, আর তার ধমকে সবার পেটের পীলে চমকে যায়। তাই বড় বাবুর ডাক শুনলে তারা সন্ত্রস্ত হ'য়ে ছুটে যায়, প্রাণপণ ছুটোছুটি ক'রে তার কাজ করে।

বিকাশ যখন বাড়ী আসে তখন কোনও চাকরকে ডাকলে প্রায়ই শোনে সে

বড়বাবুর কাছে আছে না হয় বড়বাবুর হুকুমে কোথাও গেছে—তার নিজের কাজ হয় সে নিজে করে না হয় গীতা ক'রে দেয়।

বিকাশ দেখে আর ভাবে। বিনা অধিকারে অনন্তের এ বাড়ীতে যে সর্ব্বময় প্রভুত্ব তা দেখে তার হিংসা হয়। প্রভুত্বের দাবী ষোলআনা তারই, কিন্তু তাকে অবহেলা করতে কিম্বা তার কাজে ত্রুটী করতে কারও হৃৎকম্প হয় না, কেউ তা করতে কসুরও করে না। অথচ অনন্তের কথা, গীতা থেকে মালী পর্য্যন্ত তামিল করবার জন্ম সদা ব্যস্ত।

একদিন বিকাশ আফিস যাবে, দেখা গেল তার জুতোটা ময়লা হয়ে রয়েছে, বুরুষ করা হয় নি। যে চাকরের এটা করা কর্ত্তব্য ছিল সে তখন অনন্তের সেবায় ব্যস্ত। দু'একবার ডাকাডাকি করে বিকাশ নিজেই জুতো আর বুরুষ টেনে নিলে। এতক্ষণে গীতা এসে তাই দেখে জুতো আর বুরুষ তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে বুরুষ করে দিলে।

গীতা ব'ললে "ওগো আর তো পারি না। এ পাপ বিদায় ক'রবে না তুমি?"

বিকাশ ব'ল্‌লে, "কেন কী হয়েছে?" যেন কিছুই জানে না।

গীতা একটু চটে ব'ল্‌লে, "কী হ'য়েছে? জান না। সবাইকে অস্থির করে রেখেছে, চাকর বাকর গুলোকে উদ্বাস্ত ক'রে তুলেছে, জলের মত টাকা খরচ করছে—এমন করলে ভিটেয় ঘুঘু চরবে।"

বিকাশ বিস্ময়ের সুরে বললে, "কেন? টাকা? সে তো তোমার হাতে।"

"তা তো বটে, কিন্তু এমন করে চান দাদা যে 'না' বলবার উপায় থাকে না। বললে না জানি কি কুরুক্ষেত্র লাগাবে। দেখ, অমনি ন্যাকামি করো না। না হয় কলকাতার বাইরে কোথাও ওঁর চাকরী যোগাড় করে দাও।"

গীতার এ উত্তেজনায় বিকাশের মনে বেশ একটু হৃষ্ট তৃপ্তি হচ্ছিল। বিকাশের কাছে গীতা অকরুণ কর্ত্রী—কিন্তু অনন্তের কাছে তিনি কেঁচো—'না' বলতে পারেন না, কেননা কুরুক্ষেত্রের ভয়!

মনে হতে লাগলো—হোক গীতার একটু শিক্ষা, বুঝুক সে যে নিজের ইচ্ছে মত কোনও কাজ না করতে পারলে কেমন লাগে লোকের !

পরক্ষণেই তার মনে হল এ শিক্ষায় কিছুই হবে না। গীতাকে নরম করতে পারে শুধু ঐ 'কুরুক্ষেত্রের' ভয়। শুধু গীতা কেন এ বাড়ীর চাকর মুনিব সবাই যেমন সায়েস্তা হয়েছে এমন তারা কোনও দিন ছিল না। তার কারণ এই যে বিকাশ ভাল মানুষ, কারও সাতে পাঁচে নেই, তাকে কারও ভয় করতে হয় না ; তাকে তাই সবাই অনায়াসে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু অনন্তকে করে সবাই ভয়।

অফিস যাবার পথে ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, এইটেই পৃথিবীর নিয়ম। ভাল মানুষ যারা তাদের কথা শোনবার লোক পাওয়া যায় না, তাদের কথা না শুনলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ভাল মানুষকে সবাই অল্পবিস্তর ভাল বাসে, কিন্তু ভয় করে না কেউ। তাই তার অপ্রীতি ও বিরক্তির চিন্তায় কেউ নিজেকে বিপর্য্যস্ত করে না। কিন্তু যারা ভাল মানুষ নয়, যারা পরকে তিরস্কার বা পরের উপর অত্যাচার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, তার কাছে সবাই জোড়হস্ত হয়ে থাকে।

অনন্তের সামনে গীতার কাণ্ড দেখে তার মনে পড়লো Taming of the Shrew-র কথা।

গীতা অবশ্য ক্যাথারিণের মত shrew নয়, কিন্তু প্রভুত্বটা তার চরিত্রে সহজ। সেই প্রভুত্বকে বিকাশ তার ভালবাসা ও সেবা দিয়ে অতিক্রম ক'রতে পারে নি, পুষ্টই ক'রেছে। কিন্তু অনন্ত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রভু—ধমকে কাজ বাগাতে সে জানে ; তাই তার কাছে গীতার মুখ ফুটে কথাটি বলবার শক্তি নেই। যা কিছু লম্ফ ঝম্ফ তার সে এখন হ'চ্ছে নীচু গলায় বিকাশের কাছে, তাকে দিয়ে এ পাপ বিদায় করবার চেষ্টায় !

একটা পূর্ণ আনন্দ হ'ল বিকাশের এতে ! সে ভাবলো, থাক না, চলুক এমনি। বাড়ীর লোকজন শায়েস্তা আছে, গীতারও গোলমাল নেই। আর ব'লতে কি টাকা-কড়ি যাই খরচ করুক অনন্ত, খাওয়া-দাওয়ার আর্ট সে সত্যি

সত্যি জানে। তার ব্যবস্থায় রাজকীয় ব্যয় হ'চ্ছে বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়াটাও হ'চ্ছে রাজকীয়।

কাজেই অনন্তকে বিদায় করবার আগ্রহ গীতার মত বিকাশের ছিল না।

কিন্তু একদিন অনন্ত যখন গীতাকে ব'ললে যে সে বাগানের জন্য ভাল গাছের চারা আনতে যাবে, তার জন্য পঞ্চাশ টাকা দরকার, তখন গীতা তার সমস্ত সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ব'সলো, "টাকা ত' নেই আজ বাড়ীতে?"

কথাটা মিথ্যা। বলতে গীতার বুক দুর্ দুর্ ক'রছিল, পাছে অনন্ত আলমারী খুলে দেখতে চায়। কিন্তু অনন্ত তা না ক'রে ব'ললে, "তবে চেক দেনা ভাঙিয়ে নেবো।"

বিকাশ সেদিন ক'লকাতার বাইরে কোন পাট কলে গিয়েছিল ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে।

গীতা ব'ল্‌লে, "চেক আমি কোথা থেকে দেবো, সে সব ত' ওঁর কাছে।"

এ কথাও মিথ্যা, কেন না গীতার নিজ নামে একটা উপচীয়মান ব্যাঙ্ক একাউণ্ট ছিল, তাতে টাকা জমাই হ'ত বরাবর তার উপর চেক কোনও দিন কাটা হয় নি।

"তা' হ'লে যাই তার আফিস হ'য়েই টাকাটা নিয়ে যাই।" ব'লে অনন্ত বের হ'ল। গীতা মনে মনে হাসলে, কেন না আফিসে বিকাশকে আজ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু অত সহজে জব্দ হবার পাত্র অনন্ত নয়। সে গেল আফিসে। সেখানে বিকাশকে না পেয়ে সে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিলে এবং তার নামে হাওলাত লিখে একশো টাকা নিয়ে গেল। এ খবর শুনে বিকাশের চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল। কিন্তু তারপর দেখা গেল অনন্ত রোজ আফিসে যায়, রোজ বসে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, তাদের খাতাপত্তর দেখে। তার মতলবটা যে সাধু নয় সে কথা বিকাশ বুঝতে পারলে। ছুঁচ হ'য়ে প্রবেশ করবার চেষ্টা! ফাল হ'তে কতক্ষণ?

এইবার অনন্তকে দূর করবার আকাঙ্ক্ষা বিকাশের গীতার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র হ'য়ে উঠলো। সে তার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডেকে শেষে তার বিপদের কথা জানিয়ে ব'ল্‌লে, "ওকে তাড়াতে পার মুখুজ্জে?"

মুখুজ্জে মাথা চুলকে ব'ললে, "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

দিনের পর দিন যায়—মুখুজ্জেরও ভাবনার শেষ হয় না। বিকাশ ঘেমে উঠলো।

## উনিশ

মাস দুই গেল। তারপর একদিন রবিবার অনন্ত দুপুর বেলায় এলো অত্যন্ত উগ্র মেজাজে—বাড়ীতে পা না দিতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, "শালা' জোচ্চোর, চশমখোর! ঘুঘু দেখেছেন্ ফাঁদ দেখেন নি। শালাকে জেলে দিয়ে ছাড়বো।"

বিকাশ জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কাকে দাদা? কি হ'য়েছে?"

"ঐ শালা—ঐ ভূপতি—কমলার দেওরটা! দু' মাস হ'ল বাড়ী নিয়েছে, ভাড়া দেবার নামটি নেই। আজ গিয়েছিলাম, তা ব'ল্‌লে কি জান শালা? ব'ল্‌লে, কার বাড়ী? কাকে ভাড়া দেব?"

বিকাশের অন্তরটা নেচে উঠলো। সে সাগ্রহে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কেন? বাড়ী আপনার কাছ থেকে নিয়েছে"—

"ও কি সহজ শয়তান? ও দেখালে যে আমার কাছে বাড়ী নেবার সঙ্গে সঙ্গে ও এখানে একটা লীজ রেজেষ্ট্রী ক'রে দিয়েছে অমলের নামে। ও নাকি অমলের ভাড়াটে—মাসে মাসে ভাড়ার টাকাটা নাকি অমলের নামে ব্যাঙ্কে জমা হ'চ্ছে।—শা—লা—র'সো না, ওকে সাত ঘাটের জল না খাইয়ে ছাড়বো!"

নাচতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল বিকাশের। ভূপতির পায়ের ধূলো নিতে মন চাইলে তার। খাসা বুদ্ধি খেলেছে—কিন্তু শেষ রক্ষে ক'রতে পারবে কি ?

খুব ব্যস্ততার ভাণ ক'রে বিকাশ জিজ্ঞেস ক'রলে, "তাই তো', তা এখন কি ক'রবেন ?"

"দেখ না কি করি ? বাছাধন ভেবেছেন ক'লকাতার উকীলের বুদ্ধিতে ভারী চাল চেলেছেন। আমাকে বাদী হ'য়ে মামলা ক'রতে হ'বে আর আমি হেরে যাব। সে বান্দা আমি নই! আমি চল্লুম আজই রাঁচী। এক্ষুনি গিয়ে বাড়ী দখল ক'রে ব'সবো, তারপর দেখি বাছাধন কি ক'রবেন ?"

"যাবেন ? একটা দাঙ্গা-ফাঙ্গা হবে না তো ?"

"কিসের দাঙ্গা ? রাঁচীতে ব'সে আমার সঙ্গে দাঙ্গা ক'রতে আসে কোন শালা ?" ব'লে স্ত্রীকে হুকুম দিলেন তৎক্ষণাৎ বাঁধা-ছাঁদা ক'রে নিতে, এবং সেই রাত্রেই তিনি সপরিবারে রাঁচী রওনা হ'লেন ট্রেণে।

অনন্ত চ'লে গেলে বিকাশকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেলনা সে নাচতেই লেগে গেল।

গীতা সহাস্য মুখে এসে ব'ল্‌লে, "সঙ্! রঙ্গ দেখ না। নাচতে লেগেছ কেন ?"

বিকাশ ব'ল্‌লে, "দেখ কালই একটা জবর ভোজের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। কমলাদি'র বাড়ীর সবাইকে নেমন্তন্ন ক'রে!—ওর দেওরের পায়ের ধূলো নিতে হবে। আর বুদ্ধি নিতে হবে কেমন ক'রে আমার ঘাড় থেকে একেবারে এ ভুত নামে।

* * * *

কমলাকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবার পর তার মেজো দেওর বিভূতি তাকে জিজ্ঞেস্ ক'রেছিল, "হাঁ বউদি, তোমার বাবার তো অনেক টাকা-কড়ি ছিল—তার কিছু নেই ?"

কমলা ব'ল্লে, "জানি না ভাই কি ছিল, কি নেই। শুনেছি থাকবার মধ্যে ছিল, রাঁচীর বাড়ীখানা আর লাইফ ইনসিওরের টাকা।"

"তা সে সব তো এখন অমলের—অন্ততঃ রাঁচীর বাড়ী তো আছে।"

"বাড়ী তো আছে। আর কিছু আছে কি নেই জানি না।"

বাড়ীখানা দাদা একবার বেচবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু বিকাশ তা দেয়নি। তারপরে কিছু ক'রেছে কি না জানি না।"

বিভূতি তখন খোঁজ তল্লাস নিলে, অনন্তের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে তার চরিত্রটাও বুঝে নিলে। তারপর তার এটর্ণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে অনন্তকে চিঠি লিখলে।

"আপনাদের বাড়ীখানা দেখে ভারী ভালো লেগেছে। ওটা আমি দশ বছরের জন্য লীজ নেওয়া স্থির ক'রেছি। মাসে ২০০৲ টাকা ভাড়া দেব। আমি লীজ নিলে আপনি বাড়ীটা ছেড়ে দেবেন কি?"

অনন্ত আকাশের চাঁদ হাতে পেল। সে তখন চট্ পট্ সিদ্ধান্ত ক'রলে যে এ বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে বিকাশের কাছে গেলে একেবারে যাকে বলে পোয়া বারো। এই ভেবে সে লিখলে।

"তুমি আমাদের নিকট আত্মীয়। তোমাদের যদি সুবিধা হয় তবে তুমি লীজ নেবে তাতে আর আপত্তি কি? কিন্তু ভায়া ২০০৲ টাকা ভাড়া একটু কম হয়, সেটা একটু বিবেচনা ক'রো।"

উত্তর গেল।

"আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হ'লাম। দু'শো টাকা ভাড়াই ঠিক। আপনি কবে বাড়ী ছেড়ে দিতে পারবেন জানাবেন।"

এরপর খুব চট্‌পট্ সে বাড়ী ছেড়ে গেল। সে ভাবলে এই চিঠিতেই কাজ হ'য়ে গেল। ভূপতি কিন্তু এরপর অমলের নামে লীজ রেজেষ্ট্রী ক'রে দিলে ক'লকাতায় এবং যথাসময়ে রাঁচীতে সপরিবারে গিয়ে কিছুদিন থেকে এলো।

শ্যামলীর শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছিল না ব'লে কমলা তাকে নিয়ে সেইখানেই র'য়ে গেল।

অনন্ত যখন সপরিবারে রাঁচীতে ফিরে এলো তখন দেখতে পেলো ভূপতি ও তার কয়েকজন দ্বারোয়ান তার আগেই মোটরে সেখানে এসে গেছে।

ফটকেই তারা অনন্তর গাড়ী আটকাল।

অনন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি ক'রতে লাগলো যথেষ্টই, কিন্তু দ্বারোয়ানদের দেখে খুব বেশী ভরসা পেলো না।

তার পরিবার রইলো গাড়ীতে, সে নেমে বচসা ক'রতে লাগ'লো।

ভূপতি তখন বেরিয়ে এসে তাঁকে নমস্কার ক'রে ব'ল্লে "আসুন, বসুন এসে ভিতরে—আরে মেয়েদের ভিতরে নিয়ে যা'।"

বাইরের ঘরে অনন্তকে বসিয়ে চা দিয়ে ভূপতি ব'ল্লে, "হঠাৎ চ'লে এলেন আপনি!—কেন? ক'দিন থাকা হবে?"

লোকটার প্রসান্ত ঔদ্ধত্য অনন্তকে নির্ব্বাক ক'রে দিলে। এতটা বাহ্য সৌজন্যের উত্তরে কী রকম জবাব দেবে সে ঠিক স্থির ক'রতে পারছিল না। সে মুখ গম্ভীর ক'রে ব'ললে, 'এখানেই কিছুদিন থাকবো মনে ক'রছি।"

"তা বেশ! এখানে এখন বউদি একরকম একলাই আছেন, আমাদের আসতে এখনো তিন চার মাস দেরী, এ ক' মাস আপনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন।"

অনন্ত ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে বল্লে, "এ ক'মাস নয়, বারো মাসই আমি থাকবো এখানে।"

ভূপতি হেসে ব'ল্লে, "তা' হ'লে আমাদের অসুবিধা হবে। এখানে মাঝে মাঝে থাকবো ব'লেই লীজ নিয়েছি কি না!"

"সে লীজ আমি খারিজ ক'রে দেবো", এইবার উত্তেজিত হ'য়ে ব'ল্লে অনন্ত।

"আপনার তো এতে লাভ নেই। তাছাড়া আপনি বাড়ী ছেড়ে দিতে সম্মত

হ'য়েছেন ব'লেই আমি পয়সা খরচ ক'রে লীজ নিয়েছি, নইলে নিতাম না। আইনে এতে আপনার estoppel হয়।"

"মানে? আমি বাড়ী ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। তুমি ভাড়া নিয়ে এখন ব'লছ ভাড়া দেবে না, বাড়ী আমার নয়। এর আবার এষ্টপেল কি? আমি এখন তোমাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবো।"

হেসে ভূপতি ব'ল্‌লে, "চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। তাতে বিশেষ সুবিধা হবে না। দ্বারোয়ান ছাড়া আমার কয়েকটা বন্দুকও আছে। আর এখন যদি আমি আপনাদের রাস্তায় বের ক'রে দি, তাতে আপনার, বিশেষতঃ মেয়েদের বিশেষ অসুবিধা হবে। তার চেয়ে বরং আপনি একবার কোনও উকীলের বাড়ী গিয়ে—"

"আমি কোথাও যাবো না—যেতে হবে তোমার। নইলে ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেবো,"—ব'লে লাঠি তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো অনন্ত।

সেই সময়ে সেই ঘরে এসে ঢুকলেন একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও জনকয়েক কনেষ্টবল। অনন্ত আসতেই গোলযোগের আশঙ্কায় ভূপতি থানায় টেলিফোন ক'রে দিয়েছিল।

অনন্ত ভয়ানক ঘাবড়ে গেল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু এসে ব'ল্‌লেন, "কি অনন্তবাবু ব্যাপার কি?"

উৎসাহিত হ'য়ে অনন্ত ব'ল্‌লে, "মগের মুল্লুক মশায়, মগের মুল্লুক! একেবারে তেমহলা বাড়ী চুরী।" বলে সে তার পক্ষে যা কিছু বলবার ছিল ব'ল্‌লে। ভূপতি তার লীজ, অনন্তের সঙ্গে তার চিঠিপত্র সব দেখালে।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু বললেন, "আমি উকীল নই, কিন্তু আমি যতদূর বুঝেছি—ভূপতিবাবু লীজ আপনার কাছে নেবেন এমন কথা তো কখনও বলেন নি, আপনিও আপনার চিঠিতে সেকথা লেখেন নি। যে লীজ তিনি নিয়েছেন, তার কথাই ভূপতি বাবু লিখেছিলেন আর লীজ নিলে আপনি বাড়ী ছেড়ে দিতে স্বীকার হ'য়েছিলেন।"

কাঁপতে কাঁপতে অনন্ত ব'ল্লে, "আমার কাছেই লীজ নিতে চেয়েছিল। তাই তো এর স্পষ্ট মানে। নইলে আমাকে লীজের জন্য চিঠি লিখতে যাবে কেন?"

"সে তো বোঝাই যাচ্ছে, আপনি বাড়ীতে বাস ক'রছেন, উনি আপনার আত্মীয়, আপনাকে উচ্ছেদ ক'রতে পারবেন না—তাই জিজ্ঞেস ক'রেছেন আপনি বাড়ী ছাড়বেন কিনা?"

এখন চিঠিগুলো প'ড়ে অনন্ত আবিষ্কার ক'রলে এই কথাই ঠিক—এবং সে ঠকেছে। তবু সে চীৎকার ক'রে ব'ল্লে, "স্রেফ জুচ্চুরী মশায়—জুচ্চুরী। আমি ও লীজ মানি না। বাড়ী আমার, আমি ওকে দেবো না।"

ইন্স্পেক্টার ব'ল্লেন, "সে স্বত্ব আপনি আদালতে প্রমাণ করুন গে। এখন ওঁর দখলে কোনও বিঘ্ন ক'রলে আমি আপনাকে হয় তো গ্রেপ্তার ক'রতে বাধ্য হব।"

ভূপতি জিভ কেটে ব'ল্লে, "আরে ছ্যা ছ্যা, ইন্স্পেক্টার সাহেব। উনি আমার আত্মীয়; এসেছেন ক'দিন থাকবেন, তার জন্য গ্রেপ্তারের দরকার নেই। তা' অনন্তবাবু আপনি বরং আমাকে এই চিঠিখানা সই ক'রে দিন, তা' হলেই সব গোল মিটে যাবে—আপনি যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকবেন, কেউ বাধা দেবে না।"

ব'লে সে এটর্নী আফিসের মুসাবিদা মত টাইপ করা একখানা চিঠি বের ক'রে অনন্তর সামনে ধ'রলে। তাতে লেখা আছে,

"তুমি নাবালক অমলের পক্ষে তার গার্জ্জিয়ানের কাছে এ বাড়ীর লীজ নিয়েছ। আমরা এখন এ বাড়ীতে থাকতে পেলে বিশেষ সুবিধা হয়। তুমি অনুমতি দেওয়ায় আমি কেবল লাইসেন্সী হিসাবে এ বাড়ীতে বাস ক'রছি।"

চিঠি প'ড়ে, "কক্ষণো না" ব'লে অনন্ত লাফিয়ে উঠলো।

ভূপতি বললে, "সে আপনার ইচ্ছে, আমি জোর করতে পারি না। কিন্তু

তা হলে আমার আপনাদের এ বাড়ী থেকে চলে যেতেই বলতে হচ্ছে নিরুপায় হয়ে—দ্বারোয়ান, গড়ীটা আছে তো—ভিতরে আনতে বল। মালগুলো উঠাও আবার।"

"খবরদার!" বলে অনন্ত তেড়ে যেতেই ইনস্পেক্টার তার হাতে মৃদুস্পর্শ ক'রে বললে, "মিছে হাঙ্গামা বাঁধাবেন না অনন্তবাবু, শান্তি-ভঙ্গ কোনও মতে হলে আপনাকে গ্রেপ্তার না করে আমার উপায় থাকবে না। তার চেয়ে আপনি চুপ চাপ চলে গিয়ে উকিলের পরামর্শ নিন।"

অনন্ত গিয়ে চুপ করে চেয়ারে ব'সে প'ড়লো। মাথায় হাত দিয়ে খানিক-ক্ষণ ভাবলে। পেটের ভিতর তখন ক্ষিদেয় চন্ চন্ ক'রছে!

শেষে ফস ক'রে ভূপতির চিঠির খসড়াটা টেনে নিয়ে সই করে ভূপতিকে দিলে।

ভাবলে—চোরের রাত্রিবাসই লাভ। স্বত্ব যখন তার কিছুই নেই, তখন এখানে যে করে হোক বাস ক'রবার ব্যবস্থাই হোক। তারপর হয় তো অন্য উপায় বের হবে।

সে রয়ে গেল।

বরাবরই রয়ে গেল। এ বাড়ী ছেড়ে একদিনের তরেও সে কোথাও যাবার নামটিও করে না এখন—কে জানে পাছে গেলে আর আসতে না পায়।

ভূপতি কলকাতায় ফিরে গেলে বিকাশ তাকে দেখেই তড়াক ক'রে উঠে বললে, "পায়ের ধূলো দাও দাদা—মাদুলী করে'রেখে দেবো!"

## কুড়ি

বছর খানেক পর বিকাশ একখানা চিঠি পেল, লিখেছেন তার বৌদি। অনন্তের স্ত্রী। চিঠিখানা এই:

"ঠাকুর পো,—না খেয়ে মারা যেতে বসেছি! এটা একটুও অত্যুক্তি নয় একেবারে ছাঁকা সত্যি। তোমার দাদাকে তো জান, চিরদিন জ্যাঠামশাইর অর্থে বাবুগিরি করেই জীবন কেটেছে। জ্যাঠামশাই যাবার পর হাত গুটোবার কোন াই করেননি, যা কিছু সম্বল ছিল মায় আমার গয়নাপত্তর শুদ্ধ সব নষ্ট করেছেন। তারপর যখন তোমার কাছে গেলাম, ভেবেছিলাম এইবার বুঝি দুঃখের দিন গেল। কিন্তু তাও হোল না, এখানে ফিরে এসে কমলা যতদিন ছিল, ততদিন সে চালিয়েছে। যাবার সময় সে আমাকে কিছু দিয়েও গিয়েছিল। এখন সংসার একেবারে অচল। ওঁর সে বিষয়ে কোন চিন্তাও নেই। কোন রোজগারের চেষ্টা কোন দিন করেন নি, এখনও করেন না। কেবল কোথায় কাকে ফাঁকি দিয়ে কি রকম ক'রে দু'পয়সা পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা।"....

"নিরুপায় হয়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। তুমি থাকতে কি আমরা না খেয়ে মরব! ছেলে বয়স থেকে তোমার সঙ্গে একসঙ্গে একজনের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছি। আমরা না খেতে পেলে, তুমি শুধু চেয়ে দেখতে পারবে না, এই ভরসায় তোমাকে আমার দুঃখ জানাচ্ছি। যাতে দুটো খেতে পাই তার ব্যবস্থা দয়া করে ক'রো।"

চিঠিখানা পেয়ে বিকাশের মনের ভেতর মুচ্‌ড়ে উঠল। অবশ্য বৌদিদির কাছে সে কোনদিনই খুব যে অতিরিক্ত যত্ন, আদর বা ভালবাসা পেয়েছে, তা নয়।

তবে তার ওপর তার কোন রাগেরও কারণ ছিল না। যতদিন মেশোমশাই বেঁচে ছিলেন, ততদিন সে বড় ঘরের বৌয়ের মত থেকেছে। তার আজ এতখানি দুঃখ হয়েছে ভাবতে সে দারুণ অস্বস্তি বোধ করল।

কিন্তু গীতার কাছে এ কথা তুলতেও তার সাহস হল না। বৌদিদিকে সাহায্য করবার কোন কথায় গীতা যে খুব উল্লাসিত হয়ে উঠ্‌বেনা, তা' সে আন্দাজ করতে পারলো। অনন্ত ও তার গুষ্টীর ওপর গীতার যে কতখানি

ভালবাসা আছে, তা জানবার অবসর তার যথেষ্টই হয়েছিল। এখন তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য টাকা পাঠাবার প্রস্তাব করলে, গীতা যে বক্তৃতা করবে তা সে অনেকটা মনে মনে আঁচ করতে পারল।

অথচ তারা না খেয়ে মরবে এই বা কি করে হয়?

বিপদ এই যে গীতাকে না জানিয়ে কোন টাকা পাঠাবার উপায় তার নেই। তার কবে কোন টাকা আসে সে খবর গীতা বরাবরই রাখে। আর বাড়ীতে যা আসে সে টাকা গীতার কাছেই থাকে। ব্যাঙ্কের পাশ বই ও চেক বই তার আলমারীতেই, সুতরাং গীতা ছাড়া টাকা পাবার উপায় নেই।

চিঠিখানা সে গায়েব করলে। সেখানা পকেটে করে সে আপিসে গেল। আপিসে যতক্ষণ ছিল, চিঠিখানা যেন তার বুকের ভেতর খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল।

শেষে শেষ বেলায় সে মুখুজ্জেকে বৌদির ঠিকানা দিয়ে বল্লে "দেখ, এই ঠিকানায় আজ দুশো টাকা পাঠিয়ে দাও। খরচটা আমার নামে লিখো না, আর আমিই যে টাকা নিয়েছি, একথা কাউকে বোল না।"

টাকাটা পাঠানো হলে সে অনেকটা স্বস্তি অনুভব করলে, ভাবলে, অন্ততঃ একটা মাস বৌদির একটা উপায় হবে।

বাড়ী ফিরে এলে চা খাওয়ার পর গীতা তাকে বল্লে "দেখ, বৌদি চিঠি লিখছে। ভারী কষ্ট হয়েছে বেচারার।"

বিকাশ চিঠিখানা দেখল, ঠিক তাকে যেমন করে লিখেছেন, গীতাকেও তেমনি করেই লিখেছেন। গীতার মন তাতে নরম হয়েছে দেখে সে একটু আশ্চর্য্যই হল, কিন্তু খুসী হল। ভাবলে মিছেমিছি গীতার কাছে লুকোচ্ছিলাম, এখন টাকা পাঠাবার কথা ওর কাছে বলে ফেলা যাক্।"

গীতা ব'লে গেল, "আহা বেচারা! ছেলেপেলে নিয়ে ভারী কষ্ট হয়েছে তার। আমি আজ তাঁকে দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।"

টাকা পাঠাবার কথাটা বিকাশ ব'ল্‌বার জন্ম মুখ খুলেছিল কিন্তু গীতার শেষ কথাটা শুনে মুখ বুজে তার অস্ফুট কথাটা গিলে ফেললে।

গীতার মনে দুঃখ হয়েছে বৌদির জন্ম ; কিন্তু তার সহানুভূতির দৌড় দশ টাকা পর্য্যন্ত। দুশো টাকা পাঠাবার কথা শুনলে সে নিশ্চয়ই আঁৎকে উঠবে, তাই কথাটা চাপাই রইল।

এর পর বিকাশ ভাবলে যে, এই দুশো দশ টাকাতেই বৌদির দুঃখের অবসান হবে না। এরপর আরও অনেক টাকাই পাঠাতে হবে। তা ছাড়া এমনি লোকের দুঃখ কষ্ট দেখে বিকাশের অনেক সময় মনে হয়—কিছু টাকা-পয়সা দিতে, কিন্তু পারে না। কেন না টাকা তার হাতে আসবার আগেই গীতা খরচের প্ল্যান ঠিক করে নেয়। কেবল তার পাটের ব্যবসা সংক্রান্ত কোন খরচ-পত্র ছাড়া এক পয়সাও সে নিজে আগে থেকে প্ল্যান করে খরচ করতে পারে না।

তাই সে স্থির করল যে, গীতার কাছে লুকিয়ে কিছু টাকা না রাখলে আর চলে না।

গীতার চক্ষু কর্ণ এত সজাগ আর সে বিকাশের বৈষয়িক ব্যাপারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে এত সংবাদ রাখে যে তার চোখে ধুলো দিয়ে টাকা সরান ব্যাপরটা খুব সহজ মনে হ'লনা। কিন্তু তবু সে চেষ্টা করতেই হবে।

এরপর একদিন গীতা তাকে বল্‌লে, "দেখ ওই যে উত্তরে তোমার দশ কাঠা পুকুর-ভরাট জমি আছে, ওটার আমি বন্দোবস্ত দিয়ে ফেলেছি।" চমকে উঠে বিকাশ বল্‌লে, "বন্দোবস্ত দিয়ে ফেলেছ কাকে ? কিসের জন্ম ?"

"ওই পশ্চিমের বস্তির বাড়ীওয়ালাটা চাইলে ওই জমিটা বস্তি করবার জন্ম। বল্লে, সব খরচ-খরচা ওর। খাজনা দেবে কাঠা পিছু পাঁচ টাকা আর সেলামী পঞ্চাশ টাকা।" আমি দিয়ে দিলাম। ওটা তো পড়েই রয়েছে, ওখানে বাড়ী তো এখন হবে না। দু'পয়সা আয় হয় মন্দ কি ?

ওই জমিটা সম্বন্ধে বিকাশের মনে মনে একটা সঙ্কল্প গড়ে উঠবার চেষ্টা

ক'রছিল। এ পাড়ার একটা সেবাশ্রম আছে। তারা জমি পেলে সেখানে একটা 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে পারে এরকম বিকাশ শুনেছিল। কথাটা শুনে বিকাশ মনে মনে ঠিক করেছিল, এই জমিটা সে তাদের দিয়ে দেবে।

মনে মনেই সে ঠিক করেছিল, কিন্তু মুখ ফুটে তাদের বল্‌তে সাহস পায়নি। কেন না দশ কাঠা জমি অমনি অমনি দিয়ে দেবার কথা শুনলে গীতার খুব প্রসন্ন হবার কথা নয়। কেমন করে গীতার কাছে কথাটা ভাঙ্গা যাবে এবং কি রকম করে গুছিয়ে বল্‌লে তার সম্মতি আদায় করা যাবে এই নিয়ে সে মনে মনে গবেষণা করছিল মাত্র।

গীতার কথাটা শুনে তার মনে হল সে নিশ্চয়ই কোন রকমে বিকাশের মনের বাসনাটা জানতে পেরেছে এবং সেইজন্য সাত তাড়াতাড়ি জমিটা বন্দোবস্ত দিয়ে বসেছে। যাক্ জমিটা যখন বেহাত হয়েই গেল, তখন উপায় নেই। বিকাশ আরো দৃঢ়তর সঙ্কল্প করলে যে, এমন একটা চোরা তহবিল তার করতে হবে—যার খবর গীতা মোটেই জানতে পারবে না।

দেখতে দেখতে বস্তির ঘর গ'ড়ে উঠল। টিনের ছাউনি—ছিটে বেড়ার ঘর, পাকা মেঝে। সেকালে তার হষ্টেলের নীচে যে কাঁচা মেঝের বস্তী ছিল তার চেয়ে অনেকটা ভালই। দেখতে দেখতে ঘরগুলি ভরে গেল নানাজাতির বাসিন্দায়। ছুতোর, মিস্ত্রী, মজুর, ফেরিওয়ালা, ধোপা, নাপিত কত লোক সপরিবারে বা অপরিবারে সে ঘরের মধ্যে গিজ গিজ ক'রে বাস করতে লাগল। তাদের বেশীর ভাগই অপরিচ্ছন্ন দীন-দরিদ্র। সামান্য দু'চার জন অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, তাদের ঘর দোর পরিষ্কার থাকে। কাপড় চোপড় পরিচ্ছন্ন।

কয়েক বছর আগের কথা মনে হল বিকাশের। যখন সে হষ্টেলে ছিল,-তখন এই বস্তী-জীবনের কতকটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সে লাভ ক'রেছিল। ঐসব চক্‌চকে চেহারার তলায় বস্তীজীবনে কত যে দৈন্য আত্মগোপন ক'রে আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশধারী স্বামীর চেহারা বজায় রাখবার জন্য স্ত্রীদের

যে কি প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রতে হয়—হয়তো অর্দ্ধাহারে থেকেও তা সে দেখছে। কাবুলী পাওনাদারের দাবীর ভয়ে পরিবারের শুক্‌নো মুখ সে দেখেছে।

সেদিন সেই বস্তীবাসীদের দুঃখে তার অন্তরে যে ব্যাকুলতা জেগে উঠেছিল সে কথা আজ স্মরণ হ'ল। তারপর হঠাৎ কাশী পালিয়ে গিয়ে সে দারিদ্র্য ও অনাহারের শঙ্কায় যে কি আকুল হয়েছিল তা' মনে প'ড়লো।—মনে প'ড়লো তার সেদিনকার প্রতিজ্ঞা, পাঁচশো টাকার বেশী সে যা উপায় ক'রবে সে বিলিয়ে দেবে দরিদ্রের সেবায়।

একটু হাসি পেল তার। পাঁচশো টাকা, টাকা কী সামান্য টাকা, তাতে কিই বা হয়? অনভিজ্ঞ ছেলেমানুষের সে প্রতিজ্ঞা, ওটা অবশ্য কিছুই নয়।

কিন্তু তবু মনে হ'ল, অনেক পাঁচশো টাকাই সে আজ উপায় করে, কিন্তু দেশের দরিদ্রের হিতের জন্য সে তো কিছুই করে না। এতদিন সে হন্তদন্ত হ'য়ে রোজগার ক'রেছে, প্রথমে মাসিমার সৌখিন অভাব মেটাবার জন্য, মেসোমশায়ের বৃহৎ পরিবারকে আগের মত আরামে রাখবার একট দুর্ধর্ষ চেষ্টায়। সে চেষ্টা তার অনেক অংশে সফল হ'য়েছে, কিন্তু দেশের যে কোটী কোটী লোক তাদের চেয়ে অনেক বেশী দুঃখী, তাদের জন্য সে কী ক'রেছে। তারপর তাঁদের ভার তো গেছে, এখনই বা সে কী ক'রেছে? টাকা রোজগার ক'রেছে প্রচুর, কিন্তু তাতে হয় সে নিজের অভাবের পর অভাব সৃষ্টি ক'রে খরচ বাড়াচ্ছে, ভাল বাড়ী থেকে আরও ভাল বাড়ী করেছে, ভাল গাড়ী ছেড়ে আরও ভাল গাড়ী, আরও ভাল আসবাব ক'রেছে, না হয় সম্পদ আরও বাড়াবার জন্য আজ জমী কিনেছে, কাল বাড়ী, পরশু শেয়ার, তার পর কোম্পানীর কাগজ। এই ক'রে অভাব তার মেটা দূরে থাকুক, শুধু বেড়েই যাচ্ছে। রোজগার যতই বাড়ছে, ক্রেডিট যত বাড়ছে, তার দেনাও তেমনি বাড়ছে, তাই দিনকে দিন তার ব্যস্ত হ'য়ে থাকতে হ'চ্ছে, আজ হুণ্ডীর টাকা জোগাড়ে, কাল জমী বাড়ীর কিস্তী

দিতে, পরন্ত শেয়ারের কল দিতে! যখন যে পয়সা পায় সে, তার সবটাই তাঁর যায় এই সব দেনা মেটাতে—না হয় গীতার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে রোজ নতুন দায়িত্বযুক্ত সম্পদ সংগ্রহ ক'রতে। এত টাকা তার রোজগার, তার এক পয়সা ব'লতে গেলে সে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত খরচ ক'রতে পারে না। এমন শক্তি তার নেই যাতে আজও পাঁচ সাত কি দশ হাজার টাকা লোকহিতার্থে ব্যয় করতে পারে।

—সেই সে যা একবার দিয়েছিল সুবোধকে—তা' ছাড়া কোনও টাকাই সে লোকহিতে খরচ করে নি। নাক মুখ বুজে সে শুধু টাকাই রোজগার ক'রে চ'লেছে—নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ তার নেই। অথচ মনের সুখে টাকা খরচ ক'রে যে তৃপ্তি পাবে, সে উপায়ও তার নেই।—যে টাকা হয়তো সে এমনি খরচ ক'রতে পারতো, গীতার হিসাবের প্যাঁচে প'ড়ে সে যায় উধাও হ'য়ে।

—আজ তার মনে এলো একটা দারুণ অবসাদ। কী লাভ এতে? কেন এ ভূতের বেগার খাটা? মনে প'ড়লো তার মেসোমশায় চিরজীবন এমনি ভূতের বেগার খেটেই গেছেন। তাঁর সম্পন্ন জীবনে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শান্তিসুখ কমই পেয়েছেন। তাদের এ জীবনের পাশে সুবোধের জীবন, মনে হ'ল কি সার্থক, কি তৃপ্তিদায়ী সে!

এর চেয়ে ঢের ভাল হ'ত যদি সে প্রথম যৌবনের উৎসাহে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রতো, যদি নিজের সামান্য গ্রাসাচ্ছদনের জন্য টাকা রেখে অবশিষ্ট উপার্জ্জন ক'রতো লোকহিতের জন্য।

—সে হ'তে পারতো, যদি মেসোমশায়ের প্রতি একটা নিরর্থক কৃতজ্ঞতার বশে গোড়া থেকে নিজের হাত পা বেঁধে না ফেলতো, যদি বিয়ে না ক'রতো—যদি পাটের ব্যবসার জটিল প্যাঁচে বাঁধা না প'ড়তো—ফল কথা—যদি, যা' সে হ'য়েছে সে না হ'য়ে সব অন্যরকম হ'ত।—এখন? এখন আর তা' হয় না যে ঠাট সে গ'ড়ে তুলেছে, এখন তা' বজায় রাখতেই হবে। গীতাকে সে তো সম্পদের ভিতর আমন্ত্রণ ক'রে এনেছে, তা' থেকে সে তাকে বঞ্চিত ক'রতে

পারে না—আর—আর সে চেষ্টা করবার সাহসও তার নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবলে—গীতা যদি মালতীর মত হ'ত। তার ছেলেমেয়েরা যেভাবে মানুষ হ'চ্ছে এই ভাবেই তাদের রাখতে হবে। বড়লোক তার হ'তেই হবে। বড়লোক না হবার বা বড়লোকী না করবার স্বাধীনতা তার নেই।

হায়, যদি অন্ততঃ বিয়ে ক'রে সে তার স্বাধীনতা না হারিয়ে ব'সতো। একদিন সে চুপি চুপি গেল ঐ বস্তীটার দিকে। একটা অসহ্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলে একটা ছোট ছেলে ক্ষিদেয় কাঁদছে, তার মা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে কোনওরকমে লজ্জা নিবারণ ক'রে ব'সে ছেলেটাকে দামাদম মারছে।—মেরে কেঁদে সে ব'লছে, পোড়া কপাল আমার, সারাদিনে একদানা খাবার দিতে পারলাম না ছেলেটাকে। ওদিকে এক কাবলীওয়ালা এক দেনাদারের গলায় গামছা দিয়ে হিড় হিড় ক'রে টানছে। বুকের ভিতর চড় চড় ক'রে উঠলো তার। ইচ্ছা হ'ল ছুটে গিয়ে এদের টাকা দিয়ে আসে। কিন্তু হাত পা নড়লো না। মনে হ'ল, লোকগুলো ভাববে কি?—আর গীতা শুনলেই বা ভাববে কি? সে ফিরে গেল। কথায় কথায় গীতাকে সে তার মনের কথা খানিকটা ব'লেই তার মনে হচ্ছিল এই বস্তীবাসীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে খবর নিয়ে তাদের অভাব কষ্ট দূর করে। সেই কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব কেটে ছেঁটে ছোট ক'রে খানিকটা মাত্র ব'ল্লে; ব'ল্লে, "দেখ গীতা, ওই বস্তীর লোকগুলোর কত দুঃখ! ওদের ঐ দৈন্যের পাশে বাস ক'রে এতটা বড় লোক হ'তে লজ্জা করে আমার।—ওদের জন্য কিছু করা—"

গীতা হেসে উঠলো। এমন অদ্ভুত কথা সে জন্মে কখনও শোনে নি, সে ব'ল্লে, "তুমি উপায় কর বেশী, তোমার নিজের টাকায় তুমি আরাম ক'রবে এতে লজ্জা হবার কি? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছে কেউ কখনও?"

তার এই হাসিতে বিকাশ একেবারে চুপসে' গেল। আর ভারী লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হ'ল—যেন সত্যি একটা ভারী হাস্যাস্পদ কথাই ব'লে ফেলেছে। তাই লজ্জাটা এড়াবার জন্য এর চেয়ে কম হাস্যাস্পদ একটা ব্যাখ্যা করা

আবশুক বোধ ক'রলে না। সে ব'ল্লে, "মানে—দেশে এত গরীব লোক, ওদের ভাগ্য মন্দ; আমাদের ভাগ্য ভাল", কথাটা শেষ ক'রলে না। তার নিজেরই মনে হ'ল এতে তার যুক্তি বেশী কিছু জোরাল বা কম নাটুকে হ'ল না।

"তুমি রোজগার ক'রেছ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তোমার বুদ্ধির জোরে। তুমি ওদের মানা ক'রছ এমনি রোজগার ক'রতে? যে যা পারে করুক না! শুধু ভাগ্যির কথা তো নয় এ, যুগ্যিও হওয়া চাই।"

অবশ্য এ বিষয়ে বিকাশ গীতার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে তার যে আজকের সম্পদ তা' তার যোগ্যতারই পুরস্কার, বরং সে মনে করে যে তার যোগ্যতা যতখানি ততখানি পুরস্কারই বরং সে পায় নি। রাম, শ্যাম, যদু প্রভৃতি অনেক লোকের নাম সে মুখে মুখে ব'লে দিতে পারে—যাদের বিদ্যা বুদ্ধি তার তুলনায় একেবারে টুঁ টুঁ, তবু তারা—ওঃ! কি উপায়টাই ক'রছে। যোগ্যতার যদি পুরস্কার থাকতো তবে তার ওদের চেয়ে ঢের বেশী রোজগার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কপাল তার, তাদের তুলনায় সে কিছুই পায় না।

বিকাশ ব'লল্লে, "তা বটে, তবু কি জান, গরীব হওয়ার বড় দুঃখ, একদিন আমার একবেলা শুধু একমুঠো ছাতু খেয়ে থাকতে হ'য়ে ছিল।"

"তাই নাকি? সে আবার কবে?" হেসে জিজ্ঞেস ক'রলে গীতা।

বিকাশ থমকে গেল। যেন চ'লতে চ'লতে সে একটা ভয়ানক গভীর গর্ত্তের ভিতর পা ফেলেছিল আর কি! সে দিনকার ব্যাপারের মধ্যে একটা মস্ত বড় লজ্জার কথা আছে যা' সে জগৎ থেকে চেপে রাখতে চায়, তাই অসাবধানতায় এতখানি ব'লে গীতার জেরার পাল্লায় পড়বার আশঙ্কায় সে ভয় পেয়ে গেল।

সে বললে, "এই কলেজে থাকতে একদিন। অনেক দূরে চ'লে গিয়েছিলাম, হাতে পয়সা ছিল না তাই।"

"ওমা, তাই নাকি—কতদূর গেছলে? কোথায়?"

বিকাশ ঘেমে উঠলো। সে বললে, "এই ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তায় অনেক দূর!"

"তারপর কি ক'রলে?"

"এই রেলের লাইন ধ'রে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে উঠে প'ড়লাম। যাক গে সে কথা নয়, বলছিলাম কি, আমাদের ভাগ্য ভাল, ওরা দুর্ভাগ্য। আমাদের উচিত গরীবদের জন্যে কিছু করা।"

"আর কি ক'রতে চাও! কত ভিক্ষে তো রোজ দিচ্ছি, কত লোককে তো সাহায্য ক'রছি—এই তো সেদিন বউদিকে দশ টাকা পাঠিয়ে দিলাম। আর কি করবে? নিজের ছেলেপিলেদের ভাসিয়ে দিয়ে সব ধন বিলিয়ে দেবে গরীবদের?" ব'লে সে হেসে উঠলো এই উন্মাদের কল্পনার অসম্ভাব্যতা স্মরণ ক'রে।

"আর তাতেই বা কী হবে? তোমার সব যদি গরীবকে দাও, প্রত্যেকের ভাগে একটা কাণাকড়িও প'ড়বে না। কেউ বেশী ধনী হবে না তাতে। তোমার হাতে থাকলে অন্ততঃ তোমার ছেলেপিলে সুখে থাকবে।"

থতমত খেয়ে বিকাশ বললে, "না তা' বলছিনা। তবু আমাদের ভাবা উচিত যে গরীবদের উপকারের জন্যে কী আমরা করতে পারি।"

"ভাব। ভেবে থই পাবে না। কত মহাপুরুষ হার মেনে গেলেন, আমরা আর কি ক'রতে পারি।" ব'লে ঠোঁট বেঁকিয়ে উঠে গেল গীতা।

সে ভাবলে, কী উদ্ভট খেয়াল সব মাথায় আসে বিকাশের। ও সব পারে। চাই কি ওর কাছে যদি হাজার দু'হাজার টাকাও থাকে, পথের ধারে একটা ভিকারীকে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে তা'।

সে আরও প্রতিজ্ঞা ক'রলে, বিকাশের হাতে ফালতু টাকা কোনও মতেই জমতে দেওয়া হবে না। দিলেই হবে অপচয়।

বিকাশ বিরক্ত হ'য়ে ভাবলে গীতার সঙ্গে তার মনের কোনও যোগসূত্রই নেই—বিকাশের মনে যে-সব কথা, তার গভীরতম অন্তরের যে সত্য আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ, গীতার মনের একশো মাইলের মধ্যেও তারা পৌঁছুতে পারবে না।

যাকগে, এ কথা আর তার কাছে তুলবে না সে। বীরের মত এই প্রতিজ্ঞা

সে ক'রলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব ক'রলে যে আসল কথাটা এই যে, এ কথা সে তুলতে সাহস পাবে না।

কেন? ভয়টা কিসের? গীতাকে তার ভয় করবার কী আছে? ব'লে তার অন্তরাত্মা তাকে সাহস দিতে আসে, কিন্তু—ঐ যে হাসি—ঐ টিটকারী গীতার মুখে ও শুনলেই যে তার প্রাণটা সঙ্কোচে একেবারে চুপসে যায়।

—গীতার সঙ্গে তার সমগ্র সম্পর্কটা আলোচনা ক'রলে বিকাশ!

কোথা যেন কি একটা গোল হ'য়ে গেছে। খুব ছেলেবেলায় যখন গীতাকে বিকাশ অত্যন্ত ছোট্টটি মনে ক'রতো—যেমন ছোট ছেলেপিলেরা সবাই পাঁচ বছরের ছোটদের মনে ক'রে থাকে—তখন বিকাশ ছিল সর্দ্দার, লীডার, একেবারে ক্যারার বললেই হয়। তার ইঙ্গিতে আর সব ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে গীতাও উঠতো বসতো। বিকাশ যা' ব'লতো তাই ছিল গীতার কাছে বেদবাক্য। তারপর যখন আর কিছু বড় হ'ল, তখনও গীতা অনেক কথা শিখলেও, বিকাশের তার উপর প্রভুত্ব একেবারেই অক্ষুণ্ণ! তার কোনও কথার উপর গীতা কিছু ব'লতে গেলে বিকাশ অম্লানবদনে তার জ্যাঠামো ডেঁপোমীর জন্য তিরস্কার ক'রতো বা পরিহাস ক'রে পাগল ক'রে দিত। তবে ঠাট্টার ভয় গীতা খুব বেশী ক'রে করতো তার চিমটি বা চড় চাপড়ের চেয়েও।

তারপর হ'ল বিয়ে। এমন কোনও কথা নেই যে বিয়ে হ'লেই মেয়েরা সাঁ ক'রে দশ বারো বছর বেড়ে যায়। গীতা যত ছোট ছিল বিকাশের চেয়ে তাই রইলো। বিদ্যা-সাধ্যি তার এক ইঞ্চিও বাড়লো না। বিকাশের বিদ্যা বাড়লো, বুদ্ধি বাড়লো, সম্পদ্ বাড়লো, এ সব কোনও দিক দিয়েই সে গীতার নাগালের ভিতর নয়। আর আসল কথা ব'লতে গেলে এই বিয়ের ফলে গীতা তার অশন, বসন, অলঙ্কার, বিলাস প্রভৃতি যা কিছু সবার জন্যই একান্ত মুখাপেক্ষী হ'য়ে প'ড়লো বিকাশেরই—বিকাশ মুখ ফিরালে আর তার দাঁড়াবার ঠাঁই রইলো না।

শাস্ত্র ও সমাজবিধিও বলে, অর্থনীতিতেও হয় তো এই কথা বলে যে যার এমনি নির্ভর করতে হয় স্বামীর উপর—যার মরণ বাঁচন, মান-সম্মান সব ব'লতে

গেলে তার হাতে, সেই স্ত্রীই ক'রবে স্বামীকে বাঘের মত ভয়, তার কথায় উঠবে ব'সবে, সর্ব্বদা তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকবে—তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না একটুও। আর এমন একটা দুটো নয়, দু'পাঁচ হাজার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক এই শাস্ত্রসঙ্গত আদর্শে চ'লে থাকে।

কিন্তু বিকাশের বেলায় হ'য়েছে এর সম্পূর্ণ বিপর্য্যয়। মূর্খ না হলেও গীতা বিকাশের পাশে কিছুই নয়—তবু তার মুখ চেয়ে কথা কইতে পারে না বিকাশ, কথায় কথায় তার শাসন মেনে না নিয়ে পারে না, তার একটু রাগের আভাসে অধীর হ'য়ে যায়, তার বিদ্রূপের হাসি শুনলে লজ্জায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।

একথা নিয়ে যখন সে বিস্তর গবেষণা ক'রে একটা কোন সঙ্গত হেতু খুঁজে পাচ্ছে না, তখন তার অন্তরাত্মা নাসাকুঞ্চিত ক'রে ব'লে উঠলো, "এর কারণ—তুমি কাপুরুষ!"

কাপুরুষ! কে বলে তাকে? ফুটবল মাঠে, হকির মাঠে ইয়া ইয়া সব হাইল্যাণ্ড গোরাকে সে কত ঘায়েল ক'রেছে, কোনও মিঞা তার কাছে বল নিয়ে ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করতে সাহস পায়নি। সে কাপুরুষ?—তা ছাড়া ফুটবলের মাঠে দু' দু' বার বড় দাঙ্গা হ'য়েছিল। বিকাশ তখন এক হকিষ্টিক্ নিয়ে দু'শো গুণ্ডার মাঝে ছুটে গিয়ে এক ডজনকে একঠেঙ্গো দৌড় করিয়ে ছেড়েছিল। সে কাপুরুষ? বক্সিং-এ সে বেশী সুবিধা ক'রতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু যে কয়দিন সে খেলেছিল, সে কয়দিন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভীষণ মুষ্টিযোদ্ধারা যখন তার নাকে খুথে দমাদম পিটোন দিয়েছে, তাতে প'ড়ে গিয়েছে সে—কিন্তু পেছপা কখনও হ'য়েছে?

অন্তরাত্মা ব'ললে গুণ্ডামিতে তুমি অদ্বিতীয় হ'তে পার কিন্তু নৈতিক মেরুমজ্জা তোমার নেই! নইলে মিথ্যা টিটকারীর ভয়ে, নিন্দার ভয়ে হষ্টেল ছেড়ে পিট্টান দিয়েছিলে কাশী—সেই কাপুরুষতা—সেই মেরুমজ্জার অভাব তোমাকে গীতার কাছে ভেড়া ক'রে রেখেছে।

বটে! ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলে সে, আর নয়। গীতাকে সে আজ থেকে অগ্রাহ্য ক'রবে। তার মতামত শুনবেই না, কথা ব'লতেই দেবে না।

প্রতিজ্ঞার ফলে ভয়ানক কিছু সে তাড়াতাড়ি ক'রে বসলো না, শুধু সেদিন আফিস থেকে যে এক হাজার টাকা পেলো, তা' থেকে দু'শো টাকা চুরী ক'রে সে তার আফিসের ড্রয়ারের কাগজের তলায় রেখে দিলে।

আটশো টাকা এনে গীতার হাতে দেবার সময় কিন্তু সে তার মুখের দিকে ভাল ক'রে চাইতে পারলে না। চট্ পট্ টাকাটা দিয়েই সে ব্যস্তভাবে ঢুকে প'ড়লো বাথরুমে।

সে ভ'ড়কে গেল বিশেষতঃ এই দেখে যে গীতা টাকাটা নিলে মুকখানা ভার ক'রে—চোখ দুটো টান ক'রে—এমন একটা ভাব ক'রে যা দেখলে বরাবরই বিকাশের শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা সুড়সুড়ির মত ব'য়ে যায়।—বুকটা তার কেঁপে উঠলো।—এ দুশো টাকা চুরীর খবর কি এর মধ্যেই গীতা পেয়ে গেছে?

তা' সে পায়নি, কিন্তু যা পেয়েছে সেও কম নয়।—

চা খাওয়ার সময় গীতা বিকাশের দিকে এমন একটা অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইলো যে বিকাশ চোখে চোখে চাইতে পারলে না তার দিকে। বুঝলে সে যে একটা প্রলয় আসন্ন। খেতে খেতে সে মনকে সাহস দিতে লাগল—ভড়কালে চ'লবে না; ওকে জব্দ ক'রতে হবে।

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে গীতা অস্বাভাবিক প্রশান্ততার সহিত বললে, "তুমি বউদিকে দুশো টাকা পাঠিয়েছিলে?"

কথাটায় বিকাশের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঝাঁকিয়ে দিলে! সর্ব্বনাশ: কথাটা চাপা নেই আর তা'হলে।

বিকাশ ব'ললে, "হুম"—গম্ভীরভাবে, অন্য দিকে চেয়ে। আবার মনে মনে ব'ললে, "ভড়কান হবে না, এটাকা দেওয়া অন্যায় হ'য়েছে ব'ললে সে শক্ত জবাব দেবে।

, কিন্তু গীতা শান্তভাবে শুধু ব'ললে "তা আমার কাছে কথটা লুকিয়েছিলে কেন? আমি কি তোমার হাত বেঁধে রাখতাম?"

বিকাশের অন্তরাত্মা তার কম্পিত দেহ মনের পিঠ চাপড়ে তখন ব'লছে, "ভয়ো মৎ! নিজের শক্তির উপর আস্থা রাখো।"

সে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সুরে বললে, "লুকোবো কেন? লুকোবার কি আছে? কি এমন কথাটা? লুকোবার কি?"

"আবার বলে, লুকোও নি! মিথ্যে ভাঁড়াচ্ছ। যাক তোমার টাকা, তুমি দিয়েছ—আমি তাতে কিছু বলবার কে? তবে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি দুটো পরামর্শ দিতে পারতাম। যাক বড় দাতা হয়ে বউদির সঙ্গে প্রেম করতে যেমন গেছলে—এখন সামলাও!" বলে অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে একখানা চিঠি বিকাশের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল—যেন রাণী বিদ্রোহীকে ফাঁসীর হুকুম দিয়ে গেলেন। তার এতটা দর্প দেখে রাগে ফুলতে লাগলো বিকাশ।

কিন্তু চিঠিখানা নিয়ে পড়ে তার রক্ত জল হ'য়ে গেল।

চিঠি লিখেছেন বৌদি। বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা তিনি লিখেছেন, কিন্তু বিকাশের বুঝতে কষ্ট হল না যে, এটা তাঁর আগের চিঠির মত তাঁর নিজস্ব রচনা নয়; এতে অনন্তর মুন্সীয়ানা সুস্পষ্ট। বউদি তাঁদের অভাব-কষ্টের কথা বিস্তারিত করে জানিয়েছেন, কোথায় কার কাছে শুধু খাওয়া-পরার জন্য তাঁরা ধার করে ডুবতে বসেছেন, তার হিসেব দিয়েছেন। বিকাশ যে দুশো টাকা ছিল, তা' দিয়ে শুধু ডিক্রীজারী বন্ধ করা গেছে—এখনও বাঁচতে হলে তাদের প্রায় হাজার টাকার দরকার। এবং বিকাশের কাছে এই দেনা-শোধের পর মাসে দুশো টাকা মাসোহারা পাবার আশা বউদি রাখেন। এই মোটা কুৎসিত আটপৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে নানাবিধ আক্ষেপ, আকুতি, কাতর মিনতি ও বিপুল তপ্তবর্ণচ্ছটা দিয়ে লেখা হয়েছে।

যখন চিঠিখানার বক্তব্য হজম করে বিকাশের মনটা পূর্ণ সায়েস্তা হয়ে গেছে, তখন গীতা বিজয়িনীর মত এসে বললে:

"কী? ক'হাজার টাকা এবার পাঠাতে হবে? হাজার দশেকের একখানা চেক লিখে আনবো কি?"

বিকাশের মনে হল যে, গীতার কাছে তার বিচার বুদ্ধির পরাজয়ের বেদনাট এমনি করে রগড়ে দেওয়াটা ঠিক সাধ্বী স্ত্রীর যোগ্য হচ্ছে না। কিন্তু গীতার সে বিষয়ে কোনও গ্লানির পরিচয় পাওয়া গেল না। সে এই সুরে আরও অনেক ব্যঙ্গ পরিহাস করে শেষে বললে, "দাদা বৌদিদির দুঃখ তুমি টাকা দিয়ে মেটাবে এতবড় কুবের তুমি হওনি, হতে পারবে না কোনও দিন! দু'চার শো টাকা : দশ মিনিটে নস্যি করে দিতে পারেন দাদা। ওঁকে দেওয়া আর টাকা : ফেলা এক কথা।"

এ কথা কয়টা এত ছাঁকা সত্য যে এর প্রতিবাদে কিছু বলবার নেই বিকাশের। সে নিজেও চিঠি পড়তে পড়তে ঠিক এই কথাই ভাবছিল। কিন্তু তবু গীতার এই মাষ্টারী সুর যেন তার অন্তরাত্মার মর্ম্মস্থলে কষাঘাত ক'রে ক্রমশঃই তাকে ক্রুদ্ধ ক'রে তুললে। গীতাকে সে বললে, অমি যা' ক'রেছি, বেশ করেছি। তারা আরও চেয়েছে বলেই আমি আরও দিতে যাব, আমাকে এত বড় বেকুব না ভাবলেও পার।"

বেশ তপ্ত সুরে এই জবাবটা দিতে পেরে, একটু স্বস্তি বোধ করলে, কিন্তু এর উত্তর শোনবার সাহস তার হল না। সে ভারী ব্যস্ততার ভাণ করে একটা বাজে কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে সে ভাবতে লাগলো বউদির এ চিঠির কথা। টাকা তাঁকে সে দিবে না ঠিক, কিন্তু কি অছিলা করে? এ কথা তো সে বলতে পারবে না যে তার টাকা নেই। তবে? ঠেকাবে কি করে? কোনও অছিলা না খুঁজে সোজাসুজী তাঁকে যে জবাব দেবে—দেবো না আমি—আর দেবার ইচ্ছা নেই এ কথা ভবতেও সে মনে মনে সঙ্কুচিত হল।

অনেক রকম মুসাবিধা করে সব কটাই বরখাস্ত করে সে শেষ পর্য্যন্ত স্থির করলে যে, কোনও উত্তর দেবার চেষ্টা না করে একদম চুপমেরে থাকাই

যুক্তি। তার মন বললে, এটা কাপুরুষতার শেষ আশ্রয়, এতে সমস্যার শেষ সমাধান হবে না। কেন না অনন্ত যখন একবার পেছনে লেগেছে, তখন শুধু এই চিঠিতেই তার পর্য্যবসান হবে না। আরও চিঠি আসবে—হয় তো সশরীরে ই এসে উপস্থিত হবে। তখন?

তারচেয়ে সে ভাবলে, অনন্তকে থোক কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখবে, এই শেষ, আর কখনও কিছু দিতে পারবে না। তখনই বুঝতে পারলে যে, গীতা বুঝেছে ঠিক, এতে কিছুই হবে না।

অতএব এই সিদ্ধান্তই স্থির—টু শব্দটিও না করে চুপ চাপ বসে থাকা। পরে যদি নূতন কিছু অবস্থা গজায়, তখন তার উপায় করা যাবে।

## একুশ

বিকাশ এবার একাই ব্যবসা করা স্থির ক'রে মফঃস্বলে গুদাম ভাড়া ক'রেছে। আর ক্রমাগত পাট কিনে কিনে সেগুলো বোঝাই ক'রেছে।

কিন্তু এবার পাটের বাজারের গতিক দেখে তার ভারী অস্বস্তি বোধ হ। যখন প্রায় সাত লাখ টাকার পাট তার গুদামজাত হ'য়েছে, তখন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে পাটের দর কমতে আরম্ভ ক'রলে। দেখা গেল বড় বড় পাটের কর্ত্তা কয়েকজন জোট ক'রে হুড় হুড় ক'রে লণ্ডনের বাজারে সমস্ত রকমের পাট বিক্রী দিলেন। অমনি বাজার গেল ধপ্ ক'রে প'ড়ে। বিকাশ দেখলে যে, যা দর হ'য়েছে, তাতে সে তার কেনা দরেও পাট বেচতে পারে না। তবু সমস্ত অবস্থা আলোচনা ক'রে সে ভাবলে যে এ দর থাকবে না, উঠতে পারে—তাই সে পাট গুদামেই রেখে দিলে।

দারুণ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে তার দিন কাটতে লাগলো।

এমন সময় সে একখানি চিঠি পেলো সুবোধ চ্যাটার্জীর। সে তখন একটা নূতন পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব্ববঙ্গে একটা পল্লীপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রেছে। তার পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সে লিখেছে, "আমার কাজ যদি সফল হয়, তবে পল্লীর উন্নতি সমস্যার একটা চরম সমাধান বের হ'য়ে যাবে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞতা দূর হবে গ্রাম থেকে। একবার এদের নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে এরা নিজেদের অর্থে ও নিজেদের চেষ্টায়ই পারবে তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করতে। কিন্তু এদের দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য চাই দশ হাজার টাকা! পাঁচ হাজার এখনই, আর এর পর দশ মাসে পাঁচশো ক'রে। তোমাকে আমরা এ স্কীমের ভাণ্ডারী নিযুক্ত ক'রলাম। তুমি যেমন ক'রে পার টাকাটা দেবে আমাকে—beg, borrow or steal."

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চিঠি খানা কোলে ক'রে সে চেয়ে রইলো আকাশের পানে।

তবে ব্যবসার অবস্থা সঙ্গীন, এমনও হতে পারে তার জন্য বৎসরের শেষে তার দেউলে হ'তে হবে। তাই বলে এখন সে পাঁচ হাজার টাকা না দিতে পারে এমন নয়। কিন্তু কেমন ক'রে দেবে? অফিস থেকে একটি পয়সা দেবার উপায় নাই, বরং আফিসের হিসাবেই বাড়ী থেকে টাকা টানতে হচ্ছে।

বাড়ী থেকে টাকা!—তার জন্য গীতাকে ব'লতে হবে।

ভাবতেই তার বুক ব'সে গেল সাত হাত। সুবোধ ও মালতীর কাজের গৌরব বোধ করবার শক্তি গীতার নেই। কি অশ্রদ্ধার চোখে গীতা এদের দেখে, তার বহু পরিচয় সে পেয়েছে। গীতার মতে এরা দুটি বদ্ধ পাগল এবং এক নম্বরের বেকুব। তাদের কাজ সম্বন্ধে কোনও কথাই সে শোনা আবশ্যকও মনে করে না। যে মূর্খ শুধু খেয়ালের বশে অত বড় একটা চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে, আর অমন স্ত্রীকে বানিয়েছে একটা ভিখারী—সে ক'রবে কোনও কাজের মত কাজ!

গীতার এসব অভিমত বিকাশ শুনে গেছে শুধু, তীব্র বেদনার সহিত শুনেছে সে, কিন্তু প্রতিবাদ করেনি। কেন না সে জানে প্রতিবাদ মিথ্যা। আরও হাজার হাজার লোকের মত গীতা মনে করে আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতী, আর অন্য লোকের এ মতটা যত চাপা থাকে, গীতার তা নয়। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস তার প্রতি কর্ম্মে প্রতি বাক্যে এত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ হয় যে তার কোনও কথার প্রতিবাদ মাথাই তুলতে পারে না।

সুবোধের এ চিঠি যদি গীতা দেখে, তবে সে কি ব'লবে তা বিকাশ মনে মনে কল্পনা ক'রতে পারে। প্রথমে সে হেসে উড়িয়ে দেবে, তার পর দেবে গাল। ব'লবে—মূর্খ হতভাগা তো নিজের মাথা খেয়েছে, এখন বিকাশের মাথা খাবার ব্যবস্থা ক'রছে। সে যে বিকাশকে তার ভাণ্ডারী নিযুক্ত ক'রেছে, এ নিয়োগের স্পর্দ্ধায় হয় তো সে হতবাক্ হয়ে যাবে।

নাঃ—গীতার কাছে বলা যাবে না।

কিন্তু সুবোধকেই বা কোন মুখে সে ব'লবে—মাত্র পাঁচ হাজার টাকা সে দিতে পারে না।

ভারী রাগ হ'ল তার গীতার উপর। টাকার প্রত্যেকটি কাণাকড়ি রোজগার করে বিকাশ—অথচ সে তা' ইচ্ছামত খরচ ক'রতে পারবে না! বদ খেয়ালে সে এক পয়সা খরচ করে না এবং ক'রতে পারে না। এমনও নয় যে, সে সুবোধের মত সেচ্ছায় ফকির হ'য়ে তার সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেবে। সামান্য দু' পাঁচ হাজার টাকা লোকের হিতে খরচ, তাও সে ক'রতে পারে না!

এর জবাব তার তখনই মনে হ'ল, পাবে না কেন? কর না খরচ, গীতা তোমার হাত তো বেঁধে রাখতে পারবে না। সে বড় জোর রাগ ক'রবে।

কিন্তু সেই তো বিপদ। কি সাংঘাতিক সে রাগ? একদিন সামান্য একটা কথায় গীতা সিন্দুক উজাড় ক'রে তার গয়নাগাটি শাড়ী জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো—সে চিত্র তার মনে সদা জাগরুক ছিল।

কাজেই সে ভাবতেই লাগলো অন্য উপায়! গীতাকে লুকিয়ে কেমন ক'রে টাকাটা বের ক'রে দেওয়া যায়—ভেবে ভেবে উপস্থিত কোনও উপায় বের হ'ল না। পাট যখন তার এখন ধ'রেই রাখতে হবে, তখন আফিসে শীগ্‌গির টাকা আমদানী হবার সম্ভাবনা নেই। ধার ক'রতে সাহস হয় না। কী ক'রবে?

তারপর সে ভাবলে, এইবা কেমন কথা?

গীতার সঙ্গে এমন লুকোচুরী ক'রে ক'দিন চ'লবে। তার সঙ্গে স্পষ্টা-স্পষ্টি কথাবার্ত্তা কওয়া যেন তার উঠেই গেছে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্ভাষণ এখন যা' হয়, সে যেন দু'জন ওস্তাদের তলোয়ার খেলা। সর্ব্বদা সাবধানে থাকতে হয়, কখন কোন দিক থেকে লাগায় ঘা—ঢাল খানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাগিয়েই রাখতে হয় সর্ব্বদা। যার সঙ্গে একটা দু'টো দিন বা একটা দু'টো বৎসর নয়—সারা জীবন কাটাতে হবে, তার সঙ্গে এ খেলা খেলতে গেলে জীবন অসহনীয় হ'য়ে উঠবে যে। এখনই এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে বিকাশ অনেকক্ষণ পালিয়ে বেড়ায়; গীতার সঙ্গে নিভৃতে বৈষয়িক আলাপের সুযোগটা সে যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়েছে। বাড়ী আসে ঘুরে ফিরে অনেক দেরীতে। এসে বেরোয়ে যায়—বাইরে থাকে যতক্ষণ পারে।—কিন্তু রাতটা তো গোটা থাকেই!

কেন এ রকম হয়? সে মেনেই নিলে যে, এটার ভিতর অনেকটা কাপুরুষতা আছে তার; স্ত্রীকে সে স্পষ্টাস্পষ্টি শক্ত কথা বা 'না'—বুঝি ব'লতে পারে না। কিন্তু কেন এ কপুরুষতা আসে? বীরত্ব বা কপুরুষতার কথা আসে শুধু তখনই, যখন সংঘর্ষের অবসর থাকে। কিন্তু কবে, কখন, কেন এলো এ সংঘর্ষের অবসর? বিয়ের আগে তাদের ভিতর সখের

ঝগড়া ছাড়া কিছুই ছিল না। বিয়ের পর কিছুদিন ছিল শুধু অনাবিল প্রেম, পরস্পরের সম্পূর্ণ একীভাব। তখন বিকাশ চাইতো তার মন প্রাণ ধন সব নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে গীতার কাছে, গীতার মুখের ছোট্ট কথাটিও সে মানতে চাইত বেদবাক্যের মত, গীতার সেবা, গীতার আনন্দ বিধানেই ছিল তার আনন্দ। তখন যে গীতা তাকে বাজে খরচ কম ক'রতে ব'লতো হিসাব ক'রে খরচ ক'রতে ব'লতো'—কী মিষ্টি লাগতো সে কথা, অধরে অধরে তার মধু ঝ'রতো—বিকাশ দেখতে পেতো তার ভিতর তার প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রেম ও হিতাকঙ্ক্ষা—খুসী হ'য়ে সে সে-কথা মানতো, আর যখন মানতো না, তখন গীতার মিষ্টি তিরস্কারেও পেতো অনন্দ। সে ভাব গেল কেন?

বিকাশ তার কারণ খুঁজে পায় না—শুধু ভাবে, গীতা বদলে গেছে তাই। গীতাও তেমনি এ অবস্থার কারণ খুঁজে পায় না; ভাবে, বিকাশ ভারী ব'দলে গেছে? নইলে আগে সে সব কথা গীতাকে ব'লতো—এখন বলে না, আগে যে কথা বল্লে হাসি মুখে হয় তো অপরাধ স্বীকার ক'রে খুসী হত, এখন তাতে যায় চটে। দুজনেই ভাবে—কেন এমন হ'ল।

প্রেমের স্বভাব এই যে, প্রেমাস্পদকে সব দিতেই চায়। সখ্য দাস্য মধুর নানাভাবে সে সমস্ত অন্তর দিয়ে চায় সেবা ক'রতে। প্রেমাস্পদ যদি সে সেবা হাত পেতে নেয়, শুধু কৃতার্থ হ'য়ে যায় প্রেমিক। কিন্তু—সে যদি পাওয়াটাকে পাওয়া স্থির ক'রে সেই সেবাই দাবী ক'রতে সুরু করে, তখন সে ইন্দ্রজাল যায় ভেঙ্গে, মোহ ছুটে যায়। পাওনা শোধ করা তখন দাঁড়ায়, হয় শুধু কর্ত্তব্যের দায়, না হয় পাওনাদারের অত্যাচার। বিকাশের হ'য়েছিল ঠিক তাই। সে তার প্রাণ মন ধন সব দিয়ে চেয়েছিল গীতার সেবা ক'রতে। গীতার কিন্তু ভাবটা যা' দাঁড়াল, তা অনেকটা এই যে, এ তো আমার পাওনা। বিকাশ কেবলি ভাবে সেই দেওয়া অধিকারের ক্ষেত্র দখল ক'রে গীতা যেন তার সীমাটা চার দিক দিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে বজ্রবেষ্টনী দিয়ে তার ভিতর বিকাশের সত্তাটাকে বেঁধে ফেলেছে। বন্ধনের চাপটা সে যেন আর সইতে পারছে না।

বিকাশ ভাবে, এ নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায় কি? আছে কি উপায়?

না, এমনি ক'রে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে গীতার আজ্ঞাদাস হ'য়ে চালাবে সারা জীবন, শুধু তার ভ্রূকুটির ভয়ে গম্ভুচিত্ত হ'য়ে!

অনেক ভেবে চিন্তে দেখলে সে। পথে হাঁটতে হাঁটতে ভেবে চিন্তে সে ঠিক করলে, এ আর শক্তটা কী? গীতা যখন তাকে হুকুম করবে এর পর—সে কথা সোজা অগ্রাহ্য করা তো সম্পূর্ণ তার হাত। চাই কি মুখের উপর সে যদি একদিন ব'লেই দেয় তাকে, "ও সব মাষ্টারী চলবে না। আমার টাকা আমি যা খুসী ক'রবো, আমার যখন খুসী ক'রবো—তুমি তাতে হাত দিতে পারবে না,"—তবে কী আর হাতি ঘোড়া হবে।

স্থির ক'রলে সে, এবার প্রথম সুযোগেই সে এই কথাটা ব'লবে। স্থির ক'রে বীরদর্পেসে বড়ীতে প্রবেশ ক'রলে।

সে সুবোধের চিঠিখানা গীতাকে প'ড়তে দিলে।

যা' ভেবেছিল তাই। চিঠি প'ড়ে গীতা ব'ল্লে, ও বাবা! আবদার দেখে বাঁচি না। তাঁরা ক'রবে সব পাগলামী আর তুমি জোগাবে তার খরচ!"

খুব রূঢ় জবাব দিবে স্থির ক'রেও বিকাশ শুধু গম্ভীরভাবে ব'ল্লে "পাগলামী নয় গীতা, তারা যা ক'রেছে—তাই কাজের মত কাজ। তুমি জান না গীতা, কত কষ্ট ঐ গ্রামবাসীদের। এই যে তোমার ধন দৌলত, এত বিলাস এ সব কোথা থেকে আসে জান? পাটের কারবার সম্ভব করে কারা? ঐ সব পূর্ব্ব-বাঙলার চাষী। কি কষ্ট ক'রে যে তারা পাট তৈরী করে, তা দেখে এসেছি আমি। এক বুক জলে, কোথাও বা জলে গিয়ে তারা ডুব মেরে মেরে পাট কাটে। তারপর জাগ দেওয়া হ'লে সারাদিন জলে দাঁড়িয়ে পাট ছাড়ায়, শুকোয়। তাদের এত কষ্টের ধন আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসে লাভ করি, বড়লোক হই। আর তাদের এই এবারকার বাজারে পাটের টাকায় তাদের আধপেটা খাওয়াও জুটবে না। যাদের পরিশ্রমে আমাদের ঐশ্বর্য্য, তাদের উপকার যাতে হয় তার জন্ম আমাদের যা কিছু সম্ভব করা উচিত নয় কি?"

গীতা একটু সুর নামিয়ে ব'ল্লে, "তাই ব'লে যা' নয় তাই ? সম্ভবের মধ্যে যা হয় দিতে পার। দশ পনেরো কুড়ি টাকা চাঁদা চায় দিতে পার—তা না তো পাঁচ হাজার, দশ হাজার,—এ কি মগের মুল্লুক।"

একটু চুপ ক'রে থেকে বিকাশ ব'ল্লে, "মগের মুল্লুকই বটে। তারা করে খেটে খুটে পাট, আমরা লুটে নিয়ে আসি।"

"লুটে নিয়ে এসো কি রকম ? ন্যায্য বাজার দরে জিনিষ কিনলে বুঝি লুট হয় ?"

গও হ'তে পারে। কিন্তু ন্যায্য বাজার দরই কি আমরা দি ? তুমি তো জান না, আমরা ব্যবসায়ীরা স্তরে স্তরে কত রকম প্যাঁচ কষি চাষীদের পাওনাটা যথাসম্ভব কমিয়ে আমাদের লাভটা বাড়াবার। প্রথম যেবার আমি পাট কেনা বেচা ক'রলাম,ম্যাকরে সাহেবের কথায়, সেবার হঠাৎ আমেরিকায় পাটের একটা বড় অর্ডারের খবর এসেছিল সাহেবদের কাছে। সেটা জানাজানি যাতে না হ'য়ে যায়, আর এর মধ্যে তারা খুব বেশী পাট কিনে ফেলতে পারে, সেই জন্যে জোট বেঁধেছিল ঐ বেলার আর কলের মালিকেরা। ম্যাকরে সাহেবের দয়ায় আমি ত সেই সুযোগে দু' পয়সা ক'রে নিলাম। চাষীদের ন্যায্য দাম যদি দিতাম আমি, তবে বড় জোর পাঁচ সাত হাজার টাকা আমার হ'ত।—এটা লুট নয় ?"

—"এ আবার লুট কিসের ? এই তো ব্যবসা, যে মাল বেচবে সে চাইবে যাতে বেশী দাম পায়, আর যে কিনবে সে চাইবে যাতে কমে পাওয়া যায়।"

"ব্যাপার অত সোজা নয়। যেখানে বিক্রেতা গরীব ও বিচ্ছিন্ন আর ক্রেতা ধনী আর ঐক্যজোট, সেখানে এমন হয় না। যাকগে সে তর্ক মিথ্যে, তুমি ওসব বুঝবে না।"

কথাটায় গীতা একটু খোঁচা খেল। সে মুখ ভার ক'রে ব'ল্লে, "তা হ'লে তুমি দশ হাজার টাকাই দেবে না কি ?"

বেশ একটু রুক্ষস্বরে ব'ল্লে, "না দেব না। দিতে পারবো না। কিন্তু দেওয়া আমাদের উচিৎ ছিল।"

ব'লে মুখ ভার ক'রে সে ব'সে রইলো।

গীতাও মুখ ভার ক'রে চ'লে গেল।

বিকাশের মনে হ'ল কিছুই তার করা হ'ল না। সে স্থির ক'রেছিল, সে জেদ ক'রে শক্ত হ'য়ে ব'লবে, "টাকা দেব আমি।" সে সাহস তার হ'ল না। সে যা ব'ল্লে, তাতে না দেওয়াটাই মেনে নেওয়া হ'ল, গীতার কথাই বহাল রইলো। সে শুধু ক'রলে একটু মুখ ভার!

একটু ক্ষীণ আশা ছিল তার মনে যে, তার মুখ ভার দেখলে গীতাই হয়তো যেচে তাকে ব'লবে, টাকাটা দিয়ে দেও। কিন্তু তার বুঝতে দেরী হ'ল না যে, সে আশা দুরাশা। সে মুখ ভার ক'রলে বা রাগ ক'রলে গীতা তাকে সাধবে কি, সেই উল্‌টে রাগ করে—তারপর বিকাশের হয় সাধতে।

কিন্তু আজ সে স্থির ক'রলে, আর যাই করুক সে, গীতার সঙ্গে যেচে আপোষ ক'রতে যাবে না—যা থাকে কপালে।

সুবোধের কথা নিয়ে সে মনের ভিতর তোলপাড় ক'রতে লাগলো। তাকে টাকাটা না দিতে পেরে তার বুকের ভিতর দাবানলের মত আগুন জ্বলতে লাগলো।

সুবোধের অনেক দিনের পুরাণো কথাটা তার আজ আবার মনে প'ড়লো 'সখের দরদী, হাম্বাগ'!

আজ তার এ কথার কোনও জবাব নেই।

ভগবান জানেন, অন্তরে তার এ বিষয়ে কত দারুণ বেদনা!

ফটকা বাজারে পাটের কাগজী বেচা কেনা ছেড়ে যখন সে সত্যি পাটের কারবার সুরু ক'রে গেল পাটের দেশে, পূর্ব্ব বাঙলায়, তখন পাটচাষীদের ক্লেশকর শ্রম ও দারিদ্র্য দেখে তার মনে হ'য়েছিল দারুণ দুঃখ। সেইবার, পাটের দাম ভীষণ কমে যাওয়ায় পাটচাষীদের হ'য়েছিল দুর্গতির একশেষ। বিকাশ গিয়ে দেখেছিল তারা মাথায় দিয়ে হাহাকার ক'রছে। বিকাশ জানে, তখন যে শীগ্‌গির পাটের দর বেড়ে যাবে এবং চাষীদের কাছে আড়াই টাকা

তিন টাকা দরে সে যে পাট কিনছে, সেই পাট সে হয়তো দশ টাকায় বেচবে। এই সব জেনে-শুনে পাট কিনতে তার মনে হ'চ্ছিল, সে গরীবদের ঠকাচ্ছে—জুচ্চুরী ক'রছে। তার ছাত্র-জীবনের সেই প্রতিজ্ঞা তার মনে ভেসে উঠে তাকে টিট্‌কারী দিতে লাগলো। সুবোধের ছবি চিত্তে ভেসে উঠে তাকে লজ্জা দিল। তবু শুধু নাক মুখ বুজে সে পাট কিনেই গেল—বড়লোক হ'ল সেই এক বছরেই।

সেই থেকে এ খুঁৎখুঁতি তার মনে জেগেই ছিল।—এদের জন্য কোনও একটা কিছু করবার জন্য ভারি ব্যাকুল ছিল চিত্ত।—সুবোধের প্রস্তাব মত তাকে অন্ততঃ এখন পাঁচহাজার টাকা দিতে পারলে সে মনে অনেকটা স্বস্তি পেত।

কিন্তু তা' হবার নয়! গীতা অন্তরায়!

## বাইশ

কয়েকদিন হ'ল তার মনটা দুশ্চিন্তায় অন্ধকার হ'য়ে ছিল। এবারকার সীজনের গড়ায় সে প্রায় সাত লাক টাকার পাট কিনে রেখেছিল, তার জন্য সে তার যথাসর্ব্বস্ব পণ ক'রে প্রায় সব টাকাই ধার ক'রেছিল। তখন দর যা ছিল ভেবে ছিল তা আশাতীত সস্তা, আর ফসলের খাঁক্তি প্রভৃতি বিবেচনা ক'রে ভেবেছিল এ দর থাকবে না, বাড়বেই নিশ্চয় এবং তাতে বেশ মোটা লাভ হবে তার। কিন্তু যখন দর বাড়া একরকম সুনিশ্চিত এবং লণ্ডনের বাজারে দর বেশ বেড়ে যাচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ দাম প'ড়তে আরম্ভ ক'রলে। জানা গেল, পাটের বড় বড় মহাজনেরা দাম কমার জন্য জোট ক'রে লণ্ডনের বাজারে প্রভূত পরিমাণ পাট বিক্রী দিয়েছেন পড়তার চেয়ে অনেক কম দরে। তাঁদের মতলব এই যে, এতে ক'রে দাম খুব কমে যাবে এবং এবারকার সব ফসল তারা কিনে ফেলতে পারবেন—যা' তা' দরে, আর তা' বেচে প্রভূত লাভ ক'রে এ লোকসান পুষিয়ে নেবেন। কাজেই এদেশে পাটের দর হু হু ক'রে নেমে গেল।

বিকাশ চক্ষে অন্ধকার দেখতে লাগলো। সে দেখলে যে, এখন পাটের যে দর তাতে বেচলে তার প্রায় চার লাক টাকা লোকসান। তার মানে প্রায় চার লাক টাকার দেনা তার শোধ ক'রতে হবে, ফলে তার সর্ব্বস্ব যাবে।

অস্থির হ'য়ে সে ছুটো-ছুটি ক'রতে লাগলো। লোকসান পুষিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রলে ফাটকার বাজারে কেনাবেচা ক'রে। সেখানেও দরের এত গোলমোগ সে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হ'য়ে রইল, কখন কোনদিকে কি সর্ব্বনাশ হয়। এই নিয়ে গত ক'দিন ধ'রে সে আফিস থেকে কেবল বাইরে ফাটকা বাজারে, ব্যাঙ্ক ও মহাজনের ঘরে দৌড়াদোড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে, আফিসে ব'সে সুস্থির হ'য়ে দু'দণ্ড কাজ ক'রতে পারে নি।

ঠিক এই সময়ে তার মন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারী মুখুজ্জের বাড়ীতে ভীষণ বিপদ উপস্থিত হওয়ায় সে ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে। অফিসের বাকী লোক সবাই মফঃস্বলে। থাকবার মধ্যে আছে সুধু একটী আনকোরা নতুন টাইপিষ্ট আর দুটি দ্বারোয়ান। এই দারুণ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের মধ্যে তাকে অফিসের সব কাজ সমলাতে হয়, অথচ সময় হয় না তার দেখেশুনে সব করবার।

তাই, যখন সে সুবোধের ভিক্ষা ও গীতার ব্যবহার নিয়ে খুব বিরক্ত হ'য়ে নানারকম ভাবছে, তখত তার এ সব চিন্তা আচ্ছন্ন ক'রে আবার উঠলো পাটের বাজারের চিন্তা। সে মনে মনে হিসাব ক'রতে লাগলো।

দুদিন থেকে পাটের দর একটু বেড়েছে। আজকের বাজারের শেষ খবর সে এখনো পায় নি, তাতে দেখা গেল যে এখন যদি সে সব পাট বেচে ফেলে, তবে তার এক লাখ টাকার বেশী লোক সান হয় না। ফাটকার বাজারে তার হয় প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লাভ।

সে ভাবলে, এই দর বাড়বে না কমবে না ঠিক থাকবে? যদি কমে তবে আরও লোকসান। যদি বাড়ে তবে লোকসান কমে' যাবে। কি ক'রবে?

ভাবতে ভাবতে সে বাড়ী ফিরল মুখখানা অন্ধকার ক'রে।

সামনে দেখলে গীতা। মুখের ভাব দেখেই বিকাশের মনে হ'ল তার মনে একটা কোনও নূতন মতলব গজিয়েছে। কিছু একটা বলবার জন্ম সে মুকিয়ে র'য়েছে যেন। ভারী বিরক্ত হ'ল সে। ভাবলে যাই মতলব হোক এবার সে শক্ত হয়ে গীতাকে বল'বে, "ও সব হবে না।"

যখন গীতা কথাটা ব'ল্লে, তখন কিন্তু সে কথা বলবার অবসর তার হ'ল না।

গীতা ব'ল্লে, "তোমার চাদর কি হ'ল?"

তাই তো! নতুন সিল্কের চাদর ছিল তার গায়। লেকের ধারে যখন সে বেঞ্চে ব'সে ভাবছিল তখন কোন ফাঁকে যে চাদর প'ড়ে গেছে তা' সে খেয়াল করেনি। চমকে' উঠে বিকাশ ব'ল্লে "তাই তো! চাদার?"—তারপর একটু ভেবে ব'ল্লে, "যাই দেখে আসি।"

গীতা হেসে ব'ল্লে, "আর দেখবে কি? এমন সুন্দর নতুন চাদর, সে কি এখনও ব'সে আছে তোমার জন্যে? কে তুলে নিয়ে গেছে। এমন ভোলা মানুষ তুমি!" ব'লে সে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো।

বিকাশ তখন বেরিয়ে যাচ্ছে। এই হাসি যেন ধারাল ছুরির মত তার বুকের ভিতর ব'সে গেল। আজ সে স্থির ক'রে এসেছিল যে, গীতার কাছে সে জয়ী হবই। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট তার যে, এই তুচ্ছ চাদরটা তাকে গীতার কাছে এমনি বেকুব বানিয়ে দিলে আর সে বিজয়িনীর মত তাকে টিট্‌কারী দিয়ে হেসে গেল।

চটে ম'টে হন্ হন্ ক'রে সে ছুটে গেল লেকে—যেখানে সে ব'সেছিল।

চাদর পাওয়া গেল।

কেউ নেয় না সেটা।—কিন্তু একটা গরু সেটাকে চিবিয়ে অর্দ্ধেক মেরে দিয়েছে, আর বাকীটা কাদার ভিতর চার পায় মাড়িয়ে সেরে ফেলেছে।

সেই জীর্ণ কর্দ্দমাক্ত ধ্বংসাবশেষ হাতে ক'রে তুলে হতাশ হ'য়ে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল বিকাশ। এ যেন তার পরম পরাভবে গীতার বিজয় পতাকা। চাদর হারিয়ে গেছে ব'লে বিজয়িনী হেসেছিল; তার সেই পরিণতি সে দেখলে বিকাশের নাকালের আর সীমা থাকবে না।

বিকাশ ভেবে দেখলে, যা হ'য়েছে তাই ঢের। এই পরিনিষ্ঠার বার্ত্তা ব'য়ে নিয়ে গীতার কাছে আরও বেশী জব্দ হাবার দরকার নেই।

বাড়ী ফিরে এলো সে। গরুর কীর্ত্তি সে চেপে গেল, চাদর চুরী হ'য়ে গেছে এই অনুমানই বহাল রইলো। কিন্তু বিকাশের অন্তর গর্জ্জন ক'রতে লাগলো তার অদৃষ্টের এই কদর্য্য পরিহাসে।

মেয়েদের টুলটুলে মুখ-চোখ দেখে তাদের পক্ষপাতী হ'য়ে সুবিচার ক'রতে ভুলে যাওয়া মানুষের সুপরিচিত দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভগবানও কি তেমনি এক-চোখো। গীতার সঙ্গে তার যে জীবন-সংগ্রাম তার খুঁটিনাটি বিবরণ আলোচনা ক'রে বিকাশ দেখতে পেলে আগাগোড়া ভগবানের গীতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব। তাই সে আগাগোড়া হেরেই এসেছে শুধু। যখন তার জয় একেবারে সুনিশ্চিত তখনও এমন একটা কিছু ঘটে' যায় যাতে তার পরাজয় অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। এই আজই সে যখন তার দুর্ব্বলতা পরিহার ক'রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়েছে গীতাকে একটা মনের মত ঘা' লাগাতে তখনই তার অদৃষ্ট এসে এই সামান্য চাদর উপলক্ষ ক'রে তাকে এমন বেকায়দায় ফেলে দিলে!

দুর্দ্ধর্ষ বীর যখন বর্ম্মচর্ম্ম প'রে অস্ত্রশস্ত্র শাণিত ক'রে দিতে যাবে শত্রুকে মর্ম্মান্তিক আঘাত তখনই কিনা সে পিছলে প'ড়ে হ'য়ে গেল কুপোকাৎ! কর্ণের বীরত্ব একেবারে তুচ্ছ ক'রে দিলে রথচক্র গ্রাস ক'রে খানিকটা পাঁক! নিভাঁজ পক্ষপাত বিধাতার।

যাক, এখন আর কিছু করবার নেই, ভাবলে বিকাশ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়তর ক'রলে যে, দেখে নেবে সে! এই শেষ নয়।

মাথা নত ক'রে বাড়ী ফিরে সে ব'ল্লে, "হাঁ, বোধ হয় নিয়েই গেছে কে' চাদরখানা।"

হেসে গীতা ব'ল্লে, "নেবে না? বলিনি আমি? গায়ের চাদর, তাই ঠিক রাখতে পার না তুমি, এত বড় ব্যবসা চালাও কি ক'রে? সবাই বোধ হয় তোমাকে দিন রাত ঠকিয়ে যায়!" ব'লে সে খুব হাসলে।

গীতার এই বিজয়োল্লাসে বিকাশের আরও রাগ হ'ল। সে যেকথা আগেই বুঝেছিল ব'লে বাহাদুরী নিলে সেটা যে মিথ্যে সে কথা ব'লবারও তো মুখ নেই বিকাশের। কেন না, গীতা যা' আগে বলেনি সেই সত্য কথাটা এ মিথ্যার চেয়ে এত বেশী গ্লানিকর যে তা' চেপে যাওয়া ছাড়া বিকাশের উপায় নেই।

ব্যবসা চালান'র কথা তুলে গীতা আর এক দিক দিয়ে বিকাশের আঁতে ঘা দিলে। ব্যবসা সে খুব ভালই চালায় এবং চালাতে পারে এ-বিষয়ে তার আত্মবিশ্বাস চিরদিনই খুব দৃঢ়; এবং গীতার এ-কথার চরম উত্তর সে এতদিন দিতে পারতো—সামান্য আরম্ভ থেকে তার বিপুল সমৃদ্ধি দেখিয়ে। এ-সবই যে ষোল আনা তার বুদ্ধি ও কৃতিত্বের ফল এ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ তার কোনও দিন ছিল না। কিন্তু অদৃষ্টের বিপাকে সে-কথাও ব'লতে তার সাহস নেই আজ। পাটের বাজারের বিপর্য্যয়ের ফলে আজ সে যে কুম্ভীপাকে জড়িয়ে প'ড়েছে তা' থেকে যদি কপাল-জোরে সে বেরিয়ে আসতে না পারে তবে এবারের যে প্রকাণ্ড লোকসান তার হবে সে খবর চাপা থাকবে না। যখন গীতা শুনবে, তখন সে যা' ব'লবে, সে আর দাঁড়িয়ে শোনা যাবে না। ব'লবে সে অনেক কিছু, কিন্তু সব চেয়ে নিষ্ঠুর এবং সব চেয়ে অসত্য যে-কথাটা ব'লবে সেটা হ'চ্ছে ঠিক এখনকার মত "বলি নি আমি! এই বুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা কর?"

এই কল্পনায় যেমন একদিকে হ'ল তার রাগ তেমনি কথাটা ভাবতে তার গা হিম হ'য়ে গেল। পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকা লোকসান হ'লেও সে মারা যাবে না, তবু তার অনেক থাকবে। আর পাটের কারবারে এমন লোক-সান হ'য়েই থাকে। কিন্তু সেই লোকসান হ'লে গীতার টিটকারী সে সইবে কেমন ক'রে?

নাঃ! এ-লোকসান দেওয়া চ'লবে না। বেচবে না সে এখনও—যা' থাকে অদৃষ্টে! এই সিদ্ধান্ত সে ক'রলে এখন।

এ-সিদ্ধান্ত তার বদলে গেল আধঘণ্টা পর। যখন সে টেলিফোনে সেদিন-

কার বাজারের শেষ খবর পেল। পাটের দর শেষ বেলায় লাফিয়ে উঠেছে বিকাশ আফিস থেকে আসবার পর।

খবর শুনেই বিকাশ চট্‌পট কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসাব ক'রতে ব'সল। হিসাবের ফলে দেখা গেল যে কাল সে যদি তার সব পাট এই দরে বেচে ফেলতে পারে তা' হ'লে তার ফাটকার বাজারের লাভ ক্ষতি যোগ বিয়োগ ক'রে— শেষ ফল দাঁড়াবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ।

একটু লোভ হ'ল। একবার যখন চ'ড়তে আরম্ভ ক'রেছে বাজার, তখন আরও বাড়তে পারে। সুতরাং আর কিছু দিন ধ'রে রাখলে হয় তো লাভের অঙ্ক বেড়েই যাবে তার। কিন্তু যদি আবার প'ড়ে যায়?

অনেক ভেবে চিন্তে সে স্থির ক'রলে কাল সকালেই পাট সব বেচেই দেবে।

অনেক দিন পর সে বেশ সুস্থির চিত্তে খাওয়া দাওয়া ক'রে প্রশান্ত মনে শুতে গেল।

এ-কয়দিন নিদারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছে লোকসানের দুর্ভাবনায়। আজ সে দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলে সে। তার মনে হ'ল এ-কয়দিন আফিসের কাজ সে করেই নি ব'লতে গেলে। কাগজপত্র নিয়ে ব'সে কাজ ক'রতে ক'রতে টেলিফোনে বাজারের দুঃসংবাদ শুনে চঞ্চল হ'য়ে ছুটে গেছে দু'শো বার, হয় ফাটকার বাজারে, নয় ব্যাঙ্কে, নয় গানি মার্কেটে। দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হ'য়ে আফিস দেখতে পারে নি। অনেক চিঠিপত্র, হিসাব-কিতাব প'ড়ে আছে।

কাল সকাল সকাল আফিস গিয়ে সেখানকার কাজগুলো গুছিয়ে ফেলতে হবে স্থির ক'রে, সে ঘুমিয়ে প'ড়লো।

## তেইশ

সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া ক'রে আফিস যাবে ব'লে তাড়া দিয়ে বিকাশ বেড়াতে বে'র হ'ল।

ফিরলে সে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে। পথে চ'লতে চ'লতে তার মনে হ'লো যে আফিসে কয়েকটা খুব জরুরী কাজ ছিল কাল। তার টাইপিষ্ট সে সম্বন্ধে আবশ্যকীয় চিঠি পত্র টাইপ ক'রে তার সামনে দিয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে সেগুলো সই করতে করতে সে ফাটকা বাজার থেকে চাঞ্চল্যকর খবর পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর সাত জায়গায় ঘুরে ফিরে বাড়ী চ'লে এসেছিল। আফিসে গিয়ে সে চিঠিগুলো পাঠাবার কথা মনে পড়ে না। কিসের সে সব চিঠি তা' আর এখন সব মনে প'ড়লো না, কিন্তু অস্পষ্টভাবে মনে হ'ল যে তার মধ্যে এমন চিঠি ছিল যা অন্ততঃ আজ দশটার ভিতর না পাঠালে অনিষ্ট হ'তে পারে ব'লে টাইপিষ্ট ব'লেছিল।

তাই সে ব্যস্তসমস্তভাবে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া ক'রলে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে। তার ভাব দেখে গীতা ব'ললে, "কি ভাবছ? কি হ'য়েছে তোমার?"

"কিছু নয়," ব'লে বিকাশ তাড়াতাড়ি ব'সে প'ড়লো। কাল ভুলক্রমে দরকারী চিঠিগুলো পাঠিয়ে আসা হয়নি একথটা গীতার কাছে প্রকাশ ক'রে তার অন্যমনস্কতা নিয়ে গীতার আর একদফা মাষ্টারী করবার সুযোগ সে দিতে প্রস্তুত ছিল না?

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় পিয়ন নিয়ে এলো একটা টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম প'ড়ে এক মুহূর্ত্তে বিকাশের চক্ষে পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে গেল।

টেলিগ্রাম এসেছে যে কাল রাত্রে বিকাশের গুদামে আগুন লেগেছে, এখনো আগুন জ্বলছে, হয়োত কিছুই উদ্ধার হবে না।

টক্ ক'রে বিকাশের মনে পড়ে গেল যে,কাল যে কয়টা জরুরি চিঠি পাঠাবার দরকার ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে দরকারী ছিল ফায়ার ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীতে পাঠাবার একখানা চিঠি ও চেক।

বিকাশের গুদাম ইন্‌সিওর করা ছিল, কিন্তু ইন্‌সিওরেন্সের মেয়াদ ফুরিয়েছে। মুখুজ্জে বাড়ী যাবার আগে সে কথা বিকাশকে ব'লে টাইপিষ্টের কাছে চিঠির মুশাবিদা রেখে গিয়েছিল। ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট এসে দুদিন ব'লে গেছে কালই চেক না পাঠালে কভার থাকবে না। তার তাগাদায় বিকাশ কালই চেক বই বের ক'রে টাইপিষ্টকে লিখতে দিয়েছিল। টাইপিষ্ট চেক লিখে ও টাইপ ক'রে বিকাশের টেবিলে রেখে দিয়েছিল। বিকাশ হয় তো সেগুলো সই ক'রেছে,—হয় তো—তার পর?

কিছু মনে হ'ল না বিকাশের।

ঠিক সেই সময়ে ফাটকা বাজারের টেলিফোন পেয়ে সে উঠে গিয়েছিল সেই সময়ে স্মৃতির কোঠা থেকে শুধু তার সাত জায়গায় ছুটোছুটির কথা ছাড়া অন্য সব কথা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

বিকাশের প্রথমেই মনে হ'ল, চেক কাল নিশ্চয় পাঠান হয়নি।—তা' হ'লে—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।

সাত লাখ টাকার পাট—ছাই হ'য়ে গেছে। এক পয়সাও পাবে না সে তার বিনিময়ে। তার বাবদে তার দেনা আছে ছয় লাখ।—তার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী হ'য়েও সে দেনা শোধ হবে না। সে হবে দেউলে!

ভাবতেই সমস্ত পৃথিবী তার চোখে অন্ধকার হ'য়ে গেল।

ক্রমে একটা ক্ষীণ—হয়ে তো অসম্ভব আশা তার মনে হ'ল। হয় তো বা এই চিঠিটা সে পাঠিয়েই এসেছে কাল। কিন্তু না! চিঠি পাঠালে সে যশোবন্ত দারোয়ানকে পাঠাত—সে তো তখন আফিসে ছিল না বোধ হয়।

তার উৎক্ষিপ্ত চিত্তে ব'সে তার স্মৃতি এই কথা নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলতে

লাগলো ; নানারকম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে সে একবার বলে হয় তো পাঠান হ'য়েছে, আবার পরক্ষণেই সেই আশা একেবারে ভস্ম ক'রে দেয় !

উন্মাদের মত উঠে বিকাশ গাড়ীতে লাফিয়ে প'ড়ে ড্রাইভারকে খুব তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে আফিসে যেতে ব'ল্লে।

আফিস খুলতে তখনও দেরী ছিল। টাইপিষ্ট বাবু আসে নি, যশোবন্তও নেই। আর একটা দ্বারোয়ান দোর খুলে দিলে ।

হুড়মুড় ক'রে ছুটে গিয়ে বিকাশ তার টেবিলের উপর প'ড়লো।

মাথায় জলছে আগুন। ভাবনা চিন্তা তারবেগে ছুটছে শম্ভুগঞ্জের গুদাম থেকে ইনসিওরেন্স আফিস, ফাটকা বাজার প্রভৃতি দেশে। সমস্ত টেবিল ড্রয়ার সিন্দুক খুলে বিকাশ বার বার ওলোট-পালট, কী বের হ'চ্ছে তাও ভাল ক'রে দেখতে পায় না, কী খুঁজছে তাও মাঝে মাঝে ভুলে যায়। প্রাণ বলে শুধু হায় হায় !

টেবিলের উপর সব কাগজ পত্র স্তূপীকৃত হ'ল—কোনও রসিদ পাওয়া গেল না।

অনেকক্ষণ পর একটা কথার সুস্পষ্ট অনুভূতি হ'ল বিকাশের মনে—চেকবইখানা নেই !

সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! চেক বই চুরী ক'রে তার টাইপিষ্ট ব্যাঙ্কের টাকাও মেরে দিয়েছে নাকি ?

কোন কথা স্পষ্ট ক'রে ভাবতে পারলে না বিকাশ। কেবল চিত্তের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত রাশি রাশি আগুন ছুটে যেতে লাগলো। উন্মাদের মত লাফালাফি ক'রে সে কেবলি চুল ছিঁড়তে লাগলো।

তার একথা বুঝতে বাকী রইল না যে সর্ব্বনাশ—সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে সর্ব্বনাশ তার হ'য়ে গেছে।

শেষে পরিশ্রান্ত ও হতাশ হ'য়ে সে তার চেয়ারের উপর ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়লো।

সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল!

এখন উপায়? তার পর সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল গীতার কাছে এর পর মুখ দেখবে কি ক'রে?

পালাবে সে। পাওনাদারের হাত থেকে—গীতার সম্মুখ থেকে—পালাবে সে। পালিয়ে সুদূর জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। গীতার সামনে আর দাঁড়াতে পারবে না—

দোর ঠেলে তার ঘরে ঢুকলো গীতা।

বিকাশ যখন টেলিগ্রাম পায় তখন গীতা উপর থেকে দেখতে পেয়েছিল। টেলিগ্রাম প'ড়ে বিকাশের অবস্থা দেখে গীতা উপর থেকে বারকয়েক নিষ্ফল আহ্বান ক'রে শেষে মহাব্যস্ত হ'য়ে নীচে ছুটে এসে দেখতে পেলে ততক্ষণ বিকাশের মোটর বহুদূর চ'লে গেছে।

আর একখানা মোটর বের করিয়ে গীতা তখন ছুটলো বিকাশের আফিসে।

ঘরে ঢুকেই সে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা ক'রলে "কী হ'য়েছে?"

গীতাকে দেখে বিকাশ চমকে উঠলো। অপরিসীম লজ্জা ও গ্লানি তাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেললো। একবার অতি-করুণ শুষ্ক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে, মুখ নীচু ক'রে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে বললে শুধু— "হয়েছে?—সর্ব্বনাশ!"

সস্নেহে তার মাথা তুলে ধ'রে গীতা ব'ললে, "ছি, অমন ক'রো না—আমায় সব কথা খুলে বল।"

পরম স্নেহের সহিত বিকাশের মাথা বুকে চেপে ধরে গীতা তাকে নানা রকমে আশ্বস্ত ক'রে।

আশ্চর্য্য শান্তি পেল বিকাশ এতে।

সে এখন কতটা ধীর ভাবে মোটামুটি সমস্ত কথা খুলে ব'ললে, ইন্‌সিওরেন্সের

টাকা দেওয়া হয় নি, সাত লাখ টাকায় পাট পুড়ে গেছে, এখন দেনায় তার সর্ব্বস্ব যাবে।

শুনে গীতারও রক্ত হিম হয়ে গেল! কাগজের মত সাদা হ'য়ে গেল তার মুখ। সেও একখানা চেয়ারের উপর ধপ্ ক'রে বসে প'ড়লো।

বিকাশ তখন দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর ভাবে ঘরের ভিতর পায়চারী ক'তে লাগলো।

ক্রমে সে কতকটা স্পষ্টভাবে চিন্তা ক'রতে পারলে। তার চিন্তার ধারা গেল তার বিগত সৌভাগ্য ও আগত দুর্ভাগ্যের গূঢ় কারণ সন্ধানের দিকে। তাতে তার মনে যে কথা হ'ল তার সব চেয়ে প্রধান, সব চেয়ে জ্বালাময় কথা হ'ল এই কথা যে সে তার ভাগ্যের এতদিনকার অযাচিত প্রসাদ হারিয়েছে তার নিজের পাপে—গীতার পাপে।

গীতার স্তব্ধ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে তার মনে হ'ল যেন গীতা দিব্য সাস্ত হ'য়ে ব'সে আছে তার এ বিপদের কথা শুনে। একটা কথা নেই তার মুখে।— বিকাশের সৌভাগ্যের দিনে তার কত কথা কত দরদ! আর আজ সৌভাগ্য ফুরিয়েছে—এখন গীতার কথা নেই!

একটা তীব্র জিঘাংসায় ভ'রে গেল তার চিত্ত। অবশেষে সিংহমূর্ত্তিতে গীতার সামনে দাঁড়িয়ে সে ব'ললে, "সব গেছে আমার, পথের ভিখারী আমি আজ। কেন জান?—আমার পাপে—আর তোমার পাপে। এতদিন ভাগ্য-দেবীর অপর্য্যাপ্ত প্রসাদ পেয়ে এসেছি আমি—আমিও ভেবেছি তুমিও ভেবেছ সে সব আমার নিজের কৃতিত্বের ফল। তাই সেই প্রসাদকে প্রসাদ ব'লে না জেনে হাত পেতে নিয়েছি আমার পাওনা ব'লে। বরং ভেবেছি, সে আমার যোগ্যতার প্রচুর পুরস্কার। কিন্তু আজ বুঝেছি সে সব প্রসাদও নয়, পুরস্কার নয়, সমস্তটাই অমার পরীক্ষা। দেবতা আড়াল থেকে শুনেছিলেন আমার প্রতিজ্ঞা, দরিদ্রের সেবায় আমার সব উৎসর্গ ক'রবো।—সুযোগ দিয়েছিলেন তাই, প্রচুর অর্থ দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করতে।—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে

পারি নি আমি—তাই, তাই সব কেড়ে নিলেন তিনি!" বলে প্রবল বেগে কপালে করাঘাত ক'রে আবার পায়চারী ক'রতে লাগল। তার দুঃখের সাগর ক্রমেই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ভাসিয়ে দিলে সকল সংযম। তার এত দিনকার নিষ্পেষিত আন্তরাত্মা এই অসহনীয় আঘাতে একেবারে ফুটে বের হ'য়ে এলো জ্বালাময়ী ভাষায়।

খানিক পরে আবার দাঁড়িয়ে সে ব'ল্লে, "বেশ হ'য়েছে। যোগ্য শাস্তি হ'য়েছে আমার ও তোমার। গরীবের দুঃখ আমার প্রাণে জাগেনি তা' নয়! চিরদিনই দেশের দুঃখী দরিদ্রদের দেখে আমার প্রাণ হাহাকার ক'রে উঠেছে, নিজের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রতে লজ্জা হ'য়েছে। কিন্তু কিছুই আমি করিনি। আমার মর্ম্মের বেদনা মর্ম্মে মূর্ত্ত হয়'নি কোনও দিন। কেন জান? নিজের বিচারবুদ্ধি কর্ম্মশক্তি সব তোমার কাছে দাসখত লিখে বিলিয়ে দিয়েছিলাম ব'লে। গরীবের দুঃখ-দৈন্য তোমার প্রাণে একদিনও একবিন্দু ব্যথা জাগায় নি, গরীব হওয়া যে কী বস্তু, সে কথা কোনও দিন অনুভব করবার চেষ্টা কর নি, তাই, যখন কোনও প্রস্তাব ক'রেছি তোমার কাছে তুমি তা প্রত্যাখ্যান ক'রেছ। ত্যাগী বীর সুবোধ দা দরিদ্রের সেবার জন্য টাকা চেয়েছে, সে চাওয়াটাকে তুমি স্পর্দ্ধা ব'লে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে,—কেন—না, তোমার স্বামী ভাগ্যবলে দু' পয়সা রোজগার করেছে, আর ওরা স্বামি স্ত্রী পয়সা রোজগারের মুখে পদাঘাত ক'রে দারিদ্র্য বরণ করেছে দরিদ্র-সেবার জন্য।

"তোমার কোনও ধারণাই নেই, হয়তো তোমার এই ছোট নজর, দরিদ্রের দুঃখের সম্বন্ধে এই নিদারুণ অবজ্ঞায় রোজ রোজ তিল তিল ক'রে কত দুঃখ পেয়েছি আমি। জান? আমি তোমার ঐ বস্তার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে যাই আমি সেখানে দেখতে পাই দুঃখ-দৈন্যের জীবন্ত মূর্ত্তি! দেখেছি, তারা খায় যা' তা' দেখলে কান্না পায়! আর অনেক মেয়েকে দেখেছি একখানি তার জীর্ণ শাড়ী আছে তারই আধখানা প'রে আধখানা শুকিয়ে নেয়! এরা থাকে ঘরে দোরে—কিন্তু পথে ঘাটে যে দুঃখ দৈন্য দেখেছি তার সীমা নেই। এ সব দেখে

প্রতি দিন প্রতি রাত্রি আমার বুকের ভিতরে আগুন জলে উঠেছে। কত রাত যে আমি এদের কথা ভেবে আমার নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে পারিনি তা' তুমি জান না। জানবে কেমন ক'রে ? টাকার জন্ত তোমার যতখানি দরদ, তার এক সিকি দরদ যদি আমার জন্ত থাকতো তবে জানতে, বুঝতে!

"কেঁদেইছে প্রাণ আমার, টাকাটা সিকেটা লুকিয়ে চুরিয়ে দান করা ছাড়া ক'রতে পারি নি কিছুই। এদের দুঃখ দূর করবার জন্ত কি যে করবার দরকার তাও ভেবে বুঝতে পারি নি, শুধু গ্লানি হ'য়েছে মনে যে, এই দারিদ্র্যের পাশে আমি এত সম্পদ, এত বিলাস নিয়ে ব্যসন ক'রছি। হিংসা হয়েছে সুবোধ দা'কে। তাকে যখন টাকা দিয়েছি, তখন মনে হ'য়েছে সার্থক হ'য়েছে আমার রোজগার। কিন্তু তাও শক্তি সাধ্য অনুসারে দিতে পারি নি—শুধু তোমার মত স্বার্থসর্ব্বস্ব অর্দ্ধগৃধ্নু নারী আমার স্ত্রী হ'য়েছে ব'লে। আর তাকে শাসন করে শিক্ষা না দিয়ে দুর্ব্বলের মত তার হাতে ক'রেছিলাম আত্মসমর্পণ।

বেশ হ'য়েছে! তোমার—আমার মুখের মত জুতো হ'য়েছে। —আগুন' জ্বলে গেছে আমার সম্পদে! কখন জলেছে ভেবে দেখেছ?—যখন দেবতা আমরা শেষ পরীক্ষার জন্ত পাঠিয়েছিলেন সুবোধের হাতে আবেদন, আর তুমি তা' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উপেক্ষা ক'রেছিলে।

"বেশ হয়েছে! সব গেছে—এখন? এখন তোমার সে ঐশ্বর্য্য কোথায়? কাকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে দুনিয়ার সব কিছু অগ্রাহ্য ক'রবে? কি সুখে বাঁচবে এখন?"

চক্ষের জলে বিকাশের মুখ ভেসে গেল। ধপ ক'রে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়লে সে।

নীরবে প্রস্তর মূর্ত্তির মত ব'সে গীতা এ দীর্ঘ তিরস্কার শুনলে।

তার পর, প্রসান্তভাবে সে বিকাশের-পাশে এসে দাঁড়াল। অপরিসীম স্নেহের সঙ্গে সে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ব'ললে, "অত অস্থির হ'চ্ছ কেন? গেছে সব যাক। যাদের সম্পদ নেই তারা কি বেঁচে নেই। আমরাও বাঁচবো।

লাখ লাখ টাকা গেছে, দুঃখ কি? বেঁচে থাকলে তুমি আবার লাখ লাখ টাকা ক'রতে পারবে। ভুল ক'রে থাকি, সে ভুল শোধরাবার অবসর পাবো।

সামর্ষ হাস্তের সহিত বিকাশ ব'ল্লে, "এখনও তুমি কিছুই বুঝতে পার নি কত বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ভাবছ শুধু টাকা গেছে। শুধু টাকা নয়, ঘর, বাড়ী আসবাব-পত্র সব যাবে,—মান প্রতিপত্তি কাজ করবার শক্তি সব যাবে আমার।—একেবারে সত্যি সত্যি সর্ব্বনাশ হবে—কিছু থাকবে না আমাদের।"

শান্তভাবে গীতা ব'ল্লে, "বিয়ের আগেও তো তোমার কিছু ছিল না। এই ক' বছরেই এত হ'য়েছিল। আবার হবে।—ফের গোড়া থেকে সুরু ক'রতে হবে।"

তারপর সে আবার ব'ল্লে, "আমার গয়না, আমার ব্যাঙ্কের টাকা, তাও কি যাবে? তা' যদি থাকে তবে দুঃখ কিসের? সেও তো পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা। তাই নিয়ে ব্যবসা ক'রে আবার হবে টাকা তোমার—না হয় দুঃখ কি? টাকা নাই থাকে আমার, তুমি আছ, ছেলে মেয়ে আছে।—যত অযোগ্য হই যত ছোট হই আমি আছি—দাসী, সখী, প্রিয়া, শান্তি সব হব আমি তোমার। ভুল ক'রেছি, দোষ ক'রেছি, সারাজীবন প'ড়ে আছে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার!"

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো বিকাশ গীতার প্রশান্ত মুখের দিকে।—এ যেন এক নূতন গীতা সে আজ আবিষ্কার ক'রল।

বিকাশ ভেবেছিল, না জানি কত তিরস্কার ক'রবে আজ গীতা তাকে, তার মূর্খতার জন্য—সে তিরস্কার ক'রলে তার জবাব দেবার কিছু ছিল না।

কিন্তু কোথায় তিরস্কার? তীব্র জ্বালায় বিকাশ তাকে যে বিষাক্ত তিরস্কার ক'রেছে, তারও একটা উত্তর বা তার জন্য অনুযোগ পর্য্যন্ত ক'রলে না গীতা। এত বড় বিপদে একটু বিচলিত হয় নি সে, একটু গ্লানি নাই তার, সে নিয়ে এসেছে শুধু প্রশান্ত স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, অপরিসীম আশ্বাসের বাণী!

গীতার গয়নার লোভ নিয়ে বিকাশ তাকে কত না নিন্দা ক'রেছে মনে মনে। চিরদিনই তার মনে হ'য়েছে গীতার গয়নার লোভের সীমা নেই। বিয়ের

আগে যেমন, পরেও তেমনি, কোনও আলগা টাকা বিকাশের হাতে আসতে না আসতে তা' কেড়ে নিয়ে সে গয়না গড়াত। এমনি ক'রে তার গয়না হ'য়েছে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার। সে গয়না সে আজ এক কথায় তুলে দিতে চাইছে বিকাশের হাতে।

মহীয়সী হ'য়ে নবরূপে আজ গীতা দেখা দিল বিকাশের সমনে। তার এই বমূর্ত্তি বিকাশকে নিদারুণ লজ্জা দিল, সে গীতাকে আজ যে তিরস্কার ক'রেছে, ার এতদিন তাকে যে খাটো ক'রে দেখছে তার জন্যে। অনুশোচনায় ভ'রে ঠলো তার চিত্ত, কিন্তু সে অনুতাপ কথায় গেঁথে বলবার স্পর্দ্ধাও তার হ'ল া। শুধু মনে হ'ল আজ সে জানতে পেরেছে যে, গীতা তার কত বড় সৌভাগ্য —কিন্তু এখন তার যোগ্য সমাদর ক'রে তাকে তার যোগ্য রাণীর আসনে সাবার শক্তি সে হারিয়ে ব'সেছে।

সে হাত বাড়িয়ে গীতাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে দিলে তাকে এক গভীর ম্বন। এমন আন্তরিকতার সঙ্গে গীতাকে চুম্বন সে করে নি অনেক দিন। ীতল হ'য়ে গেল তার বুক। গীতাও পরম তৃপ্তির সঙ্গে লতিয়ে রইলো স্বামীর বুকে। তার কানে কানে বিকাশ শুধু ব'ল্লে, "আমায় মাপ কর গীতা।"

যশোবন্ত দ্বারোয়ান দুয়োর ঠেলে ঢুকতে গিয়েই তাদের এ অবস্থায় দেখে বেরিয়ে গেল।

লজ্জিতা গীতাকে ছেড়ে দিয়ে বিকাশ ডাকলে, "যশোবন্ত!"

যশোবন্ত এসে সেলাম ক'রে তার ব্যাগ থেকে বের ক'রলে বিকাশের চেক ই, ব'ল্লে, "কাল ইঠো টেবিলপর পড়া রহা—" বিকাশ চিলের মত ছোঁ মেরে চেক বইটা নিয়ে তার ভিতর দেখতে লাগল। শেষের যে দু' খানা চেক, ছেঁড়া 'য়েছে তার Counterfoil-এ কিছু লেখা নেই। বিকাশের নিয়ম ছিল যে তার করাণী চেক লিখে দেয়, তারপর সে যখন সই করে তখন Counterfoil-টা নিজে লিখে। কাল তাড়া-হুড়ায় এ দুখানা চেকের Counterfoil লেখা নি।

সে কথা বিকাশের মনে হ'ল না। সে দেখলে যে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নামে কোনও চেক লেখা নেই আর, দু'খানা সাদা চেক কে ছিড়ে নিয়েছে।

একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে সে যশোবন্তকে ব'ল্লে; "দোঠো চেক কাঁহা গয়া ?"

যশোবন্ত তখন ব্যাগের ভিতর হাতড়াচ্ছিল, সে চমকে উঠে শুষ্ক মুখে ব'ল্লে, "চীক্ ? চীক্ তো হম্ নেই জানতা হুজুর !"

গর্জ্জন ক'রে বিকাশ ব'ল্লে, "নেই জানতা। আহ্লাদে গোপাল আমার ! দিব্যি ছিঁড়ে নেওয়া হ'য়েছে চেক আবার নেই জানতা। চোর শালা, চেক কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে ঠাকা তুলেছিস রে হারামজাদা ?"

দ্বারোয়ান বোকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ব'ল্লে "ধর্ম্মাবতার হম্ তো চীক্ দেখা নহী। আপ যব চলে গঁয়ে, তব টেবিল পর ই চীক্ বহী ওর চিটি—"

"Shut up" ব'লে হুঙ্কার ক'রে তেড়ে গিয়ে সে যশোবন্তকে লাগালে এক চড়।

গীতা বিকাশের গায় হাত দিয়ে ব'ল্লে, "রাগ ক'রো না, শোন একবার ওর কথা। আমি একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।"

দ্বারোয়ানের চোখ দিয়ে তখন টস্ টস্ ক'রে জল প'ড়ছে। গীতা তাকে শান্তভাবে বল্লে, "খালি চেক বই পেয়েছিলে তুমি ? আর কিছু পাও নি।"

দ্বারোয়ান ব'ললে, আর তিনখানা চিঠি ছিল, সেগুলি নিয়ে কেরাণী বাবুকে দিয়ে পীয়ন-বইয়ে লিখিয়ে সে দিয়ে এসেছে। ব'লে তার ব্যাগ থেকে পীয়ন-বই বের ক'রে সে গীতার হাতে দিলে।

পীয়ন-বই খুলে প'ড়তে গীতার মুখ চোখ উৎফুল্ল আনন্দে উজ্জল হ'য়ে উঠলো। সে চট্ ক'রে বইখানা বিকাশের সামনে ধ'রে ব'ল্লে, "দেখ, দেখ, এই না ?"

বিকাশ দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। ব'ল্লে, "হুরে।"

এদের এত উল্লাস হ'ল এই দেখে যে, পীয়ন-বইয়ে যে কটা চিঠির কথা লেখা আছে, তার মধ্যে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নামে চেক-সম্বলিত একখানা ঠি কাল পাঠান হওয়া দেখা যায় এবং কালই তার প্রাপ্তি-স্বীকার হয়েছে।

যশোবন্ত তার ব্যাগ থেকে আর একখানা কাগজ বের ক'রে হাতে ধ'রেছিল। বিকাশ সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে দেখলে যে, ইন্‌সিওরেন্স আফিস থেকে দেওয়া একটা কাঁচা রসিদ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো বিকাশের।

ব্যাপারটা তখন স্পষ্ট বোঝা গেল।

বিকাশের টাইপিষ্ট তার কাছে যে সব চিঠি টাইপ ক'রে সইয়ের জন্য দিয়েছিল তার মধ্যে এই ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর চিঠিখানা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বিকাশের পূর্ব্ব আদেশ মত দু'খানা চেকও লিখে দিয়েছিল।

বিকাশ তখন দারুণ দুশ্চিন্তায় অস্থির। সে যন্ত্রচালিতের মত অর্দ্ধসম্বুদ্ধভাবে চিঠিগুলো এবং চেকগুলো সই ক'রে চেক দু'খানা ছিঁড়ে থানা চিঠির সঙ্গে খামে পুরে রাখতেই এলো ফাটকা বাজারের টেলিফোন। ত্রস্তব্যস্তে সে তারপর ছুটে চ'লে গেল, চেকের counterfoil লিখে চেক বই তুলে রাখা হ'য় না, আর তার অর্দ্ধসম্বুদ্ধ চেতনায় এতক্ষণ যে কাজ সে করেছিল তার স্মৃতিও তার মন থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।

যশোবন্ত তারপর এসে চিঠিগুলো নিয়ে টাইপিষ্ট বাবুকে দিয়ে পীয়ন-বুকে তুলিয়ে চেকবই নিজের কাছে রেখে বের হ'য়ে যথাস্থানে চিঠি পৌঁছে এলো।

যশোবন্তের দুই হাত ধ'রে গীতা তাকে বল্‌লে, "সাহেব মিথ্যা তোমাকে বকেছেন, যশোবন্ত। তুমি বাহাদুর, এই নাও নাও" ব'লে সে তার হাত থেকে পাঁচশো টাকা দামের বালাজোড়া খুলে যশোবন্তকে বকশিষ দিয়ে ব'ল্‌সে "তোমার বউকে দিও।"

বকশিষের বহর দেখে বিকাশ একবার আঁৎকে উঠলো, তখনি তার মনে

পড়'লে সাত লাখ টাকা রক্ষা ক'রেছে যশোবন্ত। তার ইচ্ছা হ'ল সেও যশোবন্তের কাছে মাপ চায়, কিন্তু লজ্জায় তার মুখ চেপে ধ'রলে। নইলে অনুশোচনার তার অন্ত ছিল না।

তার বিশেষ ক'রে মনে হ'ল এখন অনেক দিন আগের কথা যখন সুবোধ সত্যকে মেরেছিল ব'লে বিকাশ তাকে লেকচার দিয়েছিল। সুবোধ ব'লেছিল উপযুক্ত অবস্থা হ'লে বিকাশও গরীবকে মারতে কুণ্ঠিত হবে না। নিজের গালে চড় মেরে তার ব'লতে ইচ্ছা করল এখন, ঠিক ব'লেছিল সুবোধ, এমনি অপাদর্থ, এমনি হাম্বাগই বটে।

এতক্ষণে টাইপিষ্ট বাবু পান চিবোতে চিবোতে আফিসে ঢুকেই মুনিব ও মুনিব-পত্নীকে দেখে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। এত সকালে বিকাশ কখনই আসে না, তাই বাবুও সময়মত আসা আবশ্যক মনে করে না আসতে যে দেরীটুকু হ'য়েছে তার জন্য মনে মনে কৈফিয়ৎ সে ভাঁজতে লাগলো।

তাকে দেখে গীতা বিকাশকে ব'ল্‌লে, "আজ আর কাজ করতে হবে না, আফিসে ছুটি দেও।"

বিকাশ ব'ল্‌লে, "ও রে বাপরে! অনেক কাজ।—বিশেষ ইন্‌সিওরেন্স আফিসে আগুন লাগার খবর দিতে হবে।"

গীতা হেসে ব'ল্‌লে, "আর, যদি আজ জন্মের মত ছুটি হ'য়ে যেতো।"

বিকাশ ব'ল্‌লে, "অর্দ্ধার্দ্ধি রফা। আজ হাফ হলিডে!"

গীতা ব'ল্‌লে, "তুমি একবার কাজে ব'সে গেলে তোমাকে বিশ্বাস নেই। আচ্ছা, নিতান্ত জরুরী যে কাজ, আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে নেও, তারপর ছুটি। আমি ব'সে রইলাম।"

তারপর ব'ল্‌লে, "তা, ছাড়া আমারও একটু কাজ আছে, সেরে নি।"

বিকাশ টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে কাজ ক'রতে বসলো। গীতা তার কাছে চেকবইখানা এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "দু'খানা ব্ল্যাঙ্ক চেক আমাকে সই ক'রে দেও।"

বিকাশ গীতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কেন? কাকে দেবে?"

গীতা হেসে ব'ললে "আমার দরকার আছে, অত জিজ্ঞেস ক'রো না। পথের ভিখারী ছিলে আধঘণ্টা আগে, এখন লক্ষপতি হ'য়েছ যশোবন্তের দয়ায়, আবার কথা কইছ বড়?

বিকাশ দিলে দু'খানা চেক সই ক'রে। জানবার কৌতূহল সে কষ্টে দমন ক'রলে। তারপর সে জরুরী কাজ ক'রতে লাগলো।

গীতা তখন টাইপিষ্ট বাবুর কাছে গিয়ে তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে তাকে দিয়ে ব'ললে "এই নিন রাখাল বাবু, এ দিয়ে আপনার স্ত্রীকে একটা গয়না গড়িয়ে দেবেন।

রাখাল একেবারে হকচকিয়ে গেল। আফিসে আসতে একটু দেরী হ'য়েছে ব'লে গীতা তাকে ব্যঙ্গ ক'রছে ব'লে ম'নে হল। হাত না পেতে সে মাথা চুলকে ব'ললে, "আজ্ঞে—"

"আজ্ঞে কি? আপনার স্ত্রীকে আমি একটা প্রেজেণ্ট দিচ্ছি, ধরুন না?"

লজ্জিত রাখাল ব'ললে, "আমি তো বিয়ে করি নি।"

"ওগো শুনছো। রাখালবাবু বিয়ে করেন নি। তোমার আফিসে এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড। যান, অফিস এক্ষুণি ছুটি হবে, চটপট বিয়ে ক'রে বউকে এই দিয়ে গয়না কিনে দেবেন!"

সলজ্জ হাসির সহিত রাখাল নোটগুলো নিলে।

গীতা ব'লে, "নিন, এই চেক দুটো file up ক'রে দিন তো।

গীতার নির্দ্দেশ মত রাখাল প্রাপকের নাম ও টাকার অঙ্ক লিখে চেক ক্রস ক'রে দিলে, এবং চেক দু'খানা খামে ভ'রে ঠিকানা লিখে রেজেষ্ট্রী ডাকে দেবার জন্য যশোবন্তকে দিয়ে দিলে। গীতা তখন বিকাশের কাছে গিয়ে ব'ললে, তোমার চেকবইয়ের Counterfoilএ লিখে দি, দাও।" ব'লে চেকবই টেনে নিয়ে লিখলে।

বিকাশ দেখলে, একখানা চেক হ'য়েছে অনন্তর স্ত্রীর নামে দু'শো টাকার, আর একখানা সুবোধ চাটার্জ্জীর নামে—দশ হাজার টাকার।

বিকাশ হাঁ করে গীতার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বিস্ময়ে সসঙ্কোচে। গীতা হেসে ব'ল্লে হাঁ ক'রে দেখছ কি?"

মুখ নীচু ক'রে বিকাশ মাথা চুলকে ব'ল্লে, "ভাবছিলাম সুবোধ দাকে—"

টেলিফোনের ঘণ্টা টিং টিং ক'রে বেজে উঠলো। টেলিফোন ধ'রে বিকাশ যে খবর শুনলে, তাতে সে চ'মকে উঠলো, ব'ল্লে, "এত কমে গেছে—তা বেশ হ'য়েছে, যাক্ এখন আর কোনও transaction ক'রবেন না।"...."তা বটে, কিন্তু আজ থাক।...কাজ নেই।..."আচ্ছা।"

গীতা দেখলে যে, বিকাশের হাতে যে কাজ ছিল, সেটা শেষ হ'য়ে গেছে। আর একটা কিছু ধরবার অবসর না দিয়ে সে ব'ল্লে, "আর কাজ নেই, এখন ছুটি।—রাখাল বাবু এখন আফিস ছুটি, আপনি বাড়ী যান, আর চট্ পট্ বিয়ের জোগাড় করুন গে।"

রাখাল ভাবলে না জানি কার মুখ দেখে উঠেছে সে আজ!—আজ রেসে গেলে নির্ঘাত সে বড় বাজী মারতে পারবে। তাড়াতাড়ি সে উঠে প'ড়লো।

গীতা তখন ব'ল্লে "কি খবর পেলে টেলিফোনে।"

"খবর ভাল। কাল বিকেলে পাটের বাজার একটা বাজে গুজবের ফলে বেজায় চ'ড়ে গিয়েছিল। গুজবটা মিথ্যে তা' জানা জানি হ'য়ে গেছে, তাই আজ সকালেই কাল সকালের চেয়ে দু'টাকা ক'রে ক'মে গেছে।"

"তাতে ভালটা কি?"

"প্রথম ভাল এই যে, আমার পাট পুড়ে গেছে—"

"সেটা ভাল হল?"

"এখন দাঁড়াচ্ছে তাই। যদি না পুড়ে যেতো আর এই বাজারে বেচতে হ'ত, তবে ম'রে যেতাম। এখন ইনসিওরেন্স কোম্পানী কালকের দামই